কণিকায়

প্রাউট

(প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড)

শ্রীপ্রভাতরঞ্জন সরকার

কণিকায় প্রাউট

(প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড)

শ্রীপ্রভাতরঞ্জন সরকার

সূচীপত্র

প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারীর বিনা অনুমতিতে এই বইয়ের কোন অংশ অর্থকরী কিংবা উপাধিগত কিংবা গবেষণা সংক্রান্ত কার্যে কিংবা অন্য যে–কোন ভাবে ব্যবহার করা অনুচিত বলিয়া বিবেচিত হইবে। সুতরাং কেহ যেন তাহা না করেন।
–প্রকাশক

© আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘ (কেন্দ্রীয় কার্যালয়) কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

রেজিঃ অফিস: আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘ আনন্দনগর, পোঃ– বাগলতা, জেলা–পুরুলিয়া, পঃ বঃ

যোগাযোগ অফিস: আনন্দমার্গ প্রকাশন বিভাগ ৫২৭, ভি. আই. পি. নগর, কলকাতা–৭০০১০০

প্রথম সংস্করণঃ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৭

দ্বিতীয় সংস্করণ: অক্টোবর, ২০১৩

প্রকাশক: আচার্য সুগতানন্দ অবধূত (কেন্দ্রীয় প্রকাশন সচিব) আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘ ৫২৭ ভি. আই. পি. নগর কলকাতা–৭০০১০০

অক্ষর বিন্যাস: শ্রীঅনুপ শীট ডট প্লাস দক্ষিণ শানপুর, হাওড়া–৭১১১০৫

মুদ্রাকর: আনন্দ প্রিন্টার্স ৩/১সি, মোহনবাগান লেন কলকাতা–৭০০০০৪

ISBN. 978-81-7252-364-0

সূচীপত্র

ধর্মার্থ শুল্ক: দেড় শত টাকা মাত্র (মাশুলাদি স্বতন্ত্র)

রোমান্ সংস্কৃত বর্ণমালা

বিভিন্ন ভাষার উচ্চারণ যথার্থ ভাবে প্রকাশ করবার জন্যে ও দ্রুত - লিখনের প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে রোমান্ সংস্কৃত বর্ণমালা প্রবর্তিত হল:

অ	আ	ই	ঈ	উ	ঊ	ঋ	ৠ	ঌ	ৡ	এ	ঐ	ও	ঔ	অং	অঃ
अ	आ	इ	ई	उ	ऊ	ऋ	ॠ	ऌ	ॡ	ए	ऐ	ओ	औ	अं	अः
a	á	i	ii	u	ú	r	rr	lr	lrr	e	ae	o	ao	aḿ	ah

ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ञ
ka	kha	ga	gha	uṋa	ca	cha	ja	jha	iṋa

ট	ঠ	ড	ঢ	ণ	ত	থ	দ	ধ	ন
ट	ठ	ड	ढ	ण	त	थ	द	ध	न
t́a	t́ha	d́a	d́ha	ńa	ta	tha	da	dha	na

প ফ ৰ ভ ম

प फ ब भ म

Pa pha ba bha ma

য ৱ ল ব

य र ल व

ya ra la va

শ ষ স হ ক্ষ

श ष स ह क्ष

sha śa sa ha kśa

অঁ জ্ঞ ঋষি ছায়া জ্ঞান সংস্কৃত ততোঽহং

अँ ज्ञ ऋषि छाया ज्ञान संस्कृत ततोऽहं

aṋ jiṋa rśi cháyá jiṋána saḿskrta tato’haḿ

a á b c d d́ e g h i j k l m ḿ

n ń ṋ o p r s ś t t́ u ú v y

সূচীপত্র

সমগ্র বিশ্বে বহুল প্রচারিত রোমকলিপির মাত্র ২৯ টি অক্ষরেই সংস্কৃত ভাষার উচ্চারণ যথাযথভাবে প্রকাশ করা সম্ভব। এতে যুক্তাক্ষরেরও ঝামেলা নেই। আরবী, ফারসী ও অন্যান্য কোন কোন ভাষার f, q, qh, z প্রভৃতি অক্ষরগুলোর প্রয়োজন আছে, সংস্কৃতের নেই।

শব্দের মধ্যে বা শেষে ' ড ' ও ঢ ' থাকলে যথাক্রমে ড় ওঢ় রূপে উচ্চারিত হয়, ' য় ' - এর মত তারাও কোন স্বতন্ত্র বর্ণ নয়।

অসংস্কৃত শব্দ লিখবার প্রয়োজনে সংযোজিত আরো দশটি বর্ণ:

ক়	খ়	জ়	ড়	ঢ়	ফ়	য়	ল়	ৎ	অঁ
क़	ख़	ज़	ड़	ढ़	फ़	य़	ल़	त्	अँ
qua	qhua	za	ŕ	ŕha	fa	ya	lra	t	aṋ

প্রকাশকের নিবেদন

সূচীপত্র

"প্রাউট” এই বহুল পরিচিত শব্দটি "প্রগতিশীল উপযোগ তত্ত্ব” বা ইংরেজীতে Progressive Utilization Theory-র সংক্ষিপ্ত রূপ। যাঁরা মহান দার্শনিক শ্রীপ্রভাতরঞ্জন সরকারের (ধর্মগুরুরূপে যিনি শ্রীশ্রীআনন্দমূর্ত্তি নামে সমধিক পরিচিত) পুস্তকসম্ভার সম্বন্ধে অবহিত আছেন তাঁরা জানেন যে তিনি তাঁর সর্বানুস্যূত আধ্যাত্মিক দর্শন প্রবর্তন করার সঙ্গে সঙ্গে সেই দর্শনেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে এক সামাজিক-অর্থনৈতিক তত্ত্ব "প্রাউট"ও প্রতিপাদিত করেন। এ ব্যাপারে তাঁর সুষ্পষ্ট অভিমত হ'ল- "অন্ন চাই, বস্ত্র চাই, বাঁচার মত বাঁচতে চাই, চিকিৎসা চাই, নিবাস চাই। আর এই প্রয়োজন মেটাবার জন্যেই একদিন আমি অবস্থার চাপে পড়ে 'প্রাউট' দর্শন তৈরী করতে বাধ্য হয়েছি। কারণ যে মানুষটা খেতে পাচ্ছে না, আগে তাকে অন্ন দোব, তারপর তাকে শেখাবো অধ্যাত্ম দর্শন। তারপর তাকে সাধনায় বসাবো। তাকে সাধনাতেই বসাবো কিন্তু আগে তার পেট ভরাবার ব্যবস্থা করতে হবে তো। শীতের সময় তার বস্ত্রের ব্যবস্থা করতে হবে। অসুখ হলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। এগুলো প্রাথমিক প্রয়োজন। এই প্রয়োজন-পূর্তি না হলে কখনো সামগ্রিকভাবে মানুষ জাতির উন্নতি সম্ভব নয়।”

১৯৫৫ সাল থেকেই তিনি প্রথম দিককার কয়েকটি প্রবচনে তাঁর সামাজিক-অর্থনৈতিক চিন্তাধারা ব্যক্ত করা শুরু

করেন। **১৯৫৯ সালে প্রদত্ত এক প্রবচনমালায় দুটি বিশেষ প্রবচনের মধ্যে একটিতে ("Cosmic Brotherhood" Idea and Ideology) প্রথম তিনি প্রগতিশীল উপযোগ তত্ত্ব তথা Progressive Utilization Theory–র নাম ও এই তত্ত্বের পাঁচটি মূলীভূত সিদ্ধান্তের উল্লেখ করেন। তাই ধরা হয় যে এটাই জনসমক্ষে প্রাউটের প্রথম আত্মপ্রকাশ**। তারপর ১৯৬১ সালে তিনি "আনন্দসূত্রম” পুস্তকে (পঞ্চম অধ্যায়) ভাবার্থ সহ ষোলটি সূত্রে এই প্রাউটের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিককে উপস্থাপিত করেন। এরপর থেকে বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত প্রায় ১৭০টি প্রবচনে প্রত্যক্ষভাবে তথা আরও কয়েকটি প্রবচনে আংশিকভাবে এই প্রাউট ভাবধারার বিশদ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেন। এ ব্যাপারে যে বিষয়গুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তা নিম্নরূপ– 'কৃষিবিপ্লব'; 'সুসামঞ্জস্য অর্থনীতি'; 'অর্থনীতির চারটি ধারা'; 'ব্লক ভিত্তিক' ও 'আন্তর্ব্লক পরিকল্পনা'; 'অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণ', 'অর্থনৈতিক গণতন্ত্র'; 'শূদ্রবিপ্লব ও সদ্বিপ্র সমাজ'; 'শাসনব্যবস্থার কয়েকটি রূপ'; 'আদর্শ সংবিধানের জন্যে প্রয়োজনীয় উপকরণ', 'নিউক্লিয়ার রেভেলিউশন'।

প্রাউট সংক্রান্ত প্রবচনগুলি প্রথমে তাঁর সুবিশাল পুস্তকসম্ভারে বিক্ষিপ্তভাবে ছিল। ১৯৮৭ সালে তাঁর নির্দেশে "কণিকায় প্রাউট" নামক গ্রন্থমালায় সেই প্রবচনগুলি সংগ্রথিত

করা শুরু হয়। ১৯৮৮ সালের জুলাই মাসের মধ্যে "কণিকায় প্রাউট”-এর চতুর্দশ খণ্ড পর্যন্ত বাংলা, ইংরেজী ও হিন্দীতে প্রকাশিত হয়ে যায়। এরপর নভেম্বর ১৯৮৮ থেকে শুরু করে অক্টোবর ১৯৯১ পর্যন্ত "Prout In a Nutshell"-এর পঞ্চদশ খণ্ড থেকে একবিংশ খণ্ড পর্যন্ত আরও সাতটি খণ্ড ইংরেজীতে প্রকাশিত হয়।

"কণিকায় প্রাউট" প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডগুলিতে পনেরটি প্রবচনের মধ্যে অধিকাংশ প্রবচনগুলি ১৯৫৫ থেকে ১৯৫৯ সময়কালের। এই প্রবচনগুলি সুভাষিত সংগ্রহ (প্রথম খণ্ড), মানুষের সমাজ (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড), আজকের সমস্যা, দেশপ্রেমিকদের প্রতি, তাত্ত্বিক প্রবেশিক, Idea and Ideology বইগুলি থেকে গৃহীত। "দেশ প্রেমিকদের প্রতি" ও "প্রাউটের মৌল নীতিগুলি" যথাক্রমে ১৯৬০ ও ১৯৬১ সালের।

"বিভিন্ন মতবাদ", "সামাজিক মনস্তত্ত্ব", "সমাজচক্রে সদ্বিপ্রের স্থান", "বিশ্বভ্রাতৃত্ব" ও "প্রাউটের ওপর কয়েকটি প্রবচন"-গুলি মূল ইংরেজী থেকে পূর্বেই বাংলায় অনূদিত হয়েছিল। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, "কণিকায় প্রাউট"-এর প্রথম খণ্ড থেকে চতুর্দশ খণ্ডগুলি প্রথম ১৯৮৭ থেকে ১৯৮৮ সালে প্রকাশিত হয়। কয়েক বছরের মধ্যেই সব খণ্ডগুলি

নিঃশেষিত হয়ে যায়। এর ফলে দীর্ঘদিন থেকেই পাঠক–পাঠিকাবৃন্দ বইগুলির পুনর্মুদ্রণের অনুরোধ করছিলেন। তাঁদের সেই অনুরোধের কথা ভেবেই খণ্ডগুলি পরিমার্জিত করে পুনঃপ্রকাশ করার জন্য আনন্দমার্গ প্রকাশন বিভাগের পক্ষ থেকে প্রয়াস শুরু হয়। সেই প্রয়াসের ফলশ্রুতি স্বরূপ "কণিকায় প্রাউট" প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডগুলি একত্রে পাঠক–পাঠিকাদের হাতে তুলে দিয়ে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। বাকী খণ্ডগুলিও যথাশীঘ্র তাঁদের হাতে তুলে দেবার জন্যে আমাদের প্রয়াস চলতে থাকবে

সংঘের কেন্দ্রীয় প্রকাশন–ব্যবস্থাপক আচার্য পীযূষানন্দ অবধূত অত্যন্ত শ্রম ও যত্ন সহকারে বইখানি ছাপানোর বন্দোবস্ত করেছেন। তাঁকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

লেখকের সুস্পষ্ট অভিমত হ'ল, ভাষাবিজ্ঞান তথা–শুদ্ধ বানান–বিধির স্বার্থে বর্গীয় 'ৰ' ও অন্তঃস্থ 'ব'–এর ব্যবহার বাংলায় থাকাই উচিত। তাই পুস্তকে এই দুটি 'ব'–এর যথোপযুক্ত ব্যবহার করা হয়েছে। পুস্তকের যেখানে প্রথম বন্ধনীর চিহ্ন আছে তা লেখকের বক্তব্য বলেই ধরতে হবে। আর যে সব শব্দ বা বাক্যাংশ তৃতীয় ৰন্ধনীর মধ্যে আছে সেগুলি হ'ল পাঠকের সুবিধার্থে সম্পাদকীয় সংযোজনা।

সূচীপত্র

আজ বিশ্বজুড়ে বঞ্চিত, শোষিত, নির্যাতিত ও অত্যাচারিত মানুষ সামাজিক- অর্থনৈতিক মুক্তির জন্যে যে নবতর সংগ্রাম শুরু করেছেন তাঁদের ও সমস্ত চিন্তাশীল মানুষদের কিছুমাত্র প্রয়োজন যদি সংসাধিত হয় এই পুস্তকের মাধ্যমে, তবেই আমাদের 'পরিশ্রম সার্থক হবে।

–আচার্য সুগতানন্দ অবধূত
মহাপ্রয়াণ দিবস
২১ অক্টোবর, ২০১৩

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

১। সমাজের ক্রমঃবিকাশ, ২। নীতিবাদ ৩। শিক্ষা

৪। সামাজিক সুবিচার

দ্বিতীয় খণ্ড

৫। বিচার

স্বভাবগত অপরাধ অভ্যাসগত অপরাধ

পরিবেশগত অপরাধ অভাবগত অপরাধ

সাময়িক অপরাধ উন্মুখতা,

৬। বিভিন্ন বৃত্তি।

আইন ব্যবসায়ী. চিকিৎসক

ব্যবসায়ী অভিনেতা

তৃতীয় খণ্ড

৭। আজকের সমস্যা

৮। বিভিন্ন মতবাদ,

বৌদ্ধ ও শাঙ্কর মতবাদ চার্বাক

পাতঞ্জল ও সাংখ্য আর্যসমাজ

মার্ক্সবাদ

৯। সামাজিক মনস্তত্ত্ব

একতা সামাজিক নিরাপত্তা শান্তি

১০। সমাজ চক্রে সবিপ্রের স্থান.

১১। বিশ্বভ্রাতৃত্ব।

চতুর্থ খণ্ড

১২। প্রাউটের ওপর কয়েকটি প্রবচন...

১৩। প্রাউটের মৌল নীতিগুলি

১৪। দেশপ্রেমিকদের প্রতি

১৫। সমাজের গতিতত্ত্ব

মানব–সমাজের সর্বনিম্ন প্রয়োজনের গ্যারান্টি দিতে হবে:

সাধারণ জীবন দর্শন

সাংবিধানিক কাঠামোর বিশ্বজনীনতা

প্রথম খণ্ড

সমাজের ক্রমঃবিকাশ

ব্রাহ্মী–চিত্তের চরম বিকাশ পাঞ্চভৌতিক সত্বা। ব্রাহ্মীমনে কল্পনাধারার প্রতিসঞ্চর কালে এই পাঞ্চভৌতিক সত্তা যখন সেই বিরাট জ্ঞাতা পুরুষোত্তমের অলৌকিক সত্তার কিছুটা স্পর্শ পেল তখন তাতে জাগল প্রাণের স্পন্দন। আর এই প্রাণচঞ্চল যে সত্তা, তাঁর ভাস্বর দীপ্তিতে যত বেশী উদ্ভাসিত হ'তে থাকল, তার মধ্যে জাগল তত বেশী মনন শক্তি যা' তাকে আত্ম সচেতনতার পথে এগিয়ে নিয়ে গেল। এই মননশীল জীবসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ যে জীব সে নিজের ব্যষ্টি–শক্তিকেও এই ব্রাহ্মী প্রতিসঞ্চরণের গতিপথে নিজেকে আরও তড়িৎ গতিতে নিয়ে যেতে সক্ষম হল। এই শ্রেষ্ঠ জীবেরই নাম মানব বা মানুষ অর্থাৎ মননশীল।

মানুষের মধ্যেও সর্বত্র মননশীলতার বিকাশ সমান নয়। এমন কি, কোন দুটো মানুষও সমান নয়। কালের পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে গেলে বর্তমান মানুষের চাইতে আদিম মানবের এই মননশীলতার কাজ কম ছিল। আজ থেকে লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্বে যখন ব্রহ্মচক্রের ধারাপ্রবাহে প্রথম যে মানব শিশুটির জন্ম হয়েছিল সে তখন এই পৃথিবীকে মানুষের এমন

সূচীপত্র

নিরাপদ আশ্রয়রূপে পায় নি। চতুর্দিকে হিংস্র শ্বাপদ ও সরীসৃপসঙ্কুল বনভূমি, বিরাটাকার মাংসভোজী জীবসমূহ তাদের করাল দংষ্ট্রা বিস্তার করে আহার অন্বেষণে সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। আকাশের ঝড়-ঝঞ্ঝা, বজ্র-উল্কাপাতের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে ছিল না তার কোন মাধুর্যময় গৃহপরিবেশ, মধ্যাহ্ন-সূর্যের দাবদাহ সেই শিশুর জীবনী-সত্তাকে অঙ্কুরেই শুকিয়ে মেরে ফেলবার চেষ্টা করেছে-এই ছিল তার অবস্থা।

তাই সেদিনের মানুষ তার অন্তর্লোকের পথে যাবার-তার মননশীলতার উদ্বোধন করবার কতটুকু সুযোগ পেয়েছিল! সে তার সকল শক্তিকে নিঃশেষ করে দিত বাঁচবার তাগিদে, ক্রুর প্রকৃতির বিরুদ্ধে অবিশ্রান্ত সংগ্রামে। সেই সংগ্রামের যুগে, সেই আদিম মানুষের সমাজে দাম ছিল কেবল জড়-শক্তির-গায়ের জোরের। সেদিনের সেই পিছনে-ফেলে-আসা পৃথিবীতে তারা দেখেছিল "জোর যার মুল্লুক তার", কিন্তু যেখানে অন্যান্য সমস্ত শক্তিকেই সে দেখেছিল তার শত্রুধর্মীরূপে, সেখানে সে এককভাবে, বিচ্ছিন্নভাবে থাকা যুক্তিযুক্ত মনে করে নি। তাই একে অপরের কাছে এসেছিল-ছোট ছোট দল, ক্ল্যান্ (clan) বা গোত্র গড়েছিল-মিলিত ভাবে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যে।

সূচীপত্র

সে যুগে সেই দৈহিক শক্তির যুগে যারা ছিল যত বেশী শক্তিধর, তারাই হয়েছিল সেই গোত্রগুলির নেতা, সমাজপূজ্য বীর (hero)। এই ভাবেই সেই পুরাণো পৃথিবীতে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ক্ষাত্রপ্রধান সমাজ ব্যবস্থার।

পৃথিবী এগিয়ে চলল। সেই আদিম মানুষের সামাজিক কাঠামোও তাই স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে পারলো না। সে বুঝতে শুরু করল, কেবল গায়ের জোরেই তো চলবে না–চাই জোরের পেছনে একটা বুদ্ধির সমর্থন, যে বুদ্ধি তার শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করবে, চালনা করবে, দেখিয়ে দেবে প্রকৃত ঋদ্ধির পথ। যে মানুষ সংঘর্ষণ ক্রিয়ার দ্বারা সেই পৃথিবীতে প্রথম অগ্নির ব্যবহার আবিষ্কার করলেন, শীত–ক্লিষ্ট রাত্রির হিমশীতল মানুষের দেহে জাগিয়ে দিলে উত্তাপের আরাম স্পর্শ, সে মানুষ তাঁর গায়ের জোরে নয়– বুদ্ধির জোরে, গুণের জোরেই সর্বজনশ্রেষ্ঠ হলেন; সমাজ তাঁকে 'ঋষি' বলে মাথায় তুলে নিলে।

পরবর্তী যুগে এই অগ্নির সাহায্যেই দগ্ধ করে বস্তুকে মানুষ সুস্বাদু ও সুপাচ্য করে তুলল। এই ভাবেই অগ্নির ব্যবহার প্রথম যিনি শিখিয়েছিলেন, তিনিও গণ্য হ'য়ে ছিলেন ঋষিরূপে,

সূচীপত্র

প্রথম ঋষির উত্তর সাধকরূপে! নগ্নদেহ মানুষের জন্যে যিনি প্রথম বস্ত্র–বয়ন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন, যিনি প্রথম

আবিষ্কার করেছিলেন মানব প্রয়োজনে গৃহপালিত জীব–জন্তুর ব্যবহার, মাতৃস্তন্যবঞ্চিত শিশুর জন্য যিনি প্রথম দিয়েছিলেন গো–দুগ্ধের ব্যবস্থা, বর্তমান দিনের অবহেলিত গো–শকটের আবিষ্কার করে যিনি প্রথম মানুষের দূর করেছিলেন যান–বাহনের অসুবিধা–তাঁরা সকলেই ছিলেন ঋষি, তাঁরা সকলেই ছিলেন মানবসমূহের পালক পিতা। তাই তাঁরা সকলেই স্মরণ্য, বরেণ্য, শ্রদ্ধেয়। এই ঋষিরা, যাঁরা ছিলেন নূতনের বার্তাবহ, ক্ষত্রিয় সমাজ স্বাভাবিক নিয়মেই তাঁদের মাথায় তুলে নিয়ে ছিলেন বিপ্র বলে–তাঁদের দিয়েছিলেন অকুণ্ঠ সমাদর।

দিন এগিয়ে যায়। বাইরের জগতের সঙ্গে মানুষ আরও বেশী ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পর্কিত হয়, আরও বেশী ৰুক্তে শেখে বস্তুর ব্যবহার–বা সেই সকল বস্তুকে ব্যবহারের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার প্রয়োজন। স্বাভাবিক নিয়মেই কিছু লোককে সেই গড়ে তোলার কাজেই ব্যস্ত থাকতে হ'ল জাগতিক বিষয় সমূহকে নিয়ে। এই বিষয়–জীবী সমাজ পরিচিত হল বৈশ্য নামে।

স্বাভাবিক নিয়মে বিপ্র বা ক্ষত্রিয়কে নিজেদের স্থূল অস্তিত্ব বজায় রাখবার জন্যে ধীরে ধীরে বৈশ্যের অধীন হ'য়ে যেতে হল। কর্ষক না থাকলে অন্ন পাই নে, তন্তুবায় না থাকলে বস্ত্র পাই নে কর্মকার, কুম্ভকার, চর্মকারের প্রয়োজনও অনস্বীকার্য। তাই ধীরে ধীরে বিপ্রসমাজ বৈশ্যের প্রাধান্য মেনে নিলো একান্তই অনন্যোপায় হ'য়ে।

যাদের ক্ষত্রিয়ত্ব, বিপ্রত্ব বা বৈশ্যত্ব এই তিনের কোন গুণটাই ছিল না, তারা রয়ে গেল এদের আজ্ঞাবহ ভৃত্যরূপে, তাদের উপর চলল এই তিনেরই শোষণ–সমান ভাবে..... নির্মমভাবে।

পৃথিবী আরও এগিয়ে চলল। তার সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হ'য়ে চলল সামাজিক গঠনবিন্যাস। সৃষ্টির ধারাবাহিকতার স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে মানুষ আবিষ্কার করল অর্থের। ক্রমশঃ এই অর্থই সুখভোগের উপকরণে পরিণত হ'ল। মানুষে মানুষে লেগে গেল কাড়াকাড়ি। যে যত বেশী অর্থ সঞ্চয় করতে পারে সে হবে তত বেশী বিত্তশালী, ইচ্ছা করলে সে হ'তে পারে তত বেশী জমির মালিক, ইচ্ছা করলেই সে পেতে পারে তত বেশী ভোগের উপকরণ। বৈশ্যপ্রধান সমাজে বৈশ্যই

সূচীপত্র

হ'ল সবচেয়ে বিত্তশালী, আর অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে বাকীরা নির্ভর করে রইল তারই কৃপা–কটাক্ষের উপর।

এই বৈশ্যপ্রধান সমাজ–ব্যবস্থা আজও চলছে। শোষণের ফলে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়সমাজ ক্রমশঃ শূদ্রত্বে পর্যবসিত হ'য়ে চলেছে। স্বাভাবিক নিয়মেই সমাজে বিত্তশালীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হ'তে পারে না। সংখ্যাগরিষ্ঠতা এই শূদ্রেরই। এই শূদ্ররা আজ চাইছে মিলিতভাবে বৈশ্য–প্রাধান্য খর্ব করতে, তাদের ধ্বংস করতে। তাই আজ জাগছে একটা শূদ্র–প্রাধান্যের সূচনা কিন্তু এই শূদ্র–প্রাধান্যই কি চরম? শূদ্রের হাতে সমাজ নিয়ন্ত্রণের ভার যদি চ'লে যায়, তবে জগতের উন্নতি, তার আত্মিক বিকাশ ব্যাহত হবে না কি? তাই শূদ্র–প্রাধান্যের সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ বুঝতে পারছে–সত্যিকারের কল্যাণধর্মী সমাজব্যবস্থার রূপ কিরূপ ধরণের হওয়া উচিত। সমাজে কারোরই প্রাধান্য থাকা উচিত নয়। একের প্রাধান্য থাকলে বাকীদের উপর শোষণ চলবেই। তাই আনন্দমার্গ চায় একটা ভেদ–রহিত সমাজ যেখানে সকলেরই সমান সুযোগ, – সমান অধিকার।

মানুষের অগ্রগতির জন্যে এই সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থার প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক। কত মেধাবী ছেলে অর্থাভাবে

বিদ্যাচর্চা বন্ধ করতে বাধ্য হ'য়েছে! কত বড় শিল্পী অবস্থার চাপে তার অসামান্য প্রতিভা অঙ্কুরেই দাবিয়ে মেরে ফেলতে বাধ্য হচ্ছে—এই সমাজ ব্যবস্থার দোষে। এ অবস্থা থাকতে দেওয়া যেতে পারে না। এ ভেদ-বুদ্ধির বাবুই-বাসা ভেঙ্গে চুরমার করে দিতেই হবে। তবেই মানুষ মানুষজাতিকে সামগ্রিক ভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারৰে শ্রেয়ের পথে। তার আগে দু'চার জন করে মানুষ হয়তো আত্মিক বিকাশের চরম পরিপূর্ণতায় গিয়ে পৌঁছাৰে, কিন্তু সমগ্র মানুষ জাতকে দ্রুত পদবিক্ষেপে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে সেই পরমাস্থিতিতে পৌঁছিয়ে দেওয়া রীতিমত কষ্টসাধ্য হৰে। স্থূল জগতের উগ্র ঘাত-প্রতিঘাত ৰাৰ্‌ৰার তার দৃষ্টিকে বহির্মুখে ভোগ্য উপাদানের দিকে নিয়ে গিয়ে তার সাধনায় ৰাধা সৃষ্টি করবে।

সুসামঞ্জস্যপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থায় কোন মানুষই যশঃ বা অর্থের লোভে ক্ষ্যাপা কুকুরের মত ছুটাছুটি করবে না। বহির্জাগতিক পরিবেশ মনঃসাম্য অর্জনে সাহায্য করবে—তার ভিতরের দারিদ্র্যও ক্রমশঃ কমে আসবে—

"সতু ভবতি দরিদ্র যস্য আশা বিশালা।
মনসি চ পরিতুষ্টে কোহর্থবান্ কোদরিদ্রঃ”।।

মানুষ! মানুষের প্রয়োজন বুঝে সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোল। তোমার। ব্যষ্টিগত বা ক্ষুদ্র দলগত প্রয়োজনের মুখ চেয়ে কোন কিছু করতে যেও না, কারণ যে প্রচেষ্টা খণ্ডভাব নিয়ে করা হ'য়েছে, ব্রাহ্মীভাব নিয়ে নয়, তা টিকবে না। কালের করালস্পর্শ একদিন না একদিন তার সকল সত্তাকে ধ্বংস করে কোন শূন্যে মিশিয়ে দেবে, তা তুমি বুঝতেও পারবে না। কী ভাবে চলতে হবে, কী করতে হবে, কী ভাবে ভাঙ্গতে হবে, রাখতে হবে, তা জানতে হলে বই পড়বার দরকার নেই, দরকার কেবল সত্যকারের ভাব নিয়ে সত্যিকারের দরদের দৃষ্টি নিয়ে জগতের প্রতিটি প্রাণীর প্রতি তাকিয়ে দেখা।

আর সেই অবস্থায় তুমি বুঝবে, তোমার ভাঙ্গা, গড়া, রাখা সেই আনন্দস্বরূপের আনন্দঘন সত্তাতেই স্পন্দিত, বিধৃত। সেই ভক্তি-জ্ঞানমিশ্রিত কর্মের ভিতর দিয়েই তুমি খুঁজে পাৰে তোমার প্রাণের প্রাণকে, তোমার অন্তরের পরম শ্রেয়কে এতদিন নিজেরই অজ্ঞাতে যাকে তোমার হৃদয়ের মণিমঞ্জুষায় সযত্নে লুকিয়ে রেখেছ সেই পরম সত্তাকে।

“সেই আনন্দ চরণ পাতে
ষড় ঋতু যে নৃত্যে মাতে

প্লাবন বয়ে যায় ধরাতে
বরণ-গীতি গন্ধেরে।।“

(১-১-১৯৫৫, সুভাষিত-সংগ্রহ, ১ম খণ্ড)

নীতিবাদ

"সমাজ” শব্দটার ভাবগত অর্থ হল-একসঙ্গে চলা। অর্থাৎ সমাজের প্রাণসত্তা নির্ভর করছে দুটো তত্ত্বের উপর। প্রথমটা হচ্ছে, তার অস্তিত্ব- একটা সামবায়িক সৃষ্টি; আর দ্বিতীয় জিনিসটা হচ্ছে এই যে, তার মধ্যে একটা গতি থাকতেই হবে। ক্রিয়ান্বিতা শক্তির ধর্মই হচ্ছে, সে সম্পূর্ণ ঋজুভাবে চলে না। চলে ছন্দায়িত, তরঙ্গায়িত পথে। আর এই ছন্দ বা তরঙ্গ কোন একটা একটানা জিনিস নয়, সে সঙ্কোচ-বিকাশী। যে শক্তিতে সমাজ এগিয়ে চলে তা-ও তাই সঙ্কোচ-বিকাশাত্মক। ব্যষ্টি-জীবনের চলার ধর্ম যেখানে সমষ্টির চলার

ছন্দকে বিড়ম্বিত করে দেয় না, সেখানে এই বহু ব্যষ্টির মিলিত চলার মধ্যেই থেকে যায় সমাজ-সৃষ্টির সম্ভাবনা-থেকে যায় বৃহত্তর ভাবের সার্থকতায় উদ্বুদ্ধ এক মনীষা সত্তার ভূমা সংগঠন। শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য নিয়ে যদি বস্তু-বিচার করতে হয় তা'হলে বিনা দ্বিধায় বলতে হয় যে এখনও পর্যন্ত মানুষ যথাযথ ভাবে সমাজ জিনিসটা গড়তে শেখেনি। গড়া তো দূরের কথা, সমাজ জিনিসটার প্রয়োজনীয়তা আজও তার কাছে আৰছা ধোঁয়াটে রয়ে' গেছে।

চলা জিনিসটাই স্থিতাবস্থার একটা কাঠামো ভেঙ্গে আর একটা কাঠামো গড়ে তোলবার প্রয়াস। আর এই প্রয়াসে পুরাতনের জীর্ণ ব্যবস্থাগুলোর ওপর আঘাত হানার মধ্যেই থেকে যায় নবতর সাহিত্য-সৃষ্টির সম্ভাবনা। আঘাতের পর আহত শক্তি যে সাময়িকভাবে স্থিতিলাভ করে সেটাকে জড়-ভাবাত্মক ভাবা ভুল। কারণ তা'র মধ্যে থাকে পরবর্তী আঘাতের পূর্ণ সম্ভাবনা। অবশ্যই আহত ব্যবস্থা আঘাতকারী শক্তিকে গ্রাস করে ফেলতে চায় কারণ সেটা তার পক্ষে নিজেকে বাঁচাবার প্রচেষ্টা। কিন্তু সে তা' পারে না। কেন পারে না তা' পূর্বেই বলেছি। শক্তি-সঞ্চয়ের সঙ্কোচ-বিকাশীত্ব ক্ষুণ্ণ হওয়া শক্তিধর্ম-বিরোধী। আর এই জন্যেই কোন

কায়েমী-স্বার্থই সমাজের (তা' সে যেমন সমাজই হোক না কেন) এই অগ্রগতির ধারাকে রুদ্ধ করতে পারে না। পৃথিবীর সামাজিক ইতিহাস অনুশীলন করলে তাই দেখতে পাই

যখনই প্রতিবিপ্লব সৃষ্টি করবার প্রয়াস জেগেছে, তা' মানুষের শুধু মনস্তাপ বা অর্থনাশেরই কারণ হয়নি-তা' শুধু মানুষকে হতাশার পঙ্কেই নিক্ষেপ করেনি-তা' সঙ্কোচ ভাবকে বাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করায় পরবর্তী ৰিক্ষেপ ভাবকেও দীর্ঘায়ত করেছে-মানুষের বিপ্লবের বিজয়-রথ আরও দ্রুত গতিতে সামনের পথে এগিয়ে চলার প্রেরণা পেয়েছে।

এই যে গতি যা' শক্তিধর্মী তার অভিস্ফুরণ কি প্রজ্ঞাবর্জিত একটা খেয়াল মত এগিয়ে চলে? না-ব্যষ্টিগত জীবনে যে ঊনমানসিকতার বৃত্তি বাইরের জগতে খেয়াল বলে মনে হয়, সমষ্টি-জীবনে অর্থাৎ সমাজ-জীবনে সেটি চলবার জো নেই। তবে হ্যাঁ, সর্বত্রই যে প্রজ্ঞাভাবই সেই চলার ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করছে এমন ধারা কথাও বলছি না। তবে এ কথাটা অবশ্যই ৰলৰ যে তা' বুদ্ধিবর্জিতভাবে ছোটৰার চেষ্টা করলেও ছুটে' চলতে পারে না। অভ্যন্তরীণ শক্তি-সংঘর্ষ তা'কে একটা গঠনমূলক পথনির্দেশনা দিয়ে দেয়। এই সমাজ-ধারার অভ্যন্তরীণ শক্তিক্ষয়কে রোধ করতে গেলে যে প্রজ্ঞামানসের প্রয়োজন তা' সকল ব্যষ্টির মধ্যে পরিস্ফুট নয়।

যাদের মধ্যে তা' প্রকট হয়ে' রয়েছে যৌক্তিকতার খাতিরে সে প্রকটতাকে যতই আপেক্ষিকতার অপবাদ দিই না কেন তার একটা বিশেষ মূল্য নিশ্চয়ই আছে। এই মূল্য নির্ধারণের সব চাইতে সহজ মাপকাটি হ'ল প্রয়োগভূমিতে তাদের সার্থকতা।

এখানে 'সার্থকতা' শব্দটা নিয়েও দার্শনিকদের 'চায়ের পেয়ালায় তুফান' উঠতে দেখা যায় কারণ জড়বাদী ও ভাববাদী উভয়েই কমবেশী একই কথা বলে থাকে। ভাববাদীদের প্রসঙ্গে এখানে বিশেষ কিছু বলতে চাই না কিন্তু জড়বাদীদের সম্বন্ধে এ কথা নিশ্চয়ই বলব যে তাঁরা এমন ধারা কথা বলে কতকটা স্ববিরোধী কাজই করে ফেলেন; কারণ প্রয়োগভূমির সার্থকতা সুস্থ মানস–সত্তারই বিচার্য। আর এই বিচারের সময় তা'কে নিজেকে জড়ের ঊর্ধ্বেই রাখতে হবে। জিনিসটা আর একটু ভাল করে বোঝাই। জড়বাদ জড়কেই সর্বস্ব বলে মনে করে। মন তার কাছে জড়েরই রাসায়নিক পরিণতি মাত্র; তাই তার জড়কেন্দ্রিক মূল্য বাদে আর কোন স্বতন্ত্র মূল্য বা মর্যাদা নেই। বক্তব্যটা যেখানে এই রকমের সেখানে সার্থকতার বিচার করবে কে? তত্ত্বতঃ সত্তা হিসেবেই যা' অস্বীকৃত তাকেই বিচারকের আসনে বসিয়ে দেওয়া–এটাই কি সঙ্গত কাজ হ'ল? আর তাকে যদি বিচারকের মর্যাদাই দিলুম সেক্ষেত্রে জড়বাদ কি আর জড়বাদ

রইল? সে তো ভাববাদের কাছেই আত্মসমর্পণ করল। জড়বাদীদের বক্তব্যের আরও অনেক স্ব-বিরোধী দিক রয়েছে, যেগুলো নিয়ে আপাততঃ আলোচনা করৰার প্রয়োজন দেখি না। গগনচারী ভাববাদীদের মত দুনিয়াকে মিথ্যা বলে' উড়িয়েও দিতে চাই না। তবে এটা ৰলৰ মনকে একটা বিশেষ মর্যাদা দিতেই হবে। ভাবগ্রাহক আপাতঃ দৃষ্টিতে স্থূল শরীর হ'লেও গ্রহীতা বা ভোক্তা যে মন-একথা মনস্তত্ত্ববিদ্যাত্রেই স্বীকার করবেন। আর এই মনের বিচারের একটা সর্বদেশিক সর্বকালিক তথা সর্বপাত্রিক মাপকাঠি না পেলে পারমার্থিক বিচারে বস্তুসত্তার মূল্য-নির্ধারণ যে সম্ভব নয় একথাও স্বীকার করে নিতে হবে।

এই আপেক্ষিক সত্তা-সমূহের ভীড়ের মধ্যে সর্বদেশিক সর্বকালিক বা সর্বপাত্রিক কোন মান-নিরূপণ কিরূপে সম্ভব? বিষয়-বিষয়ী-ভাবাত্মক মনের ক্রিয়াভেদ সম্বন্ধে কিছুটা বিচার বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে মানস-সত্তা তা' উন-মানস বা বর্ধিত-মানস যাই হোক না কেন বস্তুবর্জিত ভাবে নিজের অণুসত্তাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে না। তা'কে একটা বিষয় দিতেই হবে-আর সেই বিষয়টা যদি দৈশিক, কালিক বা পাত্রিক সীমা ডিঙিয়ে চলে যায় তবেই তার পক্ষে ব্যাপকতর ভাবে দেশ, কাল বা পাত্রগুলোকে ধারণ করা

সম্ভব হবে; ও সেই রকম উদার ও ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠিত মানস–সত্তাই প্রকৃত– বিচারে ভূমাভাব আখ্যা পাবার যোগ্য। মনের যে বিশেষ ভাবগত আদর্শ তাকে এই ভূমাভাবে পৌঁছবার প্রথম প্রেরণা জোগায়–তাকেই বলি নীতিবাদ। এই নীতিবাদের প্রতিটি অঙ্গই মানুষকে ক্ষুদ্রত্বের মাঝে অসীমের গানই শুণিয়ে চলে। অন্য ভাষায় বলতে গেলে ৰলৰ বা আরো সহজ ভাষায় বলতে চাই যে, যে সৎবৃত্তিগুলি বৃহৎভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার সহায়ক তারাই সৎনীতি বা নীতি। সমাজ জীবনকে এই নীতিবাদ থেকেই, নীতিবাদের প্রেরণা নিয়েই যাত্রারম্ভ করতে হবে; আর তবেই তার শক্তিক্ষয়ী অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসান হয়ে দ্রুতগতিতে সম্যক্ বিকাশের জয়যাত্রা সম্ভব হবে। এই নীতিবাদের সঙ্গে 'রিলিজন' বা তথাকথিত ধর্ম জিনিসটার তফাৎটাও বুঝে নিয়ে তবে আমাদের কাজে নাবতে হবে।

'ধর্ম' জিনিসটা হ'ল স্বভাবেরই সূক্ষ্মতর ক্ষেত্রে অনুশীলনের মাধ্যমে আনন্দভাবে স্থিতিলাভ বা স্থিতিলাভের প্রচেষ্টা। এই আনন্দঘন ভাবটুকুই তত্ত্বজ্ঞের ব্রহ্ম– ভক্তের আত্মস্বরূপ। তথাকথিত "রিলিজন” এর জন্যে 'ধর্ম' শব্দটা প্রায়ই আল্গাভাবে ব্যবহার হয়ে' থাকে। তার কারণ প্রায় প্রতিটি রিলিজনের প্রবর্তকেরা নিজেদের মতবাদকে 'ঈশ্বরের বাণী'

আখ্যা দিয়ে জনসাধারণের কাছে পরিবেশন করে গেছেন। তাঁরা কেউই যুক্তিতর্কের পথ মাড়ান নি। এর পেছনে তাঁদের উদ্দেশ্য যাই থাকুক না কেন মানুষ তার পরম সম্পদ বিচারশীলতাকে খুইয়ে বসেছিল। "আমি ঈশ্বরের দূত–আমি যা বলছি তা ঈশ্বরেরই ঘোষণা।"–এই কথা বলে মধ্যযুগের অনগ্রসর মানুষের মনে ভয়–তরাস সৃষ্টি করে দিয়ে তাদের ঘাড়ে নিজেদের মতবাদ চাপিয়ে দেওয়ার পরিণাম কি মানুষ বা জীবসমাজের কাছে কল্যাণকর হয়েছিল? প্রায় প্রত্যেক রিলিজনই বলেছে যে এই রিলিজনের অনুগামীরাই ঈশ্বরের প্রিয়, বাকীরা ঈশ্বরের অভিশাপস্বরূপ, তারা শয়তানের শৃঙ্খলে বদ্ধ হয়ে রয়েছে। কেউ বলেছে– "আমাদের প্রেরিত পুরুষই একমাত্র ত্রাণকর্তা। তাঁর শরণ না নিলে এই ভবজ্বালার হাত থেকে পরিত্রাণের অন্য কোন পন্থা নেই।” কেউ বা বলেন– "আমিই শেষ দূত; ও শ্রীভগবানের কাছে দৈনিক এতবার প্রার্থনা করতে হবে। এইভাবে অমুক দিনে অমুক অমুক পশুহত্যা করতে হবে–এগুলো সেই করুণাময়–ভগবানেরই অভিপ্রায়–তোমরা যারা এই বিশেষ বিধিগুলো মেনে চলবে তারা শেষ বিচারের দিনে স্বর্গগতি প্রাপ্ত হবে।” কেউ বা বলেন– "জেনো বৎস! – তোমাদের ভগবানই একমাত্র ভগবান–বাকিদের ভগবান ভগবান নয়।" একটু তলিয়ে' ভেবে দেখুন– এই প্রতিটি রিলিজনই সৌভ্রাত্রের বাণী প্রচার

করেছে কিন্তু এই সৌভ্রাত্র বা universal fraternity সীমিত করে রেখেছে নিজেদেরই সম্প্রদায়ের মধ্যে। এই সৌভ্রাত্রের বাণীর ঠেলায় মানুষের দম বন্ধ হয়ে মরবার জোগাড় হয়েছে। নিজের নিজের রিলিজনের ভাবগম্ভীর "শ্লোগান" নিয়ে এরা যখন নরমেধ- যজ্ঞে প্রবৃত্ত হয়-উদ্দাম সাম্প্রাদায়িকতার নৃত্য শুরু করে-সে দৃশ্যে হয়তো এদের প্রবক্তকেরা লজ্জায় মুখ লুকোতেন। মধ্যযুগীয় পৃথিবীতে যত রক্তপাত ঘটেছে তাদের অধিকাংশই এই সাম্প্রদায়িক সৌভ্রাত্রের স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে সংঘটিত হয়েছে। এই রিলিজন জিনিসটা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাম্প্রদায়িকতাকেই প্রশ্রয় দেয়। রিলিজন-কেন্দ্রিক গোষ্ঠীভাবের নামই সাম্প্রদায়িকতা। শুধু মধ্যযুগেই বা বলি কেন সুপ্রাচীন যুগের পৃথিবীতেও ৰাৱৰার যে তথাকথিত ধার্মিকদের পক্ষ থেকে অজ্ঞ সরল মানুষকে আলোক (?) দানের চেষ্টা চলে এসেছে ও আসছে-তারা অনেক ক্ষেত্রেই একটা না একটা বিপর্যয় ঘটিয়ে তবে ছেড়েছে। মানুষের প্রতি সত্যিকারের ভালবাসা না রেখে কেবল কোন ক্ষুদ্র জাগতিক উদ্দেশ্য-পূর্তির জন্যে রিলিজনের এই সকল ধ্বজাধারীরা অর্থৰল, অস্ত্রৰল, বুদ্ধিৰল কোনটাই প্রয়োগ করতে কসুর করে নি-তাই বলি এই রিলিজন জিনিসটা আধ্যাত্মিক মুক্তি তো দূরের কথা, স্থূল জাগতিক স্বাচ্ছন্দ্য বিধানেও নিজের অযোগ্যতা প্রতিপদে প্রমাণ করে

এসেছে। ওই রিলিজন মানুষে মানুষে ভেদ-সৃষ্টি করে প্রতিটি মানুষকে একই অখণ্ড মানব-সমাজের অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করতে প্রতি পদ-বিক্ষেপে নিষেধ করছে আর এই নিষেধাজ্ঞার সমর্থনে হাজির করেছে অজস্র যুক্তিহীন নজির-অজস্র বস্তাপচা পুঁথির ছেঁড়াপাতা।

রিলিজন জিনিসটা মানুষের মনকে স্থাণুত্বে পর্যবসিত করে রাখতে চায় কারণ যা থেমে থাকে শোষিতের শোষণ-যন্ত্র তাকেই সহজে কায়দার মধ্যে এনে ফেলতে পারে; অথচ এই স্থিতিশীলতা মানসধর্মের বিরোধী। এখন কী করা যায়! রিলিজনের প্রবক্তকেরা তাই চেয়েছিল মানুষ তার গতিধর্মী স্বভাবটুকুকে জলাঞ্জলি দিয়ে ভয়ে হোক, মোহে হোক তকগুলো বিশেষ ভাবকে যুক্তিতর্কের দিকে না চেয়েই অভ্রান্ত সত্য বলে গ্রহণ করুক। বেশী কথা বললে এদের বিদ্যার জাহাজ ফুটো হয়ে যেতে পারে। তাই এরা কোন প্রশ্ন উঠলে মৌনী সেজে উত্তর দেবার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাবার চেষ্টা করে। এতে উত্তর দেবার ঝামেলা পোহাতে হয় না ও মৌনী হবার কৃতিত্বও পাওয়া যায়। এঁদের কেউ কেউ আবার মানুষের মনের জিজ্ঞাসাত্মক ভাব দাবিয়ে রাখবার জন্যে এমন কথাও বলে থাকেন যে এই প্রশ্ন করবার স্বভাবটাই নাকি খুব খারাপ।

তথাকথিত রিলিজনের যে কোন একটা বই পড়ে দেখুন, খুব কম জায়গাতেই তাদের মধ্যে পরমত-সহিষ্ণুতার পরিচয় পাবেন। আমি এমন কথা বলছি না যে, যে যা কিছু বলে তাই মেনে নিতে হবে, কিন্তু না-মানা আর অসহিষ্ণু হওয়া এ দুটো তো এক জিনিস নয়। তা'ছাড়া অন্যের মতবাদ খণ্ডন করার চেষ্টা-এই বা কেমনধারা কথা হ'ল? দার্শনিক পুস্তকে প্রাসঙ্গিকতা ৰোধে হয়তো তুলনামূলক বিচার দেখানো যেতে পারে-বা অশ্রদ্ধা প্রকাশ না করে কারও দার্শনিক বা মনস্তাত্বিক ত্রুটিটুকুও দেখিয়ে দেওয়া যেতে পারে; কিন্তু কাউকে অপদস্থ করার চেষ্টাটা কি উচ্চ মানসিকতার পরিচায়ক? কিন্তু এই তথাকথিত ধর্ম বা রিলিজনের পুস্তকে নিজের মতবাদ প্রচার করা অপেক্ষা অন্যের মতবাদ খণ্ডনের চেষ্টা একটু বেশী দেখা যায়। এসব জিনিস দেখে প্রকৃত তত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা রিলিজন সম্বন্ধে বেশ একটা উচ্চভাব পোষণ করতে সক্ষম হয় না।

প্রকৃত তত্বজ্ঞ বলবেন-

"যুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং বচনং ৰালকাদপি।
অন্যৎ তৃণমিব ত্যাজ্যমপ্যুক্তং পদ্মজন্মনা।।"

• * * * *

"কেবলম্ শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীন বিচারেণ ধর্মহানি প্রজায়তে।।"

একজন ৰালকও যদি যুক্তিযুক্ত ৰলে তা গ্রহণ করা উচিত আর স্বয়ং পদ্মযোনি ব্রহ্মও যদি অযৌক্তিক কথা বলেন তা তৃণবৎ পরিত্যাগ করা উচিত।

• * * * *

কেবল শাস্ত্রে লেখা আছে ৰলেই মানা কিছুতেই বাঞ্ছনীয় নয় কারণ শাস্ত্রোক্ত অযৌক্তিক কথাকেও যদি মেনে নেওয়া হয় তার ফলে ধর্মহানি ঘটে থাকে।

"নীতি” শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হ'ল যার মধ্যে নিয়ে যাবার ভাব রয়েছে। নীতি সাধন–পথের প্রথম বিন্দু। এতটুকুই এর শেষ পরিচয় নয়। নীতি মানুষকে যদি পূর্ণত্বের পথে এগিয়ে চলবার রসদ না যোগায় তবে তা কিছুতেই "নীতি" পদবাচ্য হ'তে পারে না। যা নিয়ে যাবার গুণে গুণী,

যা প্রেরণা দেবার বিশেষণে বিশিষ্ট তা' কোন বিশেষ দেশে, বিশেষ কালে, বিশেষ পাত্রের মধ্যে সীমিত হয়ে তার গতিধর্ম হারিয়ে ফেলতে কিছুতেই পারে না। তাই নীতি হচ্ছে একটা living force যার সাধনা মানসসত্তাকে অধিকতর মননশীলতার মাধ্যমে চরম সূক্ষ্মত্বে–পরমা প্রজ্ঞায় সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে। সেখান থেকে মানুষকে আর কোথাও নিয়ে যাবার প্রশ্ন থাকে না–সেখান পর্যন্ত নিয়ে যাবার প্রেরণা দিতে পারলে তবেই "নীতি" নাম সার্থক হয়ে ওঠে।

নীতিবাদ কোন ভাববাদীর স্বপ্নবিলাস নয়, কোন জড়বাদীর প্রয়োজন পূর্তির ব্যবস্থামাত্রও নয়। নীতিবাদ এমনই একটা জিনিস যা লোকায়ত বস্তুভাবকে লোকোত্তর প্রজ্ঞাভাবে মিশিয়ে দেবার সকল সম্ভাবনা নিয়েই মানুষের সামনে হাজির হয়ে থাকে।

নীতিবাদকে আত্মস্থ করবার অভ্যাস মানুষকে শুরু করতে হবে ঠিক সেই সময়টিতেই বা ঠিক সেই সময় থেকেই যে সময়ে তার মধ্যে ক্রিয়াশীলতার বীজ সবে মাত্র উপ্ত হচ্ছে। ক্রিয়াশীলতা বলতে এখানে সামাজিক কার্যকলাপের কথাই বলছি। এ বিচারে দেখতে গেলে শিশুমনই নীতিবাদ গ্রহণের সব চাইতে উপযুক্ত ভূমি। কিন্তু এই নীতি শিক্ষা কে দেবে!

সূচীপত্র

পিতামাতা দোষ দেন শিক্ষকগণকে আর শিক্ষকেরা বলেন দু-তিন শ' ছেলের ভীড়ে আমরা কী করে ব্যষ্টিগতভাবে কোন বিশেষ ছেলের সম্বন্ধে যত্ন নোৰ? যদিও একথা ঠিক যে পিতামাতা অনেক ক্ষেত্রে অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত ও আশা করা অন্যায় নয় যে অধিকাংশ শিক্ষকই সুশিক্ষিত। তবুও এ ব্যাপারে সবটুকু দায়িত্ব তাঁদের স্কন্ধে চাপিয়ে দেওয়া উচিত হবে না। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের সংখ্যা বাড়িয়ে দিলে সমস্যার আংশিক সমাধান হ'তে পারে বটে, কিন্তু সমস্যা সমাধানের আসল চাবিকাঠি তবুও পিতামাতার হাতেই থেকে যায়। যেক্ষেত্রে পিতামাতা তাঁদের দায়িত্ব-সম্পাদনে অযোগ্য সেইখানেই শিক্ষিক তথা সমাজহিতৈষী ব্যষ্টিবর্গকে অধিকতর দায়িত্ব বোধের পরিচয় দেবার জন্যে এগিয়ে আসতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, যে নীতিবাদের ওপর মানুষের অস্তিত্ব প্রতির্ষ্ঠিত সেই নীতিবাদ শেষ পর্যন্ত মানবতার চরম বিকাশের স্তরে যখন তাকে পৌঁছিয়ে দেয় তখনই তার বৈবহারিক মূল্যটুকু যথাযথভাবে উপলব্ধ হয়। নীতিবাদের স্ফুরণ থেকে বিশ্ব মানবত্বে প্রতির্ষ্ঠা- এ দু'য়ের মাঝখানে রয়েছে যেটুকু অবকাশ তাকে অতিক্রম করবার যে মিলিত প্রয়াস তারই নাম সামাজিক প্রগতি। আর যারা মিলে মিশে চেষ্টা করে এই অবকাশটুকু জয় করবার প্রয়াসে রত হয়েছে তাদেরই নাম দোব একটা "সমাজ”।

সূচীপত্র

(মানুষের সমাজ, ১ম খণ্ড)

শিক্ষা

তাই ৰলছিলুম, অভিভাবকদের যে বাঁধা গৎ "শিক্ষকেরা আজকাল কিছুই শেখান না"- এটাকে আর যাই হোক, সুবিবেচকের মত কথা বলতে পারি নে। প্রকৃতপক্ষে এটা হচ্ছে নিজেদের দায়িত্ব এড়াবার একটা অজুহাত মাত্র। আবার তার সঙ্গে সঙ্গে একথাও ৰলৰ যে শিক্ষকেরাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে যতখানি ব্যষ্টি-স্বার্থসচেতনার পরিচয় দিয়ে ফেলেন, সে তুলনায় সামাজিক কর্তব্যের পরিচয় তাদের কর্মে বা মানসিকতায় খুবই কম দেখতে পাই। যেন-তেন প্রকারেণ অর্থোপার্জন, মেড-ইজ়ি বা নোটবুক লেখার দিকে যতটা ঝোঁক তার এক আনা অংশও সমাজ সংগঠনের দিকে নেই। অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত অভিভাবক নিজের সন্তান-সন্ততিদের কোন কোন ক্ষেত্রে যেমন ইতর ভাষায় গালি দিয়ে প্রহার করে, শিক্ষকদের ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রে তদপেক্ষাও নিন্দনীয়। অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা মনস্তত্ত্বের বই নাড়াচাড়া করার পরেও

শিশুমনে আঘাত দিয়ে কথা বলেন। সংশোধনী প্রচেষ্টার চাইতে মনে ক্লেশ দিয়ে’ মোচড়-দেওয়া ভাষাই বেশী পছন্দ করেন। এমন শিক্ষকও দুর্লভ নন যাঁরা শিশুকে তার জাত তুলে’ অথবা তার পিতার জীবিকা উল্লেখ করে শিশুমনকে ব্যথাভারাক্রান্ত করে তোলেন। “লাঙ্গল ছেড়ে কলম ধরতে এলে কেন, বাবা”, “বাপের সঙ্গে চাক ঘোরাও গে’ যাও”-এমন কথা অনেক শিক্ষকের মুখ থেকে এখনও বেরোয়। শিশু যদি কুদর্শন হয় এমন শিক্ষকও আছেন যাঁরা দাঁত-মুখ ভেংচে বলেন, “যেমন রূপের ছিরি, তেমনি বুদ্ধি”। প্রহার ও অন্যান্য প্রকার শারীরিক নির্যাতনের কথা তো ছেড়েই দিলুম। এখনও দেখতে পাই অনেক শিক্ষক কেবল ভয় দেখিয়ে পড়া আদায় করেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ এইরকম ধারা শিক্ষক অসুখবিসুখের জন্যে কোনদিন ইস্কুলে আসতে না পারলে ছেলেদের মধ্যে আনন্দের হুল্লোড় পড়ে’ যায়। ছাত্রের মধ্যে জ্ঞান-পিপাসা জাগাৰার চেষ্টা ক’জন শিক্ষকের আছে! ‘শিক্ষা- ব্যবস্থাটাই অর্থকরী, আমরা কী করৰ!"-এমন ধারা কথা বলে তাঁরা কি দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেতে পারেন? অর্থকরী শিক্ষা কি শিক্ষা নয়? তার মধ্যে কি জ্ঞান-আহরণের সুযোগ নেই? তার মধ্যে কি কল্যাণের বীজ নিহিত নেই? তাই বলছিলুম, "দু'শ, তিনশ' ছেলের মধ্যে কার কথা ভাবব?"- একথা বলে শিক্ষকেরা জিনিসটাকে তুড়ি মেরে

উড়িয়ে দিতেও পারেন না। জ্ঞান–অর্জন তথা সামাজিক জীবনে সংযম ও মিলিত প্রচেষ্টার ব্যাপারে যা' কিছু শিক্ষা দেবার তা' শিক্ষকগণকেই দিতে হবে। তবে নৈতিক তথা ধার্মিক শিক্ষার দায়িত্বের বেশীর ভাগটাই পিতামাতাকে নিতে হবে। অধার্মিক তথা নীতিবিরোধী পিতামাতার সন্তানকে সম্বুদ্ধি–সম্পন্ন নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার দায়িত্ব সমগ্র সমাজকেই নিতে হবে। সম্ভব ক্ষেত্রে ওই সকল সন্তানকে পিতামাতার দূষিত পরিবেশ থেকে দূরে সরিয়ে' রাখতে হবে।

পিতামাতার দায়িত্ব সম্বন্ধে বেশী কিছু বলৰার আগে শিক্ষকদের সম্বন্ধে আরও দু'একটি কথা বলা দরকার। প্রথম কথাটি হ'ল শিক্ষক–নির্বাচনে সতর্কতা। উপযুক্ত শিক্ষাগত অভিজ্ঞান–পত্র থাকলেই যে তাঁকে শিক্ষকতা করার অধিকার দেওয়া হবে এমন কোন কথা নেই। তাঁদের চারিত্রিক দৃঢ়তা, ধর্মনিষ্ঠা, সমাজ–সেবা, নিঃস্বার্থতা, ব্যষ্টিত্ব ও নেতৃত্বের গুণ থাকতেই হবে। শিক্ষক সমাজগুরু। তাই যে–সে লোককে শিক্ষকরূপে মেনে নেওয়া কিছুতেই যেতে পারে না। শিক্ষকের পদের গুরুত্ব যেমন অধিক তেমনই তার যোগ্যতার মাপকাঠিও বেশ উঁচু ধরণের হওয়া দরকার।

এমন লোক আজকাল সমাজে অনেক রয়েছে যারা অভুক্ত বা অর্ধভুক্ত শিক্ষকদের কাছে প্রাচীন ভারতের তপোবনের গুরুগৃহের বা ঋষি–আশ্রমের কথা শুনিয়ে বলেন, আজকের শিক্ষকেরা সে আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। শিক্ষকদের উচিত সে আদর্শ নূতন করে গ্রহণ করা। তাঁরা ভুলে যান যে কেবল বড় বড় বুলি শোণালেই মানুষের পেটের জ্বালা মেটে না। "অন্নচিন্তা চমৎকারা”। পেটের দায়ে দুস্থ শিক্ষক যদি চার–পাঁচটি জায়গায় গৃহ–শিক্ষকতা করেন ও সেক্ষেত্রে অতিরিক্ত ক্লান্তি নিৰন্ধন যদি তাঁর দ্বারা শিশু–মানস সংগঠনের দায়িত্ব যথাযথভাবে সম্পাদিত না হয় তবে সে দোষটা কি শিক্ষকেরই প্রাপ্য? না, সে দোষের এক আনাও শিক্ষকের প্রাপ্য নয়। পৃথিবীতে এমন দেশ অনেক আছে যে দেশে একজন ধনীলোকের কুকুর মাসে যত টাকার মাংস খেতে পায় একজন শিক্ষকের বেতন তার চাইতেও কম। এ অবস্থায় সেই রকম শিক্ষকের কাছ থেকে কতখানি সমাজ–সচেতনতা আশা করা যেতে পারে। সব দেশেই বিচার ও শাসন বিভাগীয় কর্মচারীগণকে যে হারে বেতন দেওয়া হয় শিক্ষকগণের বেতন তদপেক্ষা অধিক না হোক অন্ততঃ সেই হারে অবশ্যই নির্ধারিত হওয়া উচিত। এ কথা ভুললে চলবে না যে তপোবনের ঋষি বা গুরু প্রাচীন ভারতের রাজশক্তির – কাছ থেকে রীতিমত দোবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি তথা

নিয়মিত দক্ষিণা লাভ করতেন। বাড়ী বাড়ী ঘুরে' গৃহ-শিক্ষকতা করে তাঁদের পরিবার-প্রতিপালন করতে হ'ত না। তাঁদের অন্নসমস্যা সমাধানের দায়িত্ব সরাসরি রাজশক্তি বহন করত। শিষ্যদের তাঁরা গ্রাসাচ্ছাদন দিয়ে পোষণ করতেন বটে, কিন্তু সেই অর্থ জনসাধারণই সশ্রদ্ধায় যুগিয়ে চলত।

শিক্ষকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করে তুলতে পারলেই যে তাঁরা আদর্শ মানুষ গড়ে তোলবার সুযোগ পাবেন এমন কথাও বলা যায় না। কারণ আজও পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই (যে সব দেশে সাধারণতঃ শিক্ষকরা মোটামুটি ভালভাবেই খেয়েপরে বেঁচে থাকবার সুযোগ পান) শিক্ষা-ব্যবস্থার নীতি নির্ধারণ করবার অধিকার শিক্ষকদের নেই। এ ব্যাপারে নীতি-নির্ধারণ করে দেন তাঁরা যাঁরা সাধারণতঃ রাজনৈতিক বৃত্তির দ্বারাই পরিচালিত হ'য়ে থাকেন। তাঁদের অনেকের শিক্ষাক্ষেত্রে হয়তো বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতাও নেই। তাই আদর্শ মানুষ গড়ে তোলবার জন্যে যদি শিক্ষকগণকে কিছুটাও দায়ী করতে হয় তা' হলে তাদের কেবল শিক্ষাদানের যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার না করে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রণেতা হবার অধিকারও দিতে হবে। রাজশক্তি তার সাময়িক বা রাষ্ট্রিক প্রয়োজন ওই শিক্ষকদের সমক্ষে পেশ করতে পারে বটে, কিন্তু তা গ্রহণ করা বা না-করা শিক্ষকদের স্বাধীন ইচ্ছার ওপরেই

ছেড়ে দেওয়া উচিত। অবশ্য তাঁরা যদি রাষ্ট্রগত নিরাপত্তার খাতিরে অথবা বিশ্বমানবের মুখ চেয়ে রাষ্ট্রের প্রস্তাবিত কোন ব্যবস্থাকে সমর্থন করেন তবে তাঁরা (শিক্ষকেরা) তাকে নিশ্চয়ই কর্মে রূপায়িত করবেন। কারণ রাষ্ট্র তাঁদের কাছ থেকে যথোপযুক্ত কাজ সব সময়েই দাবী করতে পারে। এ কথাগুলো বললুম তার প্রধান কারণ এই যে বর্তমান গণতন্ত্র–প্রধান পৃথিবীতে রাজনৈতিক দলাদলি একটা প্রাত্যহিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ অবস্থায় ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিটি দলের পক্ষেই শিশুমনকে নিজের দলগত উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার ইচ্ছা থাকাটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু শিক্ষকগণকে তো তাদের সদিচ্ছার (?) মুখপানে চেয়ে কাজ করলে চলবে না। তাঁদের সব সময়েই বৃহত্তর আদর্শের পানে চেয়ে কাজ করে যেতে হবে। বিদ্যালয়ের আওতার মধ্যে কোন অশিক্ষককেই শিক্ষাগত ব্যাপারে নাক গলাবার অধিকার দেওয়া চলবে না।

এ তো গেল শিক্ষাগত নীতি নির্ধারণের অধিকারের কথা। কিন্তু ব্যাপারটা এখানেই শেষ হচ্ছে না। বিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রেও অনেক দেশে দেখা যায় যে পরিচালক মণ্ডলীতে কেবল অর্থগত কারণে এমন অনেক লোককে গ্রহণ করা হয় বা গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত করা হয় যাঁরা প্রচলিত ভাষায় বলতে গেলে গণ্ডমূর্খ ছাড়া আর কিছুই নন। অর্থবলই এঁদের

একমাত্র যোগ্যতা। এমন ঘটনা অবশ্য সেই সব দেশেই হ'য়ে থাকে যেখানে যে কোন কারণেই হোক শিক্ষাদান ব্যবস্থার দায়িত্ব রাষ্ট্র গ্রহণ করতে সক্ষম হয় নি। এই সব ধনী স্কুল পরিচালকরা শিক্ষিত শিক্ষকগণকে অনেক সময় কৃপার পাত্র বলেই মনে করেন। নিজের মেধাহীন জড়বুদ্ধি সন্তানকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করে দেবার জন্যে শিক্ষককে চাপ দেন, শিক্ষা ব্যবস্থায় অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ করেন। ছেলেকে শাসন করা হ'লে শিক্ষককে রক্ত-চক্ষু দেখান। এ অবস্থা নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয় নয়। এতে করে শিক্ষক বিবেক বুদ্ধি অনুযায়ী কর্তব্য সম্পাদনের সুযোগ পান না। অর্থ কৃচ্ছ্রতার দরুণ হয় তাঁকে পেটের দায়ে ভয়ে ভয়ে দিনগত পাপক্ষয় করে যেতে হয়; অথবা তাঁর পৌরুষের উপর ক্রমাগত ধাক্কা লাগার ফলে একদিন দারুণ তিক্ততার মধ্যে চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে অন্য জীবিকার খোঁজে বেরিয়ে পড়তে হয়। শিক্ষককে এমন ধারা আবহাওয়ার মধ্যে কাজ করতে হ'লে ছাত্রের প্রতি যথাযথভাবে দৃষ্টি রাখার মত মানসিক সবলতা থাকা তাঁর পক্ষে কি করে সম্ভব?

এগুলো তো গেল শিক্ষকদের সমস্যার কথা। শিক্ষার্থীদেরও এমন কতকগুলো সমস্যা রয়েছে যেগুলোর কথা অনেকেই ভাবতে চান না। আগেই বলেছি ছাত্রদের উপর চাপ দিয়ে বা

ভয় দেখিয়ে তাদের কাছ থেকে কোন কিছু আদায় করার চেষ্টা বৃথা। আপাতঃদৃষ্টিতে তাতে কাজ হয় বটে, কিন্তু কোন স্থায়ী ফল হয় না। পিতামাতা বা শিক্ষকদের কাছ থেকে ছেলেরা ভয়ে ভয়ে যা' কিছু শেখে তা' ভয়ের কারণ সরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভুলে যায় কারণ সে শিক্ষা আর ভয় এ দুটো জিনিস অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল। তাই ভয়টা সরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাগত জ্ঞানটাও মনের স্ফুটতর অংশগুলি থেকে সরে যায়। যে শিক্ষক ভয় দেখিয়ে পড়া আদায় করেন তিনি ক্লাস ছেড়ে বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্ররা হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। আর দারুণ পরিশ্রম করে যে জিনিসগুলো মুখস্থ করে এনেছিল, কয়েক ঘন্টার মধ্যে তা' আবছা হ'য়ে যেতে থাকে। পরীক্ষার ভয়ে ছেলেরা যখন চাপ দিয়ে পড়াশুণা করে তখন দেখা যায় দশদিনের কাজ এক ঘন্টায় হ'য়ে যাচ্ছে; কিন্তু পরীক্ষার ল্যাঠা চুকে যাবার পর একবার ফুটবল গ্রাউন্ড, বা সিনেমা হাউস থেকে ঘুরে আসার সঙ্গে সঙ্গে অধীত বিষয় অনেকখানি ভুলে যেতে হয়, কারণ ভয়ের কারণ আর তখন উপস্থিত থাকে না। ভয় দেখিয়ে লেখাপড়া শেখাবার কুফল পৃথিবীর অনেক দেশের অধিবাসীরাই হাড়ে হাড়ে ভুগে চলেছে। অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যষ্টিই বিদ্যালয়ে বা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডী ডিঙ্গিয়ে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করবার সঙ্গে

সঙ্গে নিজের শিক্ষাগত যোগ্যতার অধিকাংশই হারিয়ে ফেলে থাকেন। এই সমস্ত লোকের বিদ্যার যদি মূল্য–নির্ধারণ করতে যেতে হয়ে তাহলে বলতে হয় এদের ক্ষেত্রে সময়, সামর্থ্য ও পরিশ্রমের অধিকাংশ ভাগই মূল্যহীন বা ব্যর্থ হ'য়ে গেছে।

হ্যাঁ, তাই বলছিলুম, ভয় দেখিয়ে কিছু শেখাৰার চেষ্টা করা চলবে না। জ্ঞানের ক্ষুধা জাগিয়ে দিতে হবে আর তার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুধানিবৃত্তির ব্যবস্থা হিসাৰে যথোপযুক্ত শিক্ষা দিতে হবে। তবেই সে শিক্ষা সার্থক হৰে। তৰেই তা' ছাত্রের শরীর, মন ও আদর্শকে ঠিকভাবে গড়ে দেবে।

শিশুমনের ঝোঁক খেলার দিকেই সৰ চাইতে বেশী। তাই খেলার মাধ্যমেই তার জ্ঞানতৃষ্ণা জাগিয়ে' দিতে হবে। খেলার মাধ্যমেই তাকে শিক্ষা দিতে হবে। শিশুর মনে গল্প শোণার ঝোঁকও থাকে। গল্পের মাধ্যমে সহজেই তাকে বিভিন্ন দেশ বিদেশের ইতিহাস ভূগোল শিখিয়ে' দেওয়া যেতে পারে। বিশ্বকে আপন করে নেবার সাধনার হাতেখড়ি দেওয়া যেতে পারে।

ৰালকের মনে খেলা আর গল্প দু'য়ের ঝোঁকই প্রায় সমান সমান। তাই তাদের বেলায় এ দুটো সুযোগই সমান ভাবে

নিতে হবে। কিশোরের মনে ভবিষ্যতের স্বপ্ন প্রথম দানা বাঁধতে আরম্ভ করে। তাই কোন প্রকার সঙ্কীর্ণতাকে প্রশ্রয় না দিয়ে আদর্শবাদের মাধ্যমে তাদের শিক্ষা দেওয়া বাঞ্ছনীয়। যুবকের মন কিছুটা বাস্তবতার দিকে যেতে আরম্ভ করে। তাই সেখানে নিছক আদর্শবাদ বিশেষ কাজ করবে না। তাদের শিক্ষা দিতে গেলে আদর্শবাদের সঙ্গে বাস্তবতার সংমিশ্রণ ঘটাতে হবে।

শিক্ষককে মনে রাখতে হৱে শিশু, বালক, কিশোর, যুবক বা বৃদ্ধ- শিক্ষার্থী যে বয়সেরই হোক না কেন তার কাছে সে বিভিন্ন বয়সের শিশুমাত্র। আর সে নিজেও তাদের মত শিশু। নিজেকে তাদের থেকে দূরে সরিয়ে রাখলে বা সর্বদা কষ্টকল্পিত গাম্ভীর্য বজায় রাখৱার চেষ্টা করলে আর যাই হোক ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপিত হবে না। আর ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপিত না হ'লে ভাবের আদান-প্রদান যথাযথভাবে সম্পাদন হওয়া কিছুতেই সম্ভব হবে না। এই ভালবাসার সম্পর্কের অভাবের দরুণই অনেক ছেলে কড়া শিক্ষকের বা প্রহারপটু পিতামাতার মৃত্যুকামনাও মনে মনে করে থাকে।

সদ্য-স্বাধীনতাপ্রাপ্ত অনেক দেশেই শিক্ষাব্যবস্থাকে জাতীয় ছাঁচে ঢালবার একটা প্রয়াস দেখা যায়। এমনধারা কোন

প্রয়াসের সার্থকতা কতখানি তা' নিয়ে আপাততঃ আলোচনা না করেও এ কথাটুকু নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে তা'তে যদি ছাত্রের প্রয়োজন ৰোঝাৰার চেষ্টা না থেকে থাকে তবে তা' হয়তো জাতীয় শিক্ষা হলেও হ'তে পারে কিন্তু মানবিক শিক্ষারূপে গণ্য হ'তে পারে না। প্রাদেশিকতা বা সাম্প্রদায়িকতার মত জাতীয়তাও (nationalism) শিশুমনের মারাত্মক ক্ষতি করে। এতে তার স্বচ্ছ বিচার-বুদ্ধি অনেকখানি নষ্ট হ'য়ে যায়। "আমার দেশের জিনিসই ভালো, আর কারুর কাছ থেকে কিছুই শিখৰার নেই-এ রকম সম্ভাবনাও যে কোন সময়ে থেকে যেতে পারে। "সব কিছুই বেদে আছে", "অমুক মহাপুরুষ আমাদের জন্যে যে সমাজ-ব্যবস্থা বেঁধে দিয়েছিলেন তা'র একচুলও নড়চড় হ'তে পারে না-তা' স্বয়ং ঈশ্বরেরই বাণী," "আমাদেরই রামায়ণ-মহাভারতে পড়ে' অমুক দেশ এরোপ্লেন তৈরী করতে শিখেছিল"- এ জাতীয় উক্তি ছাত্র মনে সেই জাতীয়, ধর্মীয় (অর্থাৎ রিলিজন-সংক্রান্ত) বা সাম্প্রদায়িক স্থবিরতা ইনজেক্ট করারই পরিণতি মাত্র।

অত্যুগ্র জাতীয়তাৰোধ শিক্ষাব্যবস্থার প্রবক্তাদের ঘাড়ে ভূতের মত চেপে বসলে, তাঁরা অনেক সময়ে জাতীয় বৈশিষ্ট্যের নামে দেশের ছাত্রদের অবশিষ্ট পৃথিবী থেকে পৃথক

করে রাখার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন। সব সময়েই মনে রাখা উচিত যে, যে সূত্রগুলিকে আশ্রয় করে মানুষ মানুষের কাছে আসার সুযোগ পেয়েছে সেগুলোকে ছিঁড়ে না ফেলে অধিকতর মজবুত করাতেই মানুষের সামূহিক কল্যাণের বীজ নিহিত রয়েছে। এই সত্যিকারের কল্যাণকে রূপ দিতে গেলে হয়তো জাতীয়তাবাদের উগ্র খেয়ালে খানিকটা ধাক্কা পড়ে, কিন্তু বুদ্ধিমান মানুষকে সে ধাক্কা সামলে খেয়াল কাটিয়ে উঠতেই হবে।

মানুষের মিলনের সূত্রের কথা বলছিলুম। এই ধরুন, পরাধীন অবস্থার পাকিস্তান বা ভারতবর্ষের কথা। ইংরেজী ভাষা–যদিও তা' সাগর পার থেকে এসেছিল, তবুও সেই ভাষাই ভারতের বিভিন্ন অধিবাসীর মধ্যে মিলনের যোগসূত্র রচনা করে দিয়েছিল। শুধু তাই নয়, ভারতের অধিবাসীর সঙ্গে অবশিষ্ট পৃথিবীর পরিচয় হয়েছিল এই ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে। সে যুগের ভারতের ছাত্ররা মোটামুটি দু'টো ভাষা–মাতৃভাষা ও ইংরেজী– শিখেই জ্ঞানমন্দিরের চাবিকাঠি হস্তগত করবার পুরো সুযোগ পেয়ে যেতো। আজকের ভারতে কেউ যদি ইংরেজী ভাষাকে সরিয়ে' দেওয়ার চেষ্টা করে, তার প্রচেষ্টা সেই যোগসূত্র ছিন্ন করার প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়।

নেতাদের রাজনৈতিক খেয়াল চরিতার্থ করতে গিয়ে ছাত্রদের ঘাড়ে ভাষার বোঝা চাপানো কোন ক্রমেই যুক্তিযুক্ত নয়। ভাবুন, বর্তমান পাকিস্তানের একজন সিন্ধীভাষী ছাত্রের কথা। তাকে ক'টা ভাষা শিখতে হবে! প্রথম, মাতৃভাষা সিন্ধী; দ্বিতীয়, বিশ্বভাষা ইংরেজী; তৃতীয়, ধর্মভাষা আরবী (অথবা ফার্সী); চতুর্থ, রাষ্ট্র ভাষা উর্দু বা ৰাংলা অথবা ভালো চাকুরী পেতে গেলে দুটোই; অর্থাৎ কিনা একটা ছাত্রের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে পাঁচ–পাঁচটা ভাষা। ছাত্র জ্ঞান আহরণ করবে–না, ভাষার বোঝা বয়ে বেড়াবে? অথচ জাতীয়তাবাদের (nationalism) ঝোঁক একটু সংযত করতে পারলে অনায়াসেই মাতৃভাষা ও ইংরেজী এ দুটো ভাষা বাদে বাকীগুলোকে অবশ্য পাঠ্যবিষয়ের তালিকা থেকে ছেঁটে ফেলা যেতে পারে। প্রথমোক্ত দু'টি ভাষার মাধ্যমেই সে যদি জ্ঞান আহরণ করে বা জ্ঞানতৃষ্ণা জাগিয়ে' তুলতে পারে, তবে পরবর্তী কালে সে আর তিনটি কেন আরও দশ বিশটি ভাষাও নিজের আগ্রহে শিখে নেৰে। স্কুল বা কলেজেও বৈকল্পিক বিষয় হিসেবে যত বেশী সংখ্যক ভাষা রাখা যায় ততই ভালো। কারুরই তার বিরুদ্ধে কিছু বলার থাকতে পারে না।

বিশ্বমানবের ভাবের আদানপ্রদানের জন্যে একটি বিশ্বভাষা থাকা দরকার – ও ওই ভাষা সর্বদেশেই সমান গুরুত্বপূর্ণভাবে

পঠিত ও পাঠিত হওয়া উচিত। ভাষার প্রচার, বোধগম্যতা ও ভাব-প্রকাশনী শক্তির কথা ভেবে দেখলে বর্তমান পৃথিবীতে ইংরেজীই বিশ্বভাষারূপে স্বীকৃতি পাবার যোগ্য। তাই পৃথিবীর প্রতিটি মানুষেরই উচিত ইংরেজীকে কেবল ইংল্যাণ্ডের ভাষা হিসেবে না দেখে' সহজ মনে সকলের ভাবগত আদান-প্রদানের সাধারণ ভাষারূপে গ্রহণ করা। এতে কারও মাতৃভাষারই বিন্দুমাত্র ক্ষতি হবে না।

মিথ্যা ইজ্জৎবোধ যদি এই বিশ্বভাষার পঠন-পাঠনকে বিঘ্নিত করে মানুষ সমাজের পক্ষে সেটা নিশ্চয়ই খুব গৌরবের কথা হবে না। একদেশের মানুষ সর্বকালের জন্যে অন্য দেশের মানুষের কাছে দুর্বোধ্য হ'য়ে থাকুক এ অবস্থাটা নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয় নয়। অবশ্য দূর ভবিষ্যতের মানুষ ইংরেজীর পরিবর্তে সেকালের প্রয়োজন মত অন্য কোন ভাষাকেও বিশ্বভাষারূপে নির্বাচন করতে পারে কারণ ইংরেজীরও চিরকাল এক অবস্থা থাকবে না।

বড়দের জাতীয়তা (nationalism), সাম্প্রদায়িকতা বা অন্য কোন "ইজম্”-এর খেয়াল-খুশীর খেসারৎ যোগাবার ভার ছোটদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া খুবই অন্যায়। আজকের শিশুকে ভবিষ্যতের কী ধরণের নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা

হবে ও তাদের সেভাবে গড়ে তুলতে গেলে কী ধরণের শিক্ষা দেওয়া উচিত তা অবশ্য বড়রাই নির্ধারণ করবে; কিন্তু এ নির্ধারণের ব্যাপারে খেয়াল-খুশীকে বা বড়দের সুবিধাকেই ষোল আনা গুরুত্ব দিলে চলবে না। ছোটদের সুখ-সুবিধার দিকেও তাকিয়ে দেখতে হৰে।

ছাত্ররা বিদ্যালয়ে যায় বা পরীক্ষা দেয় পাশ করার জন্যে। পরীক্ষককে সর্বদা এ কথাটা মনে রাখতে হবে। "শতকরা এত জনকে পাশ করাৰ" এই ধরণের কোটা ধরে বসে' থাকলে চলবে না। ছাত্রের জ্ঞান কতটুকু, তার জানবার ইচ্ছা কতখানি, পরীক্ষক সেইটাই বিচার করে দেখবেন। কোথায় "i" এ বিন্দু বসে নি, "দ"-এ মাথা কাটা যায়নি বা পাণ থেকে কতখানি চুণ খসেছে তাই নিয়ে তাঁরা মাথা না ঘামালেও পারেন।

শিক্ষক ও শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে এই কথাগুলো বলার পরে এমন আরও দু'চারটে কথা বলা যায় যেগুলো সম্পূর্ণভাবে আদর্শগত ব্যাপার। আর যে জন্যে শিক্ষকদের সুবিধা-অসুবিধা বা শিক্ষা-ব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতি কোনটার দোহাই পাড়া যাবে না; যেমন, ধরুন, যে মনোভাব নিয়ে ছাত্রদের কাছে জ্ঞান বিতরণ করা হয় খুব কম ক্ষেত্রেই দেখা যায়

শিক্ষক ছাত্রের মধ্যে জ্ঞান আহরণের ইচ্ছা বা চেষ্টা না জাগিয়ে যে কোন রকমে তাদের কাছ থেকে ঠিক উত্তরটুকু আদায় করে নিতে চান। কোথাও বা লেচার (lecture) দিয়েই দায়ে-খালাস হতে চান। বলা বাহুল্যমাত্র, এ কথাগুলো অপ্রিয় সত্য। অতীতে এমন অবস্থা ছিল কি ছিল না তা' ঐতিহাসিকদের বিচার্য। ভবিষ্যতেও আশা করি এমন অবস্থা থাকবে না, কিন্তু বর্তমানে যে আছে এ কথা সৰাই স্বীকার করতে বাধ্য। হতে পারে কিছু সংখ্যক শিক্ষকের এই শিক্ষাব্রতী-বিরুদ্ধ ভাবের জন্যে গোটা শিক্ষক সমাজকেই উপহাসের পাত্র হতে হয়। তবু ৰলৰ যাঁরা সত্যিকারের শিক্ষাব্রতী; যাঁদের হাতে নিজের ইচ্ছামত কাজ করৰার বা অন্যকে দিয়ে কাজ করাৰার কিছুটাও ক্ষমতা আছে তাঁদের উচিত এ সম্বন্ধে অত্যন্ত কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা। এ কাজ যাঁরা শিক্ষকতা-কার্যে প্রত্যক্ষ ভাবে নিরত রয়েছেন তাঁদের দ্বারাই সম্ভব। এ কাজ বিদ্যালয়-পরিদর্শকের দ্বারা সম্ভব নয়। শিশু-মানসে অথবা যে-কোন ছাত্রের মনেই জ্ঞানের ক্ষুধা জাগিয়ে না দিলে কেবল কুইনিনের মত গিলিয়ে খাওয়ানোর চেষ্টা করতে গেলে তাতে করে মানুষ সমাজের সত্যিকারের কল্যাণ হবে না।

আদর্শের কথা বলতে গিয়ে আর একটা কথাও মনে জাগছে। সেটা হচ্ছে শিক্ষকের নৈতিক-চরিত্র ও ব্যবহার।

সূচীপত্র

অনেক শিক্ষকের ভাষায় সংযমের রীতিমত অভাব দেখা যায়। অনেক শিক্ষক ক্লাসে ছাত্রগণকে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহারের কথা পড়িয়ে ক্লাসের বাইরে এসে ধূমপান করতে থাকেন। এগুলো অত্যন্ত অসৎ দৃষ্টান্ত; বরং মাদক-দ্রব্যের কথা না শুনিয়ে যদি তাঁরা মাদক-দ্রব্য ব্যবহার করতেন তবে তার ফল হয়তো তেমন কিছু খারাপ হত না। কিন্তু এ রকম ক্ষেত্রে স্বাভাবিক নিয়মেই ছাত্রমনে উচ্ছৃঙ্খলতা প্রশ্রয় পাবে। তারা ভাবৰে জিনিসটার ব্যবহার নিশ্চয় আরামদায়ক তাই শিক্ষক আমাদের বঞ্চিত রেখে সে আরামটা নিজেই উপভোগ করতে চান।

অনেক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের মধ্যে দুই বা ততোহধিক দল থাকে। প্রত্যেক দলের শিক্ষকই ছাত্রগণকে নিজের দলে টানবার চেষ্টা করেন। তাদের কাছে অন্য দলভুক্ত শিক্ষকদের নিন্দা করে তাদের মনে তাঁদের সম্বন্ধে অশ্রদ্ধার ভাব সৃষ্টি করবার চেষ্টা করেন। যার ফলে শেষ পর্যন্ত ছাত্রদের মনে বেশ একটা শৃঙ্খলা বিরোধী ভাবও জেগে যায়। "আজকাল ছাত্রেরা নিয়ম-শৃঙ্খলা মানে না" এ কথা বলে অনুশোচনা করা নিষ্ফল, কারণ যাঁরা তাদের নিয়ম-শৃঙ্খলা শেখাবেন তাঁরা যদি কর্তব্য পালন না করেন তবে দোষ কি ছাত্রদের? অনেক শিক্ষক বা অধ্যাপক সক্রিয়ভাবে

রাজনীতিতে অংশ নিয়ে থাকেন, আর তাঁরা ছাত্রদের ওপর তাঁদের ব্যষ্টিগত প্রভাবের অপপ্রয়োগ করে সেই সরলমনা আদর্শবাদী তরুণ ছাত্রগণকে নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেন। এতে করে ছাত্ররা নিয়ম-শৃঙ্খলা শিখৰে কি করে? কারণ রাজনীতি জিনিসটা- অন্ততঃ রাজনীতি বর্তমান পৃথিবীতে যে ভাবে রয়েছে সে তো একটা স্রেফ পারস্পরিক কর্দম-নিক্ষেপের ব্যাপার। সাধুতা, সরলতা, শৃঙ্খলা-বোধ কোনটাই সেখানে নেই। "যেন তেন প্রকারেণ প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করো"-এইটেই তার ধর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। ছাত্রদের এই অতিরিক্ত রাজনীতি-প্রবণতা তাদের মধ্যেকার শৃঙ্খলাহীনতার সর্বপ্রধান কারণ। অবশিষ্ট কারণগুলি নিতান্তই গৌণ ও সেগুলো নির্ভর করে অর্থাশ্রয়ী সমাজ ব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতির ওপর। অবশ্য শিক্ষা-ব্যবস্থা বা অভিভাবকের আচরণ শৃঙ্খলা-ৰোধ জাগাবার কাছে একেবারে উপেক্ষণীয় বিষয় নয়।

যে কোন কারণেই হোক একদিন যাঁরা ছাত্রগণকে রাজনীতিতে নাৰিয়েছিলেন আজ তাঁরা তাদের রাজনীতি ত্যাগ করার জন্যে যতই উপদেশ দিন না কেন, তাতে বিশেষ ফল হৰে বলে মনে হয় না। বর্তমানে অবস্থাটা এমন একটি স্তরে এসে পৌঁছেছে যে শুকনো উপদেশ-নির্দেশে কাজ হবে না, এ

জন্যে শিক্ষা-ব্যবস্থারই ধারা-পরিবর্তন করতে হবে। ছাত্র-মনস্তত্ত্ব বুঝে উপযুক্ত শিক্ষার দ্বারাই তাদের মধ্যে শৃঙ্খলা-বোধ জাগিয়ে দিতে হবে।

শিশুরা বিদ্যালয়ে যাবার আগে তার পারিবারিক পরিবেশের প্রভাবে একটা বিশেষ ছাঁচে ঢালা মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই শিক্ষকের কাছে উপস্থিত হয়। তার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যালয়েই সে ভাল বা মন্দ যতকিছুই, বা যা' কিছুই শিখুক না কেন, পারিবারিক প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া তার পক্ষে রীতিমত কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়।

অপরিস্ফুট শিশুমন তার পারিবারিক পরিবেশের শিক্ষাতে জগৎকে চিনতে শেখে, বুঝতে শেখে, ভাবগ্রহণের সুযোগ পায়, ভাব প্রকাশের ভাষা পায়। বাড়ীর বড়রা তাকে পৃথিবীকে যে ভাবে দেখতে শেখায়, দুনিয়ার যে রঙটি তার সামনে তুলে ধরে সে যন্ত্রের মত তা-ই মেনে চলে বিনা দ্বিধায়, বিনা বাদ-প্রতিবাদে। শিশুকে পৃথিবীর সামনে পরিচিত করবার প্রাথমিক দায়িত্ব তাই পিতামাতা বা অভিভাবকদের উপরই ন্যস্ত হয়। তাঁরা তাঁদের এই দায়িত্ব যে ভাবে বা যতটুকু সম্পাদন করেন, সমাজ পরবর্তী কালে সেই শিশুকে সে ভাবে বা ততখানি সম্পদরূপেই পেয়ে থাকে। এ কথা বলতে কোন

দ্বিধা নেই যে এখনও পৃথিবীতে শিশুমনকে ঠিকভাবে গড়ে তোলবার বিজ্ঞান প্রাপ্তবয়স্কেরা আয়ত্তে আনতে পারেন নি। প্রাপ্তবয়স্ক জনসাধারণের কথা দূরে থাকুক, শিক্ষিত মার্জিতরুচি তথাকথিত অধিকাংশ ভদ্রলোকও এ ব্যাপারে হয় অজ্ঞ অথবা স্বেচ্ছাকৃতভাবে উদাসীন। তাঁদের অজ্ঞতা হয়তো ক্ষমার্হ কিন্তু উদাসীনতাকে কি করে ক্ষমা করতে পারি? যে পরিবার শিশুকে তার আপনজন হিসেবে নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করেছে, তার শারীরিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক স্ফুরণের প্রাথমিক দায়িত্ব সেই পরিবারকে নিতে হবে বৈকি।

বলা যেতে পারে শিক্ষকদের সমস্যার মত সাধারণ মানুষের জীবনেও বহু প্রকারের সমস্যা রয়েছে, ও আসলে শিক্ষকদের সমস্যাটা সেই বৃহৎ সামাজিক সমস্যাটার অংশ মাত্র। এ কথা খুৰই ঠিক যে দেশ–কাল–পাত্রকে জয় করৰার একটা দুরন্ত প্রয়াস বস্তুতান্ত্রিক জগতে দেখা দিয়েছে। এই প্রয়াস মানুষকে যেন টেনে–হিঁচড়ে সামনের পানে নিয়ে যেতে চায়। কল্যাণ হোক বা না হোক গতিই যেন মূলমন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে ও এর ফলে সমাজের বিভিন্ন ধারাগুলি একে অন্যের সঙ্গে যথাযথভাবে সঙ্গতি রেখে এগিয়ে চলতে পারছে না। কোনটা খুব বেশী এগিয়ে যাচ্ছে, কোনটা খুব বেশী পেছিয়ে যাচ্ছে, ও তার ফলে সামাজিক কাঠামোর কোন

একটা অংশ অপর অংশ থেকে খুব বেশী দূরে চলে যাচ্ছে বা খুব বেশী কাছে চলে আসছে, তাতে করে গোটা সামাজিক কাঠামোটাই ভেঙ্গে পড়ছে। খড়ের চাল তেমনই রয়েছে, চাল ফুটো করে এসে গেছে বিদ্যুতের তার। খাদ্য জুটছে নুন আর পান্তা ভাত কিন্তু সাবেকী উনুনের পরিবর্তে এসেছে ইলেকট্রিক হিটার (electric heater)। সমাজ-জীবনে চলছে এই রকমের অসঙ্গতি। জীবনের বিভিন্ন ধারাগুলিকে কেন্দ্র করে মানসদেহে যে ভাবগুলো অধিষ্ঠিত হয়ে থাকে তাদের একের থেকে অন্যের ব্যবধান অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে গেছে, যার ফলে মনেরও স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়ে গেছে। যে কোন রকমে ভাবলেশহীন যন্ত্রবৎ সত্তাগুলোকে নিয়ে দিনগুলোকে কাটিয়ে যাওয়া ছাড়া মানুষ যেন আর সব কিছুই ভাববার কথা হারিয়ে ফেলেছে। এই চলছে সমাজ-জীবনের অবস্থা। তাই আজকের দিনের অভিভাবকেরা হয়তো সঙ্গত ভাবেই বলতে পারেন যে এই ঘাত প্রতিঘাতের সঙ্গে যুঝে আমাদের প্রাণশক্তি সবটুকুই নিঃশেষ হয়ে গেছে। তাই অন্তরের কোমলতা দিয়ে শিশুমনকে সযত্নে গড়ে তোলৰার মত সুযোগ আমাদের আর নেই। মনের সমস্ত মাধুর্য, সমস্ত সুকুমার বৃত্তি বাস্তবের কঠোরতা শুষে নিচ্ছে; শিশুর জন্যে যত্ন কি করে নোৰ! তাদের ঠিকমত খেতে পরতেই তো দিতে পারি নে, তাদের মনস্তত্ত্ব করে বিচার করব, বিচার করৰার মত অবকাশ

আমাদের আছে কি? জানি, শিশুকে খেলাধূলো বা আনন্দানুষ্ঠানের মাধ্যমেই ঘরে-বাইরে শিক্ষা দিতে হয়, কিন্তু সেটা কি আমাদের পক্ষে সম্ভব? আমরা তো বাড়ীর মেধাবী ছেলেকেও পড়া ফেলে রেখে মুদীর দোকানে নুন-তেল-মশলা কিনতে পাঠাই; বুঝি, তা' অন্যায়, কিন্তু তবু তো উপায় নেই। কারণ চাকর রাখা আমাদের আর্থিক সামর্থ্যের বাইরে।" কথাগুলো হয়তো সমস্তই ঠিক, তবু এ ঠিক কথাগুলো এখানে আলোচ্য বিষয় নয়। জগৎ সম্বন্ধে শিশুর একটি সুষ্ঠু মনোভাব গড়ে তুলে দিতে গেলে সব চাইতে যে জিনিসটি বেশী দরকার, সেটি হচ্ছে একটি বলিষ্ঠ আদর্শবাদ; আর শিশুকে তা দিতে গেলে অভিভাবকের পক্ষে কেবল মাত্র দুটো গুণ-সংযম ও সুবিবেচনা-এই দুটোরই প্রয়োজন। প্রথমে ধরা যাক সুবিবেচনার কথা। শিশুমনকে ভয় দেখিয়ে, কার্যোদ্ধারের চেষ্টা কেবলমাত্র একটি বিশেষ শ্রেণীর শিক্ষকেরাই যে করে থাকেন তা' নয় এ ব্যাপারে বাড়ীর লোকের ত্রুটি আরও গুরুতর। তাঁরা শিশুকে ভয় দেখান, শিশুর কাছে মিথ্যা বলেন, শিশুর সামনে গালিগালাজ কলহ করেন, শিশুকে ঠকান, নির্যাতন করেন অথচ কামনা করেন শিশু একদিন সমাজে গণ্যমান্য হোক, বংশের মুখ উজ্জ্বল করুক। শিশু ঘুমুতে চাইছে না, দুধ খেতে চাইছে না-তাকে জুজুর ভয়, ভূতের ভয় দেখানো হয়। শিশু নির্ভীক-তার সামনে

বিভীষিকা তুলে ধরা হয়। এতে করে হয়তো অভিভাবকের সাময়িক লাভ হয়, কিন্তু শিশুর যে ক্ষতি হয় তা' গোটা জীবনের খেসারতেও পূর্ণ করা যায় না। সেই শিশু যখন শক্তিশালী যুবকে পরিণত হয় তখনও তার মন থেকে জুজুর ভয় সরতে চায় না, ভূত তার মনে স্থায়ীভাবে বাসা বেঁধে থাকে। অভিভাবক হয়তো কোন দূর দেশে যাচ্ছেন অথবা কোথাও কোন অভিনয়ে বা আনন্দানুষ্ঠানে যাচ্ছেন বা সামাজিক নিমন্ত্রণ–রক্ষা করতে চলছেন। সে অবস্থায় শিশুও যদি সঙ্গে যাৰার আবদার করে তাঁরা শিশুর কাছে বেমালুম মিথ্যা কথা বলেন। শিশুকে তাঁরা কোন রকমে ভুলিয়ে রেখে বেরিয়ে পড়েন। শিশু যখন জানতে পারে তাকে মিথ্যা কথা বলা হয়েছিল, সেও তখন মিথ্যা কথা বলতে শেখে ও মনের ইচ্ছা বা কৃতকর্ম অভিভাবকের কাছে লুকিয়ে রাখবার জন্যে ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে মিথ্যার আশ্রয় নিতে থাকে।

অভিভাবকেরা শিশুকে নানান ভাবে ঠকিয়ে থাকেন। মিষ্ট জিনিসকে তিক্ত বলে, ভোগ্যকে অভোগ্য বুঝিয়ে শিশুকে তাঁরা সেই জিনিসগুলো থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চান। কিন্তু মানুষের যা স্বাভাবিক বৃত্তি অর্থাৎ 'নিষেধের গণ্ডী ডিঙ্গিয়ে' উঁকি মেরে দেখতে গিয়ে শিশু যখন প্রকৃত জিনিসটি জানতে পারে, তখন সে বুঝতে পারে যে তার অভিভাবক এ পর্যন্ত

তাকে কেবল ঠকিয়েই এসেছে তখন সে তাদের ও নিজের সঙ্গী সহপাঠীকেও ঠকাতে আরম্ভ করে দেয়। তা' হলে দেখা যাচ্ছে শিশু মিথ্যা বলতে বা লোক ঠকাতে শেখৰার প্রথম হাতে খড়ি বাড়ীর লোকদের কাছ থেকেই পেয়ে থাকে।

বাড়ীতে বড়দের মধ্যে অনেক সময়ে অনেক ব্যাপারে মতভেদ দেখা দিতে পারে, যদিও সে সমস্ত ক্ষেত্রে বড়দের উচিত প্রত্যেকের মতের প্রতি উচিত শ্রদ্ধা রেখে একটা মীমাংসার সূত্র বার করে নেওয়া। অনেক সময় দেখা যায় তাঁদের মধ্যে এই বোঝাপড়ার মনোভাবের বেশ অভাব রয়েছে। অন্যের মতামতের কথা না ভেবে প্রত্যেকেই নিজের মতটাকেই প্রতিষ্ঠিত করৰার চেষ্টা করতে থাকেন আর তার ফলে অন্যায় জেদের বশে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে তাঁরা ইতরের মত আচরণও করে বসেন। শিশু মনে এর প্রভাব অত্যন্ত মারাত্মক হয়ে থাকে। বাড়ীর লোকের কাছ থেকেই শিশুরা জেদ করতে শেখে। মা বা যার কাছে শিশু সব চাইতে বেশী থাকে তার মধ্যে জেদের ভাব বেশী থাকলে অনাদৃত শিশুর মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জেদ প্রকট ভাবে দেখা দেয় ও দীর্ঘকাল ধরে তা' একটা মানসিক ব্যধিরূপে তাকে বহন করে বেড়াতে হয়। সম্ভবক্ষেত্রে শিশুর অভিলাষগুলো (যদি তা' অন্যায় না হয়) পূর্ণ করে গেলে শিশু জেদ তৈরী করার

সুযোগ পায় না। যে সংসারে দারিদ্র্য বা অন্য কোন কারণে বাড়ীর বড়রা মানসিক শান্তি হারিয়ে ফেলেছে তারা কারণে অকারণে ছেলে মেয়েদের ওপর নির্যাতন চালায়। স্বাভাবিক নিয়মেই এতে ছোট ছেলেমেয়েরা বড়দের ওপর থেকে শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলে। তাদের এই শ্রদ্ধাহীনতা পারিবারিক বিশৃঙ্খলা আরও উগ্রভাবে জাগিয়ে দেয়, অশান্তির ওপর আরও একটা অশান্তি বড়দের ব'য়ে বেড়াতে হয়। যে সমস্ত অভিভাবককে মজুর অথবা অধস্তন কর্মচারিগণকে রীতিমত হাতে পায়ে খাটিয়ে কাজ আদায় করতে হয় (যেমন পূর্ত বিভাগ, পুলিশ বিভাগ প্রভৃতি মধ্যম বা উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের) তাঁরা প্রায়ই মিষ্টিমুখে কথা বলা ভুলে যান। অনেকে সর্বদাই আদেশের ভাষা, কেউ কেউ বা গালিগালাজের ভাষা ব্যবহার করতে অভ্যস্ত হয়ে যান। এদের বাড়ীর ছোট- ছেলেমেয়েরাও তাই সংযত ভাষার ব্যবহার শিখবার সুযোগ পায় না। বন্ধু- -সমাজেও তারা বেশ একটা মহাম্মন্যতার (superiority complex) ভাব নিয়ে থাকে। পাঁচজনকে ভালবেসে বেশ একটা সুন্দর সামাজিক পরিবেশ গড়ে তোলা উত্তর কালে এদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

অভিভাবকেরা অবশ্যই বলতে পারেন যে আজকের এই সমস্যা- কণ্টকিত যুগে যাদের এত ধান্দায় ব্যস্ত থাকতে হয়

যে সব দিকে তাল বজায় রেখে তাদের পক্ষে চলা অসম্ভব। তবু ৰলৰ যে ওপরে যে ত্রুটিগুলো দেখানো হল সেগুলো সামলে চলা কোন বুদ্ধিমান অভিভাবকের পক্ষে অসম্ভব নয়। এটুকু কর্তব্য পালন না করলে বলতে হবে তাঁরা সমাজের মধ্যে থেকে সমাজবিরোধী মনোভাবকেই প্রশ্রয় দিচ্ছেন। শিশুমনকে অপরাধপ্রবণ করে দিয়ে অযথা পুলিশ-বিভাগের হয়রানি বাড়িয়ে চলেছেন। আর সব চাইতে বড় কথা এই যে তাঁদের সামান্য একটু সতর্কতার অভাবে একজন মানুষদেহধারী জীব সত্যিকারের মানুষ ৰলে পরিচয় দেবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে!

অভিভাবক ও শিক্ষক ছাড়াও আরেক শ্রেণীর লোক আছেন যাদের শিশুশিক্ষার দায়িত্ব থেকে সম্পূর্ণ রেহাই দিতে পারি নে-তাঁরা হচ্ছেন সাহিত্যিক। প্রকৃত পক্ষে এই সাহিত্যিকেরাও একশ্রেণীর শিক্ষক-তাঁরা সমাজ-শিক্ষক।

দূরের ক্ষুধা মানুষের মজ্জাগত। যেটিকে হাতের কাছে পাওয়া যায় তাতে কারুরই তৃপ্তি হয় না। মন ভরে তো প্রাণ ভরে না। আর তাই ৰাস্তবের সত্যতার চাইতে স্বপ্নের মায়ালোক বেশী মধুর। সাহিত্যিক স্বপ্নের মায়ামুকুরে বাস্তবের ছবি ফুটিয়ে তোলেন। আর তাই তা' মানুষ মনকে খুৰ

সহজেই আকৃষ্ট করে। এই স্বপ্নের ঘোর শিশুমনে সব চাইতে বেশী। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবের কশাঘাতে সে যত ধাতস্থ হতে থাকে ততই তার এ ঘোর কেটে যেতে থাকে। স্বপ্ন লোকের মুকুরকে সে তাই বাস্তবের কাছটিতে নাৰিয়ে এনে জীবন চিত্রের প্রতিফলন দেখতে চায়, কিন্তু শিশুমনে তো জিনিসটা তা' থাকে না। তারা স্বপ্নের আকাশে রামধনুর পানে তাদের সোণার পক্ষীরাজকে ছুটিয়ে দিতে চায়, চাঁদ আর তারাগুলোকে নিয়ে' দু হাতে পুতুল খেলা খেলতে খেলতে তারা নাম-না-জানা দেশের দিকে ছুটে' যেতে চায় আর এই ছোটার ঝোঁকে ঘুমপাড়ানি গানের মোহে ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে' পড়ে। শিশুমনের এই বিশেষ লক্ষণটুকু ভালভাবে বুঝে' নিয়ে যে সাহিত্যিক তাঁর কলম ধরেন, তিনি অনায়াসেই সেই শিশুচিত্তকে জয় করে ফেলেন। আর তাঁর হাতে গড়া খোকা-খুকুরা খুব সহজ ভাবেই তাঁর শেখানো কথাগুলো, তাঁর উপদেশগুলো মাথা পেতে গ্রহণ করে। তাই বলছিলুম সাহিত্যিকরা সমাজ-শিক্ষক। এই শিক্ষকরা 'যদি নিজেদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হন তাহ'লে বাড়ীর অশিক্ষা সত্বেও শিশুদের ভ্রান্ত পথ থেকে প্রতিনিবৃত্ত করা যেতে পারে। হাল্কা ডিটেক্টিব উপন্যাস বা এ্যাডবেঞ্চার অথবা নিছক জাতীয়তা বা সাম্প্রদায়িকতামূলক গল্পের বই ছোটদের আকৃষ্ট করে বটে, কিন্তু বিচার-বুদ্ধির ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে দেউলিয়া করে দেয়।

মহামানবদের জীবনী ছোটদের কাছে বেশ একটা প্রেরণা নিয়ে আসে যদি তা' সহজ ও চিত্তাকর্ষক ভাষায় লেখা হয়। এ জায়গায় আমি মহামানব বলতে তাদের কথাই ভাবছি যাঁরা গোটা মানবজাতের জন্যেই ভেবে গেছেন। মহা- ভারতীয়, মহা-ইংরেজ, মহা-রুশী বা মহা-মার্কিনের কথা ভাবছি না; মানুষ- সমাজে নিজেকে মানুষ বলে পরিচয় দেবার লোকের বড্ড বেশী অভাব। কেউ সংস্কারের বশে, কেউ ভয়ে, আর কেউ সব কিছু জেনে বুঝে' স্বার্থের বশে মানুষ জাতটাকে টুকরো টুক্রা ভাবে দেখতে চায়। তারা তাদের এই মানসিক ত্রুটি সাহিত্যের মাধ্যমে শিশুমনেও সংক্রমিত করতে চায় যাতে করে উত্তরকালে সেই শিশুরাও তাদের ঠিক তল্পিবাহক হ'তে পারে। জীবনী- লেখক সাহিত্যিককে এই শ্রেণীর অ-মানুষদের (অর্থাৎ কিনা যারা নিজেকে মানুষ বলে পরিচয় না দিয়ে অন্য কিছু বলে পরিচয় দেয়) প্রভাব থেকে সযত্নে নিজের লেখনীকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। আজকের পৃথিবীতে কোন কোন দেশ বিশেষ সাম্প্রদায়িক অথবা বিশেষ অর্থনৈতিক মতবাদ প্রচার করে যে অসহিষ্ণুতামূলক ভাবধারাকে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে, তা' কু-সাহিত্যের (?) মাধ্যমে শিশুমনেও সংক্রমিত হচ্ছে। এই সব শিশুরা পরবর্তীকালে সম্প্রদায়বিশেষ বা মতবাদ আশ্রয়ী দলবিশেষের

কাছে হয়তো সম্পদে পরিণত হবে, কিন্তু মানুষের পরিচিতি সে কতটুকু বহন করতে সক্ষম হবে!

বেতারের মাধ্যমেও গুছিয়ে শিক্ষামূলক গল্প বলবার বেশ একটা বড় রকমের সুযোগ রয়েছে। বেতার কর্তৃপক্ষ শিশু মনস্তত্ত্ববিদ সাহিত্যিকগণকে দিয়ে চিত্তাকর্ষী অথচ শিক্ষাপ্রদ গল্প লিখিয়ে তা' খুব সহজেই শিশুদের কাণে ও মনে পৌঁছিয়ে দিতে পারে। সকল শিশুর অভিভাবক বাড়ীতে যদি বেতারযন্ত্র রাখতে সক্ষম না হন, বিদ্যালয়ে কোন নির্দিষ্ট সময়ে অথবা পার্কে বা খেলার মাঠেও বেতার যন্ত্রের সাহায্যে এই জাতীয় শিক্ষামূলক প্রচারের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। তবে এখানের পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদে যে সমস্যার কথা বলা হয়েছে তা থেকে যেতে পারে অর্থাৎ কি না বেতার বিভাগ দল বিশেষের কুক্ষিগত হ'য়ে থাকলে তার মাধ্যমে মানুষ গড়বার প্রচেষ্টার চাইতে দলবিশেষের পতাকাবাহক তৈরী করার চেষ্টাই বেশী করে দেখা দেবে। অবশ্য এই জাতীয় সম্ভাবনা দূর করবার একটা উপায় রয়েছে আর সেটা হচ্ছে সংস্কৃতিসম্পন্ন অ-রাজনৈতিক শিক্ষাবিদের নিয়ে একটা বোর্ড গঠন করে বেতার-বিভাগের পরিচালনার ভার সেই বোর্ডের হাতে তুলে দেওয়া।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত পৃথিবীর অনেকগুলি দেশের শিক্ষিত-সম্প্রদায় অনুযোগ করতেন যে তাঁদের দেশে নেতৃস্থানীয় মানুষদের বা মহাপুরুষদের স্মৃতিপূজা যথাযথ ভাবে হয় না, অর্থাৎ কিনা তাঁদের দেশ ওই সকল স্মরণ্য বরেণ্য মনীষীগণকে ভুলে গিয়ে ক্রমশঃ আদর্শহীন হয়ে পড়ছে। তাঁদের এ কথাগুলো হয়তো খুব অসার নয়। তবে এই স্মৃতিপূজা বা জয়ন্তীগুলো যে ধাঁচে হয়ে থাকে তাতে সেগুলোর মূল্য এক কানাকড়িও থাকে বলে মনে করতে পারিনা। মোটা রকমের চাঁদাপ্রাপ্তির আশায় সভাগুলোতে পৌরোহিত্য করবার ভার সাধারণতঃ কোন আদর্শহীন চোট্টামল ডাকুরাম বাটপাড়িয়াকে দেওয়া হ'য়ে থাকে। বক্তারাও একের পর এক গালভরা কথা মার্জিত সাহিত্যিক ভাষায় বলে যান। আর বক্তৃতার শেষে প্রায় সকলেই বলে যান যে "অমুক আমাদের যা দিয়ে গেছেন তা' আজ নতুন করে ভেবে দেখবার দিন এসেছে। আমাদের কেবল বক্তৃতা দিয়ে গেলে বা শুণে গেলেই চলবে না, এ গুলোকে কার্যে রূপ দিতে হবে, তবেই অমুকের স্মৃতিপূজা সার্থক হবে।” তারপর বক্তৃতার শেষে এপাশে ওপাশে চাওয়া-চাওয়ি করে জিজ্ঞাসা করেন-কেমন বললুম হে?” অর্থাৎ তিনিও আদর্শকে রূপ দেবার উদ্দেশ্যে বলেন নি, বলেছেন তারিফ পাবার উদ্দেশ্যে। এই স্মৃতি পূজাগুলো একেবারেই যে অসার এমন কথা বলিনি, বলবও না, তবে কিনা সেই

গতায়ুঃ মনীষীর আদর্শকে যদি রূপ দেবার যথার্থই ইচ্ছা থাকে, তবে এই সব জয়ন্তী বা স্মৃতি-পূজার উদ্যোক্তাদের উচিত তার আদর্শকে বক্তাদের বচনের মধ্যে সীমিত না রেখে অনুষ্ঠানগুলোতেই সেগুলোকে ব্যাপকতর ভাবে ফুটিয়ে তুলে জনসাধারণের কাছে, বিশেষ করে শিশুদের কাছে উপস্থাপিত করা। এ কাজ ছবি ও নাটক এ দুয়ের মাধ্যমেই সব চাইতে ভালভাবে হ'তে পারে। রামায়ণ বইখানির চাইতে চিত্রে রামায়ণ বেশী চিত্তাকর্ষী, বেশী শিক্ষাপ্রদ, কারণ লেখার ভাষা যে বুঝতে শেখেনি-রেখার ভাষা সে-ও বুঝে।

ছবির পরেই বলতে হয় নাটকের কথা। সুলিখিত ও সু-অভিনীত নাটকের প্রতিটি চরিত্র জীবন্তভাবে দর্শকের কাছে ধরা দেয়। প্রিয় নেতা, প্রিয় মনীষী জনসাধারণের কাছে, বিশেষ করে শিশুদের কাছে প্রিয়তর রূপ নিয়ে এসে কথা কয়। মনের গোপন দ্বারের অর্গলগুলি খুলে দিয়ে ভাৰের অবাধ লেনদেন তারা তখন করতে থাকে। তাই বলছিলুম, প্রকৃত শিক্ষার বিস্তারে শিক্ষার্থী যে বয়সেরই হোক না কেন সুলিখিত ও সু-অভিনীত নাটক খুব বেশী পরিমাণ কাজ দিতে পারে। আজকের দিনে সবাক্ চলচ্চিত্রের উপরে অনুরাগ সব বয়সের মানুষের মধ্যে বেশ দেখা দিয়েছে ও এর ফলে সবাক্ চিত্রের বিজ্ঞান ক্রমশঃ উন্নত থেকে উন্নততর হতে

থাকবে। চলচ্চিত্রের এই জনসংযোগের সুবিধাটুকু শিক্ষাবিস্তারে খুব ভালভাবেই কাজে লাগানো যেতে পারে। মানুষের মনের কোণে যে পশু লুকিয়ে আছে তার প্ররোচনায় মানুষ হীনবৃত্তির দিকে বেশী ঝুঁকে পড়ে, কিন্তু উন্নততর শিক্ষা ও পরিবেশ এই পশুকেও কায়দায় আনতে সাহায্য করে, তাকে মানুষের আজ্ঞাবাহী ভৃত্যে পরিণত করে দিতে পারে। কিন্তু সে কাজটা করতে গেলে প্রথমটায় পশুবৃত্তির বিরুদ্ধে যে সংগ্রামে অবতীর্ণ হ'তে হয় সেটা আর যাই হোক খুব বেশী আরামদায়ক নয় আর এই মানুষকে বশে আনবার জন্যে বুদ্ধিমান –শোষক তার পশুভাবকে উৎসাহ দিয়ে থাকে। চলচ্চিত্র শিল্পটির ক্ষেত্রেও ঠিক এই ব্যাপার দাঁড়িয়েছে। শিল্পটি রয়েছে মুষ্টিমেয় পুঁজিবাদী ব্যবসায়ীর হাতে। যারা ছবি তোলে শুধু বাজার–চাহিদা বুঝে যে ভাব, ভাষা বা ছবিহীন পশুভাবকে ভালভাবে জাগিয়ে তুলৰে সাধারণ মানুষ স্বাভাবিক নিয়মে সেই দিকেই ছুটে যাবে। এই জাতীয় ভাব, ভাষা বা ছবির ভীড়ের মধ্য থেকে আদর্শবাদীর আদর্শ যে কোন সময়ে দুমড়ে বা মচকে যাবে। তাই নিছক ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে যারা ছবি তোলে তাদের পক্ষে মানুষের এই মানসিক দুর্বলতাটুকু কাজে লাগাবার চেষ্টা করা খুবই স্বাভাবিক। জিনিসটা হয়েছেও তাই। প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য নির্দিষ্ট ছবিতে অপ্রাপ্তবয়স্কদের ভীড়ই বেশী হ'তে দেখা যায়। অনেক সময় "কেবলমাত্র

প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য" কথাগুলি এমন চিত্তাকর্ষকভাবে লেখা হয় যাতে করে অপ্রাপ্তবয়স্করা তা' দেখতে যাওয়ার জন্যে বেশী করে প্রলুব্ধ হয়। সমাজ-শিক্ষার ব্যাপারে এ রকমধারা ব্যবস্থা বেশীদিন চলতে দেওয়া যেতে পারে না। চলচ্চিত্র জিনিসটাকে যদি কল্যাণকর রূপ দিতেই হয় তবে তা' বেসরকারী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের হাতেই ছেড়ে দিতে হবে। ব্যবসায়ীদের হাতে নয়, সরকারের হাতেও নয় কারণ যে সব দেশে প্রতিষ্ঠানটি সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে রয়েছে সে সব দেশে শিক্ষাপ্রচারের চাইতে দলীয় প্রচারের কার্যেই জিনিসটাকে বেশী করে ব্যবহার করার সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে। নিছক প্রচারের উদ্দেশ্যে চলচ্চিত্রকে ব্যবহার করার আর একটা মস্ত অসুবিধে এই যে প্রচারকে মুখ্য উদ্দেশ্য করে রাখলে, নাটকের বা সাহিত্যের কোন মাধুর্যই ফুটিয়ে তোলা যায় না। তা, স্রেফ চোঙ মুখে দিয়ে চেঁচিয়ে বলা দলীয়-প্রচার হ'য়ে দাঁড়ায়।

অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও বিদগ্ধ পরিচালককে স্বাধীনভাবে কল্যাণধর্মী ছবি তুলবার সুযোগ দিলে তার ফল যে খারাপ একাধারে শিক্ষা ও আনন্দ পরিবেশন করতে সমর্থ হয় তার প্রমাণ কিছুকাল পূর্বে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রযোজিত একটি ছবিতে খুব সুন্দরভাবে পাওয়া গেছে।

পরিচ্ছেদটির উপসংহারে এই কথা ৰলৰ যে শিশুমনে পূর্ণ-মানবত্বের বীজ ঠিকভাবে বপন করতে গেলে বা তাদের মনের ক্ষুদ্র-মানবতরুকে যথাযথভাবে পত্র-পুষ্প-ফলে বিকশিত করে তুলতে গেলে যাদের সাহায্যের একান্ত প্রয়োজন সেই শিক্ষক, নাট্যকার, অভিনেতা, গল্পলেখক বা বেতার- শিল্পী যাতে তাদের সকল শক্তি ও সকল সামর্থ্য ঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারে তার জন্যে তাদের মনকে সাংসারিক দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত রাখৰার জন্যে সমাজকে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতেই হবে। তাদের কাণে তাদের দায়িত্বের কথাই ৰাৰ্ৰার শুণিয়ে যাৰ অথচ তাদের সমস্যার পানে দৃত্পাত করৰ না এই ধরণের ভাব নিয়ে বসে থাকলে কোন কাজই হবে না।

সামাজিক সুবিচার

সমাজ গড়ৰার কাজে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষকে বিভিন্নভাবে আমরা পেয়ে থাকি। গোটা সামাজিক কাঠামোটার পানে চেয়ে দেখতে গেলে এদের ওই বিভিন্নতা একটা বিশেষ মূল্য বহন

সূচীপত্র

করে। এ বিভিন্নতা যদি না থাকত তাহলে মানুষ সমাজে বর্তমানের সভ্যতা তো দূরের কথা প্রস্তরের যুগও আসতে পারত না। তাই যে বিচিত্রতার স্পর্শে উন্মেষের সম্ভাবনা সার্থক হয়ে ওঠে তার প্রতিটি ভাব, প্রতিটি রূপ প্রতিটি রঙকে সমান দৃষ্টি নিয়ে দেখতে হবে–সমানভাবে স্বীকার করে নিতে হবে। যদি তা না করতে পারি তা হ'লে সমাজ–দেহের যে অঙ্গটা সেই ভাবে বা রঙে বা রূপে পুষ্ট তা' শুকিয়ে' মরবে। সমাজের কথা যাঁরা গভীরভাবে চিন্তা করেন আমি কেবল তাদের মুখ চেয়ে কথা বলছি না, সমাজের প্রতিটি মানুষের মুখ চেয়ে আমি বলব কেউ যেন তার কর্মে, ভাবনায় বা বাক্যে কখনও অবিচারকে প্রশ্রয় না দেয়। কোন বিশেষ কার্যে বা জীবনের কোন বিশেষ ক্ষেত্রে, কোন বিশেষ মানুষ বা শ্রেণীর মধ্যে যদি কোন শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, নৈতিক বা আধ্যাত্মিক দুর্বলতা দেখা দেয় তবে বাকীদের উচিত তাদের হৃদয় বৃত্তির সবটুকু মাধুর্য ঢেলে দিয়ে তাদের সেই দুর্বলতাটুকু দূর করে দেওয়া। প্রকৃত মানবিকতা বা প্রকৃত অধ্যাত্ম দৃষ্টির অভাবে মানুষ কিন্তু ঠিক তার উল্টোটাই করে থাকে। কারুর কোথাও কোন দুর্বলতা দেখতে পেলে সুবিধাবাদী মানুষ সেই ফাঁক দিয়ে শিং গলিয়ে তার প্রাণের ফসলটুকু খেয়ে ফেলতে চায়। দুর্বলের

ব্যথা বা মর্মবেদনার কথা ভেবে দেখাটাই নিজের দুর্বলতা বলে মনে করে।

অধিকাংশ জীবের মত মানুষের সমাজেও নারীরা শারীরিক বিচারে পুরুষের চাইতে দুর্বল। স্নায়ুর দুর্বলতার জন্যে মনও তাদের কিছুটা দুর্বল। কিন্তু তা' সত্ত্বেও সমাজের কাছে তাদের মূল্য পুরুষের চাইতে এক পাইও কম নয়। স্বার্থপর পুরুষ কিন্তু এই মূল্যবোধের অপেক্ষা না রেখে নারীর দুর্বলতার সুযোগটুকুই ষোল আনা নিয়েছে ও নিচ্ছে। মুখে মাতৃজাতি বলে ঘোষণা করলেও আসলে তাদের অবস্থাটা করে রেখেছে ঠিক গৃহপালিত গোরু-ভেড়ার মত। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাদের অধিকার হয় সঙ্কুচিত করে রেখেছে, অথবা অধিকার ভোগ সম্পূর্ণভাবেই পুরুষের খেয়াল-খুশীর উপর সঁপে দিয়েছে। সৃষ্টির প্রথম ঊষাকালে আদিম মানুষের মধ্যে ঠিক এমন ধারা মনোভাব ছিল না। সামাজিক শুচিতার ছদ্মবেশে নারীকে বন্দিনী করে রেখে পুরুষের একাধিপত্য বিস্তারের কূটনৈতিক প্রবৃত্তি সে সময়ের মানুষের মগজে গজায় নি। তাই আজও আমরা দেখি স্ত্রী-স্বাধীনতার ব্যাপারে আদিম জাতিগুলির মধ্যে উদারতার অভাব বড় একটা নেই। স্বভাবগতভাবে মানুষ দুরাচারী নয়, অধিকাংশ মানুষ

শান্তিপ্রিয়ও বটে। তাই ব্যষ্টিগত শুচিতার প্রতি একটা ঝোঁকও সবাইকারই আছে। আর ব্যষ্টিমনের এই ঝোঁকই সমষ্টিমনকে শুচি করে রাখে। এই জন্যই আমরা দেখতে পাই স্ত্রী–স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও তথাকথিত অনগ্রসর জাতিগুলির মধ্যে যে পরিমাণ সামাজিক শুচিতা আছে তথাকথিত উন্নত জাতিগুলির মধ্যে তার এক শতাংশও নেই। জোর করে স্বাধীনতা দমন করতে গেলে মানুষের মনে বিরুদ্ধধর্মী প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। তার ফলে শুচিতা জিনিসটা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ভেসে চলে যায়। তথাকথিত উন্নত সমাজগুলির মধ্যে আজ যে সামাজিক শুচিতার অভাব দেখা যায় তার অন্যতম কারণ হল এইটি। বড় বড় ভাষার আড়ালে বা লোক–দেখানো ধর্ম–কর্মের অন্তরালে এ অশুচিতাকে ঢেকে রাখৰার চেষ্টা করলে সমাজে সত্যিকারের কোন লাভ হবে না। মিথ্যা স্তোকবাক্য দিয়ে বা পরকালের স্বর্গসুখের প্রলোভন দেখিয়ে যারা ইহলোকে নারীকে পুরুষের দাসী করে রাখতে চায় তারা বুঝতে পারে না যে এই স্তোক–বাক্য বা স্বর্গের প্রলোভন নারীকে জড় করে রাখতে বা পুরুষের দাসী করে রাখতে হয়তো সাহায্য করে, কিন্তু এতে করে মানুষ সমাজে সত্যিকারের কোন লাভ হয় না, কারণ সমাজের শতকরা পঞ্চাশ জন লোক যদি কু–সংস্কারাচ্ছন্ন জড় হ'য়ে থাকে তাহলে সমাজের বাকী পঞ্চাশ জনকে এই জড়ের বোঝা বয়ে'

নিয়ে এগিয়ে চলতে রীতিমত বেগ পেতে হবে। ব্যষ্টিগত জীবনে শুচিতা নারী- পুরুষ দুয়েরই সমানভাবে প্রয়োজন আর সে প্রয়োজন সিদ্ধ করতে গেলে সত্যিকারের অধ্যাত্ম দৃষ্টি থাকা দরকার। নারী বা পুরুষ কারও প্রতি অবিচার করে এ প্রয়োজন সিদ্ধ হবার নয়।

মানুষ মাত্রেরই বোঝা দরকার যে কোন কিছুকে গড়ে তুলতে গেলে বা বাঁচিয়ে রাখতে গেলে তার প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে দরকার একটি নিবিড় সহযোগিতামূলক আচরণের। মানুষ জড় নয়, তাই তার প্রতিটি সামবায়িক সংঘটন টিকে থাকে শুধু যে সহযোগিতার ওপরে তা' নয়, এ সহযোগিতার মধ্যেও একটু বৈশিষ্ট্য আছে। আর সেটা হ'ল এই যে সহযোগিতাটা প্রভু- দাসের সম্পর্কে গড়ে না উঠে স্বাধীন মানুষের সহৃদয়তাপূর্ণ পরিবেশেই গড়ে ওঠা দরকার। That should be a coordinated cooperation and not a subordinated one. নারীর প্রতি এ যাবৎ কী রকমের আচরণ করে আসা হয়েছে? এ কথা খুবই সত্যি যে কতকগুলি বিশেষ ক্ষেত্রে যোগ্যতার অভাবের ফলেই নারীরা ধীরে ধীরে তার অধিকার বা স্বাধীনতা খুইয়ে বসেছে, আর এই জন্যেই যারা বিশেষ বিশেষ কতকগুলি যোগ্যতাকেই অধিকারপ্রাপ্তির একমাত্র মাপকাঠি হিসেবে দেখতে চান তাঁরা

নারীকে সর্বদাই বেশ একটা কড়া শাসনে নিজেদের বিনা পয়সায় পাওয়া ক্রীতদাসী হিসেবে- দেখতে চান। কিন্তু নারী যে এই অধিকার হারিয়ে বসেছে এটা কি সম্পূর্ণভাবে তার অযোগ্যতারই পরিণাম? উদ্বেল হৃদয়-বৃত্তি কি এতে কোন কাজই করেনি? প্রাণের আবেগেই কি সে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ উপেক্ষা করে ধীরে ধীরে সব কিছুই, এমন কি সামাজিক প্রতিষ্ঠার মোহও পতি-পুত্র-ভ্রাতার হাতে তুলে দেয় নি? যে সমাজ মানুষের-পশুর নয়, সে সমাজের কি উচিত নয় এই হৃদয়বৃত্তিকে যথোচিত মর্যাদা দেওয়া? ৰাড়ীতে হঠাৎ কোন অতিথি-অভ্যাগত এলে কার ভাগের ভাতটা অতিথিকে দেওয়া হয়? উত্তম ভোজ্যবস্তু প্রস্তুত করা হলে কে নিজেকে সব চাইতে আগে বঞ্চিত করে? কে নিজের পিত্রালয়ের সমস্ত পাওনা-গণ্ডার মোহ ছেড়ে দিয়ে (আইন যা' বলে বলুক না কেন) অপরের ঘর গোছাতে যায়? এই কথাগুলো পৃথিবীর অধিকাংশ মানবীর পক্ষেই প্রযোজ্য নয় কি? পুরুষ সাধারণ মানুষ আর নারীরা দেবী এমন কথা আমি বলছি না, নারীকে মানবী হিসেবে দেখেই তার হৃদয়-বৃত্তির বৈশিষ্ট্যগুলোর কথাই উল্লেখ করছি মাত্র। পতির পীড়ায় নারী তাকে যে ভাবে সেবা করে পত্নীর অসুস্থতায় পুরুষ কি তাকে ততখানি সেবা করে? অথচ নারীর সেই মমত্বপূর্ণ হৃদয়-বৃত্তির সুযোগ নিয়ে পুরুষ যদি অসহায়া বিধবার পুনর্বিবাহ

বন্ধ করে দিতে চায়, তাকে বোঝাতে চায় যে মরণের পরে তুমি সেই মৃতপতির কাছেই ফিরে যাবে, তোমার কি দ্বিতীয় বিবাহ হতে পারে! ছি-ছি-ছি! কথাগুলো হয়তো ভাবপ্রবণা নারীকে অধিকতর ভাবপ্রবণা করে তোলে; মৃত্যুর পর স্বামীর প্রেতাত্মার সঙ্গে পুনর্মিলিত হবার আশায় হয়তো সে আজীবন কৃচ্ছ সাধন, একাদশীর উপবাস চালিয়ে যায়, কিন্তু যারা তাদের এই বিবাদ দিয়ে জোর করে একটা কল্পিত ভাবের অধীন করে রাখতে চায় তারা কি বিবেকবিরোধী কাজ করে না? প্রথমতঃ স্বর্গ নরকের কথাই সম্পূর্ণ আজগুৰী। পুরাণকারের মগজেই সেগুলো গজ গজ্ করে, যুক্তির দৃঢ়ভূমিতে তারা খুঁটি পোঁতৰার অধিকার পায় না। তবু মূর্খকে খুশি করবার জন্যে যদি মেনেই নি যে স্বর্গ-নরক বলে কোন জিনিস আছে তাহলেও প্রশ্ন করৰ যে দুরাচারী-স্বামীর প্রেতাত্মা যদি নরকে গিয়ে ষাঁড় হয়ে মাঠে চরতে থাকে, ধার্মিকা পত্নীও কি দেহান্তে নরকে গিয়ে গাই-গোরু হয়ে তার পাশে পাশে ঘাস খেয়ে বেড়াৰে?

যাক এসব অবান্তর কথা না বাড়ানই ভাল। আমার বক্তব্যের মোদ্দা কথা এই যে সরলতার বা নির্বুদ্ধিতার সুযোগ যারা নেয় তারা মনুষ্যদেহধারী পিশাচ; আর কারুর ত্যাগের

আদর্শে অনুপ্রাণিত হৃদয় বৃত্তির সুযোগ নিয়ে কেউ যদি তাকে ঠকায় তবে তাকে বলব পিশাচাধম।

স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয় সংগ্রামের দ্বারা, স্বাধীনতা কেউ কারও হাতে সঁপে দেয় না কারণ স্বাধীনতা দান নয়, জন্মসিদ্ধ অধিকার। নারীরা কিন্তু আজ যে অধিকার হারিয়েছে–অন্ততঃ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে হারিয়েছে বলে মনে হচ্ছে–সে জিনিসটাও যথাযথ সমাজাশ্রয়ী–মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ (socio–psycho–analysis) করলে বলতে হয় যে নারীরা তাদের স্বাধীনতা হারায়নি, তারা পুরুষকে বিশ্বাস করে তাদের হাতে নিজেদের ভাগ্য ছেড়ে দিয়েছে–ব্যাপারটা ঠিক এইরকম। তাই একশ্রেণীর তথাকথিত উন্নাসিকা পণ্ডিতন্মন্যা নারী যখন ঝি বা আয়ার হাতে সন্তানের ভার ছেড়ে দিয়ে স্বামীর উপার্জিত অর্থে কেনা মোটরে চড়ে সভা–সমিতিতে, স্ত্রী–স্বাধীনতার জন্যে বড় বড় বক্তৃতা দেন তখন তা দেখে হাসি পায়। সত্যি কথা বলতে কি এটা যখন অধিকার কেড়ে নেবার কোন ঘটনাই নয় তখন এ নিয়ে কোন ট্রেড–ইউনিয়ন ভিত্তিতে আন্দোলন চালাৰার অবকাশ থাকতেই পারে না। এ ব্যাপারে যেটুকু দায়িত্ব তার ষোল আনাই পুরুষদের। এ নিয়ে যদি কোন আন্দোলন চালাতেই হয় তবে তা পুরুষগণকেই চালাতে হবে। নিজেকে অসহায়

ভেবে বা হৃদয়বৃত্তির আহ্বানে নারী একদিন যে অধিকার তার হাতে তুলে দিয়েছিল আজ নারীরই প্রয়োজন বুঝে পুরুষের উচিত ধীরে ধীরে তা নারীর হাতে ফিরিয়ে দেওয়া।

সব সময়েই মনে রাখতে হবে স্বাধীনতা আর স্বেচ্ছাচারিতা এক জিনিস নয়। স্ত্রী-স্বাধীনতা ভাল-তা বলে স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতাকেও প্রশ্রয়. দেওয়া চলে না। স্বেচ্ছাচারিতা-তা সে পুরুষেরই হোক বা নারীরই হোক, সামাজিক কাঠামোকে অল্পদিনের মধ্যে ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে পারে। তাই স্ত্রী-স্বাধীনতার কথা যাঁরা একটু বেশী করে বলেন তাঁদের উচিত এই সম্ভাব্য স্বাধীনতার রূপটুকুকেও আগে থাকতে একটু ভাল করে তলিয়ে দেখে নেওয়া।

কোন সহজ সত্যকে স্বীকৃতি দেওয়ার সময়ে ভাবালুতাকে একটুও প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। মানবতা-কেন্দ্রিক যৌক্তিকতা ছাড়া আর কোন কিছুই সেখানে গ্রহণযোগ্য নয়। প্রকৃতির সন্তান হিসেবে যে আলো-হাওয়া-মাটি-জল পুরুষ তার ভোগ্য হিসেবে পেয়ে থাকে তার অধিকার অবাধ ভাবে নারীকে দিতে হবে। বস্তুতঃ এটাকে অধিকার দেওয়া না বলে বলব অধিকার স্বীকার করে নেওয়া। কিন্তু এই অধিকার স্বীকার করে নিতে গিয়ে যদি ভাবালুতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় তাতে

সমাজের সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা। ধরা যাক দায়াধিকারের কথা। এ ব্যাপারে পৃথিবীর বিভিন্ন মানব-গোষ্ঠী বিভিন্ন মত পোষণ করেন। কেউ পুরুষকে বঞ্চিত করে সম্পত্তির সমস্ত অধিকার নারীকে দেন, কেউ নারী-পুরুষকে সমানভাবে সম্পত্তির মালিকানা দিয়ে থাকেন, কেউ বা নারীকে ছিটে-ফোঁটা পুরুষের প্রসাদ দিয়ে আসলে সবটাই পুরুষের হাতে রেখে দেন। এদের এই ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে যৌক্তিকতা বা মানবিকতার চাইতে প্রভাবসংরক্ষণের বা প্রাধান্য বজায় রাখবার অপচেষ্টাটাই প্রকটভাবে ফুটে ওঠে। বস্তুতঃ এ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে গেলে যে মূলনীতিটা থাকা দরকার সেটা হচ্ছে কাউকে বঞ্চিত করৰ না, নারী-পুরুষকে য়াধিকারে সমান সুযোগ দোৰ অথচ আইন তৈরী এমনভাবে করৰ যাতে করে সম্পত্তির পরিচালনা বা রক্ষণাবেক্ষণ সুষ্ঠুভাবে হ'তে পারে ও পারিবারিক অশান্তির সম্ভাবনাও কম দেখা দেয়। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই মানবগোষ্ঠী-পিতৃগতকুল। এই পিতৃগত কুলব্যবস্থা মাতৃগত কুলব্যবস্থার চাইতে কিছুটা সুবিধাজনক। এর প্রধান দুটি সুবিধা হচ্ছে এই যে, যে কোন সন্তানের পক্ষে তার মাতৃ-নির্ধারণ যতটা সহজ, পিতৃ-নির্ধারণ ততটা সহজ নয়, ও রক্তগত প্রত্যক্ষ সম্পর্ক না থাকায় সাধারণতঃ পিতা অপেক্ষা মাতার মমতাই অধিক হ'য়ে থাকে। এ অবস্থায় সন্তানের প্রতি পিতার যথাযথ

দায়িত্ব–বোধ জাগাৰার পক্ষে পিতৃগত কুলব্যবস্থাই বেশী ভাল। কারণ সন্তানের জন্ম–পরিচিতি তাতে অজ্ঞাত থাকৰার কোন সম্ভাবনা থাকে না। আর অবস্থার চাপে (মনুষ্যেতর প্রাণীর মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই এই জাতীয় চাপ না থাকায় পিতারা সন্তান সম্বন্ধে কোন দায়িত্বই নেয় না) সন্তান–প্রতিপালনের দায়িত্ব নিতে বাধ্য হওয়ায় তারা পারিবারিক কাঠামোটাও যথাযথভাবে বাঁচিয়ে রাখতে সচেষ্ট হয়। পিতৃগত কুলের দ্বিতীয় সুবিধাটা প্রথমটিরই পরিপূরক। সেটা হচ্ছে এই যে এতে সন্তানের সঙ্গে পিতার সম্পর্ক অজ্ঞাত না থাকায় স্বাভাবিক নিয়মে তার প্রতিপালনের ব্যাপারে মাতাকে খুব বেশী অসহায় ৰোধ করতে হয় না। নারীর শারীরিক ও মানসিক রচনা যে রকমের তাতে করে তাদের পক্ষে শিশুসন্তান পালনে যতটা যোগ্যতার প্রয়োজন তার সবটুকু থাকলেও তাদের সৰরকম ভাবে গড়ে বড় করে তোলা–অন্ন–বস্ত্র–শিক্ষা–চিকিৎসার যথাযথ ব্যবস্থা করে দেওয়া রীতিমত অসুবিধাজনক; অথচ সন্তানকে তার কাছে রাখতেই হবে। নইলে সন্তানের পক্ষে বাঁচা মুস্কিল হয়ে দাঁড়ায়। তাই এ ব্যাপারে অর্থাৎ অন্ন–বস্ত্রের সংস্থানের পক্ষে মুখ্য দায়িত্ব যদি নারীর বদলে পুরুষ নেয় আর নারী তার সন্তান প্রতিপালন করে সম্ভব ক্ষেত্রে ও প্রয়োজন বোধে ঘরে থেকে বা ঘরের

বাইরে গিয়ে মেহনত করে অর্থোপার্জন করে তাতে সন্তানের বা সমাজের বিশেষ কোন অসুবিধা হয় না। যাঁরা নারীকে হাতা-বেড়ি-খুন্তি নিয়েই জীবন কাটিয়ে দেবার পরামর্শ দেন তাঁদের এই সুবিবেচনাকে (?) সমর্থন করতে পারি না কারণ তা' বাস্তব-ধর্মবিরোধী। প্রয়োজনের তাগিদ অনেক সময়েই তাদের এই নীতি (?) থেকে বিচ্যুত হতে বাধ্য করে। মুষ্টিমেয় ধনী বা উষ্চ-মধ্যবিত্তের পক্ষে এটা মেনে চলা সম্ভব হলেও দরিদ্র বা মুটে-মজুরের জীবনে এ জাতীয় ব্যবস্থার মূল্য এক কাণাকড়িও নেই। যে সমস্ত মানবগোষ্ঠী মুখে সমানাধিকারের বা স্ত্রী-স্বাধীনতার বড় বড় বুলি আউড়ে আসলে নারীকে পর্দার আড়ালে বা বোর্খায় ঢেকে রেখে থাকে সেখানেও তাই দেখতে পাই দরিদ্রের ঘরণী স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে হাটে-বাজারে কেনা-বেচা করছে অথবা ক্ষেতে খামারে বা কয়লা-খাদে হাল্কা কাজগুলো হাত বাড়িয়ে' নিজেদের জন্যে টেনে নিচ্ছে, চিকের আড়ালে পটের ৰিৰি সেজে বসে থাকলে তাদের চলছে না। কিন্তু জীবনের সর্বক্ষেত্রে সমান অধিকার দিতে গিয়ে অনেকে জোর করে নারীকে নারীধর্ম-বিরোধী গুরুতর শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম-সাপেক্ষ কার্যে নিয়োগ করতে চায়। এ জাতীয় মনোভাব অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে শারীরিক ও স্নায়ুগত শক্তি পুরুষের চাইতে নারীর কম।

তাই কর্মভূমি এতদুভয়ের হুবহু এক হতে পারে না। তাছাড়া শারীরিক কারণে মাসে প্রতিটি দিন নারী সমানভাবে খাটতে পারে না। গর্ভাবস্থাতে ও প্রসবের পরে তাদের খাটবার সামর্থ্য সীমিত হ'য়ে পড়ে–এ কথাগুলো ভুলে থাকলে চলবে কেন! ভাবালুতার ফলে অনেকে ভাবেন কিছু সংখ্যক নারীকে পার্লামেন্টের সদস্যা বা মন্ত্রী করে দিলেই বুঝি তা' সমানাধিকারের বা নারী–প্রগতির জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। কিন্তু এ মনোভাবটা কি ঠিক। অধিকার স্বীকার করে নেওয়া বা প্রগতিকে ত্বরান্বিত করা নীতি হিসেবে এই রকমের ভাব গ্রহণ করতে গিয়ে যদি যোগ্যকে উপেক্ষা করা হয় তার ফলে কি সমগ্র গোষ্ঠী বা সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হবে না? অধিকার স্বীকার করা একটা আইনগত তথা সামগ্রিক মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার, আর প্রগতিকে ত্বরান্বিত করার পক্ষে দ্রুত শিক্ষাব্যবস্থাই একমাত্র পথ। তাই কোন দেশের নারী মন্ত্রী হয়েছেন বা রাষ্ট্রদূত হয়েছেন সে দেখে সে দেশের নারীর সত্যকার মান নির্ধারিত হয় না। সমাজে নারীর মান উন্নত করতে গেলে অত সহজে বা অত সস্তায় সে কাজ হবার নয়।

যুক্তিতে যখন বুঝছি পিতৃগত কুলব্যবস্থা মাতৃগত কুলব্যবস্থার চাইতে ভাল তখন সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্ব সেই

ধারাপ্রৰাহে ৰাহিত হওয়া উচিত। অবশ্য দায়াধিকার বিধান রচনার সময়ে বিশেষ সতর্ক ভাবে দৃষ্টি রাখতে হবে যে পিতৃগত কুলব্যবস্থার খাতিরে এমন কোন কিছু যেন করে বসা না হয় যার ফলে নারীকে তার অস্তিত্বরক্ষার জন্যে ভ্রাতা বা দেবর–ভাশুরের গৃহে দাসীবৃত্তি করতে বাধ্য হতে হয় অর্থাৎ কি না সমানাধিকারের ভিত্তিতে নারীর ভোগ দখলের দাবী স্বীকার করে নিয়ে উত্তরাধিকারের বিধি পিতৃগত কুলব্যবস্থায় চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

বর্তমান পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশে প্রচলিত পণপ্রথাকে অনেকে নারী– সমাজের প্রতি অনুদার বা অবিবেচনাপ্রসূত ব্যবহার বলে মনে করে। কিন্তু ব্যাপারটা তা' নয়। পণপ্রথার সঙ্গে নারীর প্রতি সুবিচার বা অবিচারের কোন প্রশ্ন ওঠে না। সমস্যাটা মুখ্যতঃ অর্থনৈতিক। গৌণ কারণ আরও দু' একটা আছে। নারী যেখানে অর্থোপার্জন করে না বিবাহের পরে সে স্বামীগৃহে ৰোঝা হিসেবেই যায় ও সেই জন্যেই বিবাহকালে পাত্রপক্ষ পাত্রীপক্ষের কাছ থেকে বাকী জীবনের গ্রাসাচ্ছাদন বাবদ মোটা রকমের টাকা আদায় করে নেয়। পণপ্রথার স্বরূপটা ঠিক এই। ঠিক তেমনি যে সমাজে পুরুষ অর্থোপার্জন করে না সে সমাজে বিবাহকালে কন্যাপক্ষ মোটা–রকমের পণ আদায় করে নেয়। অবশ্য পণপ্রথার আরও একটা গৌণ

কারণ আছে; আর সেটা হচ্ছে কোন দেশবিশেষে বা গোষ্ঠীবিশেষে নারী–পুরুষের সংখ্যার ন্যূনাধিক্য। তা' হলে জিনিসটা মোটামুটি দাঁড়াচ্ছে এই যে কন্যাপক্ষ পাত্রপক্ষকে তখনই পণ দেয় যখন দেখা যায় যে সে মানবগোষ্ঠীতে পুরুষের আয়ে নারীর ভরণপোষণ নির্বাহ হচ্ছে অথবা নারীর তুলনায় পুরুষের সংখ্যা কম। আর অর্থোপার্জন মূলতঃ নারীর হাতে থাকলে বা পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা কম হ'লে ঠিক উল্টো জিনিসটা হ'য়ে থাকে। যাঁরা মনে করেন পৈতৃক সম্পত্তিতে কন্যার সমানাধিকার স্বীকার করে নিলে পণপ্রথা অতীতের জিনিস হয়ে দাঁড়াবে তাঁরা ভুল করেন। কারণ দেখা গেছে যে, যে সব সমাজে কন্যা পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী সেগুলোতেও ধীরে ধীরে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য কারণে পণপ্রথার উদ্ভব হয়েছে। সাধারণতঃ আজকের দিনে খুব কম কন্যাই পিতৃকূল থেকে লোভনীয় সম্পত্তি পেয়ে থাকেন। সুতরাং সেই সম্পত্তির লোভে পাত্রপক্ষ পণের দাবী ছেড়ে দেবে এমন আশা দুরাশা মাত্র। যে দু'চারটে ধনী বা উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের কন্যা সত্যসত্যই লোভনীয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হয় পণপ্রথা থাকুক বা না থাকুক তাদের কিছুই যায় আসে না। টাকার জোরে ধনীর কুরূপা কন্যাও অতি সহজেই পাত্রস্থা হ'য়ে যায়।

সূচীপত্র

স্ত্রী–পুরুষের অবাধ মেলামেশা সম্বন্ধেও স্মার্তদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। সংযমবিহীন সমাজে এই অৰাধ মেলামেশার ফল যে ভাল হয় না একথা বোঝাৰার জন্যে বিশেষ যুক্তিতর্কের অবতারণার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ কথাও ঠিক যে মেলামেশা না থাকার ফলে অন্যান্য আর পাঁচটা জিনিসের মত এ ব্যাপারেও একটা চাপা ক্ষুধা বা বিশেষ আগ্রহ অথবা কৌতূহল সৃষ্ট হ'য়ে থাকে; অর্থাৎ কিনা অবৈধভাবে মেলামেশার পথ খোঁজৰার চেষ্টা হয়। এর ফল শেষ পর্যন্ত মেলামেশাকে পবিত্রতার স্তরে থাকতে দেয় না। এই রকম ধারা ব্যবস্থা মানসিক অবদমনেরই প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। এ অবস্থায় পুরুষের কেবল নৈতিক দিক দিয়েই ক্ষতি হয়, কিন্তু নারীর ক্ষতি হয় অনেক বেশী। হয়তো বা তার ফলে সে সমাজবহির্ভূত ঘৃণিত জীবন যাপন করতেও বাধ্য হয়। তাই বলি, স্ত্রী–পুরুষের স্বাধীনতা যেমনই স্বীকার করতে হবে, ঠিক তেমনই তাদের মেলামেশায় একটা সংযমসম্মত সুসম্বন্ধ–বিধিও রেখে দিতে হবে। যাঁরা আধুনিকতার ছোঁয়াচ থেকে কন্যাকে দূরে রাখতে চান, চান বলে তাদের স্কুল–কলেজে পাঠাতে নারাজ, তাঁরা হয়তো জানেন না যে আধুনিকতার ঢেউ তাঁদের অজ্ঞাতসারেই তাঁদের অন্তঃপুরে হাঁড়ি–হেঁসেলে বহু পূর্বেই ঢুকে গেছে। তাই পর্দা টাঙিয়ে বা বোর্খা ঢেকে তাঁরা তার হাত থেকে বাঁচবার বা বাঁচাবার যে

চেষ্টা করে থাকেন তা' একটা প্রহসন মাত্র। যুগের হাওয়াকে জোর করে আটকে রাখা যায় না। তার মধ্যেও যে একটা গতিশীলতা রয়েছে! বুদ্ধিমানের কাজ এই যুগপ্রবাহকে নিজের মনীষার সাহায্যে কল্যাণের পথে নিয়ন্ত্রণ করা। যুগশক্তিকে প্রতিরোধ করার সামর্থ্য ব্যষ্টি বা সমষ্টি কারোরই নেই। যে বা যারা সে চেষ্টা করে যুগশক্তি তাকে বা তাদের ধাক্কা দিয়ে ছিটকে ফেলে দিয়ে নিজের উদ্দামবেগে এগিয়ে যায়। আর সেই ছিটকে পড়া জীব নিজের দুর্বল মন আর নিষ্প্রভ চক্ষু দিয়ে তার প্রগতি ফ্যালফেলিয়ে চেয়ে দেখতে থাকে।

কাগজে–কলমে না হোক ব্যবহারের দিক দিয়ে আর একটা মস্ত বড় রকমের অবিচার করা হ'য়ে থাকে তথাকথিত অশিক্ষিতদের উপর। বস্তুতঃ একশ্রেণীর পণ্ডিতন্মন্য যাঁরা অন্যকে অবজ্ঞাভরে মূর্খ বলে দূরে সরিয়ে রাখতে চান তাঁরা পণ্ডিত বলতে কী বোঝেন তা' ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। শিক্ষা বলতে যদি অজস্র বই পড়াকে বোঝায় তাহলে বলি অনেকক্ষেত্রে অনেক ডিগ্রীধারীর চাইতেও পাঠশালা–পড়া বিদ্যা নিয়ে অনেক বেশী বই পড়েছে এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। এ ক্ষেত্রে শিক্ষিত কাকে ৰলৰ? ডিগ্রীকে শিক্ষার মাপকাঠি হিসাবে ধরে, কে কতখানি জ্ঞানার্জন করেছে তাই যদি বুঝতে হয় তা'হলেও প্রশ্ন থেকে যায় পরীক্ষার পাশ করার তাগিদে যারা

তাড়াহুড়ো করে কিছুসংখ্যক বিষয় গলাধঃকরণ করে আর পরীক্ষার দু'চার মাস বা বড়জোর দু'চার বছর পরে সব গুলে' খেয়ে দেয়, তারা বেশী জেনেছে বা বেশী শিখেছে বলি কি করে? শিক্ষার অর্থ যদি রুচির মার্জিত ভাবকে বা বৈবহারিক সংযমকে বোঝায় তবে সে জিনিসটাতো নিরক্ষরেরও থাকতে পারে। শিক্ষিত বলতে যদি বুঝি বেশী জেনেছে, মনে রেখেছে ও জীবনে তা' প্রতিফলিত করেছে তা' হলেও তো বলতে হয় এ জিনিসগুলো শেখবার জন্যে বিদ্যালয়ে যাবার প্রয়োজন নাও হ'তে পারে। তাই বলি পণ্ডিতমন্যের শিক্ষার অহংকার একেবারেই অর্থহীন। পৃথিবীর কোন জিনিস নিয়েই মানুষের গর্ব চলে না। একথা অন্যান্য ক্ষেত্রে যতখানি সত্যি বিদ্যা বা শিক্ষার ক্ষেত্রে আরও কঠোরভাবে সত্যি। "কার সঙ্গে মিশবো–এখানে সব মুখ্যুর দল", "মশায়! এখানে মিশবার মত একটাও ভদ্রলোক নেই", "গাঁয়ে যাইনা কথা বলবার মতো – মানুষ তো নেই"– এ উক্তিগুলোর মধ্যে যথার্থতা এক কানাকড়িও নেই– আছে ষোল আনা আত্মম্ভরিতা।

বই পড়ে বা শুণে যে অনেক কিছু জেনেছে মানুষের সঙ্গে মেশবার সময় তার সবচেয়ে বেশী মনে রাখা দরকার যে সে যার সঙ্গে কথাবার্তা বলছে সেও কিছু কিছু জিনিস তার

চাইতে অনেক বেশী জানে। চাষা বলে যাকে অবজ্ঞা করা হয় ধানচাষের খুঁটিনাটি ব্যাপার তার নখদর্পণে অথচ ধান্যোৎপাদনের পরিসংখ্যানের চরম হিসাবটুকু যাঁর সই দিয়ে বেরুচ্ছে তাঁকে হয়তো ধানকাঠের চেয়ার দেখালেও তিনি তা' সহজভাবে স্বীকার করে নেৰেন। তাই বলি, কোন জিনিসটা কে কতখানি জানেন তা' নিয়ে গর্ব করা একেবারেই মূর্খতা; বরং এই গর্বই শিক্ষাহীনতার মূর্ত প্রতীক। চতুষ্পাঠীর পণ্ডিত নৌকার নাবিককে বলেছিল, "তুই আমার কোনো দার্শনিক প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারিস নি, তোর অর্ধেক জীবনটাই বৃথা।" আর মাঝনদীতে যখন নৌকা ডুৰুডুৰু হয়েছিল তখন নাবিক বলেছিল, "ঠাকুর একটু সামাল দাও।” পণ্ডিত ৰলেছিল– "নৌকা বাইতে তো আমি জানি না।” তার জবাবে নাবিক বলেছিল– "ঠাকুর! এখন তো তোমার গোটা জীবনটাই বৃথা হয়ে যাচ্ছে।” কোন জমি কেমন মাটিতে তৈরী তা' নিয়ে একজন তথাকথিত পণ্ডিত রীতিমত বিচার–বিশ্লেষণ না করে সাধারণতঃ কোন মন্তব্য করতে পারেন না, কিন্তু আমি দেখেছি ক্ষেত্রনাথ পাল বলে' একজন কর্ষক (অতি বার্ধক্যের দরুণ তখন সে চোখে ভাল দেখতেও পেত না) হাতে করে এক মুঠো মাটি নিয়ে মাটির দোষ–গুণ, তাতে কোন্ ফসল ভাল হবে, কোন্টা ঠিক হবে না–গড়গড়িয়ে ঠিক বলে দিত। এই তথাকথিত অশিক্ষিত ক্ষেতু পালকে পণ্ডিত

বলৱ না মূর্খ বলব? তার দীর্ঘকালের অর্জিত অভিজ্ঞতার বৈবহারিক প্রয়োগ কি একেবারেই মূল্যহীন? সেটা কি শিক্ষার পর্যায়ে পড়ে না? পুঁথিগত বিদ্যা বা যান্ত্রিক বিদ্যার কাছে সংস্কারজ বোধি অবহেলিত হোক-এটা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়।

যে বেশী শিখেছে, বেশী মনে রেখেছে ও সেগুলি বৈবহারিক জীবনে প্রয়োগ করেছে তাকেই বলব শিক্ষিত আর তার গুণগুলোর নাম দেব শিক্ষা। এই শিক্ষাগ্রহণের জন্যে "অ-আ-ক-খ” অক্ষরগুলোকে চেনা অত্যাবশ্যক নয়। তবে হ্যাঁ অ-আ-ক-খ'র জ্ঞান অনুভূত বিষয়ের অসম্প্রমোষে যথেষ্ট সাহায্য করে থাকে একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে।

কেবল মার্জিত ব্যবহারটুকুকে যারা শিক্ষার পরিচায়ক বলে মনে করে থাকে, আমার মতে তারা মহা ভুল করে। কারণ মানুষের সত্যিকারের পরিচয় তার ব্যবহারটুকুতেই সীমিত নয়, তার পরিচয় তার ব্যাপক হৃদয়বত্তায়। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কাউকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবার পর তার কতখানি লাগল সে খোঁজ না নিয়ে শুধু "ওঃ দুঃখিত!- "sorry!" বললেই যথেষ্ট মার্জিত রুচির পরিচয় দেওয়া হয় আর এইটাই তথাকথিত ভদ্রতার বিধান, কিন্তু এতে প্রকৃত

হৃদয়বত্তার পরিচয় মেলে না। এক্ষেত্রে শিক্ষার পরিচয় পাওয়া যায় যদি আহত ব্যষ্টির ক্ষতে সত্যি করে প্রলেপ দেওয়া হয়, যদি নিজের শত ক্ষতি স্বীকার করে, তার ক্লেশ লাঘবের জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করা হয়। সে অবস্থায় মুখে sorry না বললেও কোন ক্ষতি হয় না। শিক্ষা বা মার্জিত রুচির নামে যে জিনিসগুলো চলে থাকে সেগুলো – হিপোক্রিসী (কপটাচরণ) ছাড়া আর কিছুই নয়। দুঃস্থ প্রতিবেশীর অভাব দূর করৰার কোন চেষ্টা না করে তাদের বাড়ীর ছোট ছেলেদের ডেকে জিজ্ঞাসা করা, "কী রে! আজ কী দিয়ে ভাত খেলি?” সে যদি বলে "আজকে মা কেবল কলমী শাক রেঁধেছিল" তা শুণে বলা "আহা! তোদের বড় কষ্ট।"– এই "বড় কষ্ট” কথাটি ৰলৰার সময় বেশ একটা ভালরকম অভিনয় করতে হয় বটে, কিন্তু তাতে সমাজচেতনা বা হৃদয়বত্তার কোন পরিচয়ই থাকে না। এই তথাকথিত শিক্ষা বা ভদ্রতার প্রধান লক্ষণ হচ্ছে এই যে এতে নিজেকে কোন ক্লেশের বোঝা নিতে হয় না, কেবল বচনবিন্যাসেই কর্তব্য সমাধা হয়। কারও ক্লেশ দূর করৰার জন্যে কোন রচনাত্মক কার্যে হাত দিতে গেলে নিজের ব্যষ্টিগত স্বার্থে কিছু কিছু অসুবিধা সৃষ্টি হ'তে পারে, কিন্তু বিধান সভায় তা' নিয়ে চিৎকার করলে এক ঢিলে দু'পাখী মারা যায়। প্রথমতঃ নিজেকে কোন অসুবিধা পোহাতে হয় না; দ্বিতীয়তঃ সস্তায়

বাহাদুরি কেনা যায়। যারা এ জাতীয় 'হিপোক্রিসীতে' অভ্যস্ত নয় তাদের অযোগ্য বা কায়েমী স্বার্থের বাহক বলে গালিও খুব সহজেই দেওয়া যায়। এই শ্রেণীর -- 'হিপোক্রাইট' ভদ্রলোকেরা বাকী লোকেদের যদি মূর্খ বলে ঘোষণা করেন- তাঁদের এ মন্তব্য কি মাথা পেতে মেনে নিতে হবে? প্রত্যেক জিনিসেরই একটা মার্জিত রূপ দেওয়ার নামই 'সভ্যতা' আর এই সভ্যতা শিক্ষার সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু কোন প্রয়োজনীয় জিনিসকে মার্জিত রূপ দিতে গিয়ে যেখানে অভিনয়টাই প্রধান হয়ে দাঁড়ায় সেটাকে নিশ্চয়ই সভ্যতা বা শিক্ষা বলৰ না। নিমন্ত্রণ বাড়ীতে গিয়ে আড়াইখানা নুচির ফুল্কো আঙ্গুলের ডগা থেকে ঠোঁটের ডগায় ছুঁইয়ে "আর খেতে পারছিনা" বলে বাড়ীতে এসে পেট ভরে ঝোল-ভাত খেলে হয়তো নিজের অল্প ভোজনের কথা পাঁচজনকে ভালভাবে বোঝানো সম্ভব হ'য়ে থাকে কিন্তু তাতে সরলতার লেশমাত্র থাকে না। বর্তমান সমাজে অনেকগুলি সভ্যতার অঙ্গ বা শিক্ষার অঙ্গ ঠিক এমনি ধারা।

খানিক আগে বলছিলুম কে শিক্ষিত আর কে মূর্খ বোঝা বড় মুস্কিল। সাধারণ মানুষ তাঁকে বা তাঁদেরই শিক্ষিত বলে মনে করেন যাঁদের শিক্ষিতন্মন্যতায় তাদের তাক লেগে যায়। এই শ্রেণীর শিক্ষিতন্মন্য লোকেরা সব সময়েই যে উচ্চ-

উপাধিধারী তা' নয়, বিত্তের জোরে বা পদমর্যাদার জোরেও এরা অনেকে নিজেদের শিক্ষিতের খোপরে বসাতে চান। নিজেদের জন্য পৃথক 'ক্লাব', পৃথক 'লাইব্রেরী' ইত্যাদি খুলে এরা জানাতে চায় যে ঠিক জনসাধারণ বলতে যা' বোঝায় এরা তা' নয়। এরা অনেক কিছু বোঝে, এরা অনেক কিছু জানে, বিজ্ঞের মত চোখ বুজে হাসে আর কম কথা বলে গাম্ভীর্য বজায় রাখতে চায়, কারণ বেশী কথা বললে হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে যাবে। হ্যাঁ, 'ক্লাৰ' সম্বন্ধে বলতে গিয়ে একটা কথা অবশ্যই ৰলৰ যে গোষ্ঠীবিশেষের জন্যে স্বতন্ত্র 'ক্লাব' স্থাপনের যৌক্তিকতা একটা দুটো ক্ষেত্রে মানলেও মানা যেতে পারে, যেমন ধরুন–সমভাষিতার ভিত্তিতে যাঁরা 'ক্লাব' খুলতে চান তাঁদের নীতিগত ভাবে পুরোপুরি সমর্থন করতে না পারলেও একটা কথা সত্য যে 'ক্লাবে' মানুষ কোন রকমের অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে পড়ে থাকতে চায় না, সেখানে তারা প্রাণ খুলে হাসি–গল্প করতে চায়; আর কেবলমাত্র সেই যুক্তিতে ভাষাগত অসুবিধার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে অতি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কেউ যদি সমভাষিতার ভিত্তিতে 'ক্লাব' খোলেন, সে ক্ষেত্রে তার বিরোধিতা করাও ঠিক চলে না। তবে এই ধরণের প্রবণতাকে উৎসাহ দেওয়াও যায় না। জ্ঞানবিশেষের অনুশীলনে সুবিধার জন্যে বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর গবেষকরা নিজেদের 'ক্লাব' গড়তে পারেন–যেমন ধরুন–

চিকিৎসক বা আইনজীবী। 'ক্লাবে' হাসি–গল্প, মেলামেশার মাধ্যমে উষ্চতর ভাবের কিছুটা আদান–প্রদান হয়ে যেতে পারে ও তার ফলে একে অপরের দ্বারা উপকৃত হয়ে' মিলিত প্রচেষ্টায় শাস্ত্র বা বিজ্ঞানবিশেষকে দ্রুত উন্নতির পথে নিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু বর্তমানে এক শ্রেণীর শিক্ষিতন্মন্যেরা নিজেদের জন্যে স্বতন্ত্র 'ক্লাব' চেয়ে থাকেন। তার পেছনে কি এই ধরণের কোন ভাবনা থাকে? সেখানে একমাত্র বৃত্তি এই থাকে যে মূর্খ প্রাকৃত জনসাধারণ আমাদের সঙ্গে মেলামেশো করলে আমাদের ইজ্জৎ যাবে। আপনারা অনুসন্ধান করলে দেখতে পাবেন যে সমাজের এই শ্রেণীর উষ্চস্তরের (?) 'ক্লাব' গুলিতেই সাধারণতঃ দুর্নীতির তাণ্ডব–নৃত্য চলতে থাকে–সুরার স্রোত বয়ে যায়। তবু্ মানতে হবে যে এই সকল 'ক্লাবের সভ্যরা সভ্য, ভদ্র, শিক্ষিত আর বাকিরা অসভ্য, অভদ্র, মূর্খ।

সভ্যতার নামে এই ধরণের ন্যাকামি চলতে দেওয়া যেতে পারে না। শিক্ষিত– মূর্খের মধ্যে স্ব–কপোলকল্পিত ভেদরেখা টেনে দিয়ে মানুষকে মানুষের থেকে দূরে সরিয়ে রাখলে বলিষ্ঠ মানুষ সমাজ কিছুতেই গড়ে উঠতে পারে না। মানুষকে আরও বেশী করে মানুষের কাছে আসতে হবে, মর্ম দিয়ে মর্মকে ছুঁয়ে একে অপরকে বুঝতে হবে।

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, সামাজিক, আর্থিক, মানসিক তথা আধ্যাত্মিক প্রতিটি ভূমিতেই মানুষকে তার অধিকার সচেতন করে দেওয়ার নামই জ্ঞানবিস্তার করা, আর এই অধিকারের পূর্ণ প্রয়োগের নামই বিজ্ঞান সাধনা। যে অবহেলিত মানব যে কোন কারণেই হোক জ্ঞান–বিজ্ঞান থেকে দূরে রয়েছে তাদের সে সুযোগ ষোল আনা দিতে হবে। কোথাও কোন অধিকারগত ভেদ রাখলে চলবে না। এ কথা খুবই সত্য যে সামাজিক, আর্থিক, মানসিক তথা আধ্যাত্মিক প্রতিটি ক্ষেত্রেই মানুষের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে কায়েমী স্বার্থবাদীর দল রীতিমত শেকড় গেড়ে জেঁকে বসেছে। তারা বাকীদের প্রাণশক্তির সবটুকুই নিঃশেষে শুষে নিতে চায়। তাই অজ্ঞ পাক জ্ঞানালোক, ছোট জাত উঠুক ওপরে, বুভুক্ষু পেট ভরে খেতে পাক, কু–সংস্কারাচ্ছন্নের কু- সংস্কার দূর হোক আর অধ্যাত্ম–জ্ঞান ও বিজ্ঞান ঠিকভাবে জেনে নিয়ে সবাই সে রাজ্যে এগিয়ে চলার সমান সুযোগ পা'ক কায়েমী স্বার্থবাদীরা তা' চাইবে না, তা' চাইতে পারে না; অথচ তথাকথিত পণ্ডিত–মূর্খের যে কাল্পনিক ভেদরেখার কথা বলছি সেটা দূর করতে গেলে অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে কষ্টকল্পিত ভেদের কোন অবকাশ না রাখতে গেলে এই মানবিক মূল্যটুকু স্বীকার করে নিতেই হবে। জ্ঞান আর বিজ্ঞান এরা হবে উন্মুক্ত আলো–

হাওয়ার মত, অবাধ ঝর্ণাধারার মত সবাইকেই এরা বাঁচিয়ে রাখবে, প্রতিনিয়ত প্রাণরস জুগিয়ে যাবে।

শিক্ষা-অশিক্ষার ক্ষেত্রে কায়েমী স্বার্থবাদীর দল যেমন শোষিতের মধ্যে অজ্ঞতাকেই পুষে রাখতে চায় কারণ সে ক্ষেত্রে মানবিক মূল্যকে অস্বীকার করার বেশ একটা অজুহাত পাওয়া যায়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এ জাতীয় ন্যাকামি আরও প্রকট, আরও বীভৎস। একজন উচ্চ ডিগ্রীধারী ব্যক্তি সেই ডিগ্রী ভাঙ্গিয়ে যখন অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করে তখন সে যেমন ভুলে যায় যে একজন তথাকথিত সবলকায় মূর্খ তারই মত নিজের সম্পদ ভাঙ্গিয়ে অর্থাৎ গতর খাটিয়ে অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করছে, সেক্ষেত্রে সে যেমন মানুষ হিসেবে ওই তথাকথিত মূর্খকে মানুষের সম্মান তথা অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখে পৌরুষ বোধ করে, পূর্বপুরুষের সম্পত্তি পেয়ে বা লোক ঠকিয়ে প্রচুর সম্পত্তি আত্মসাৎ করে অথবা পুঁজির সঙ্গে বা বিনা পুঁজিতে বুদ্ধি খাটিয়ে প্রচুর সম্পত্তির মালিক হ'য়ে এই ধনীর দলও ভুলে যায় যে আলো-হাওয়া-জলের মত জাগতিক প্রতিটি সম্পদই জীবমাত্রেরই সাধারণ সম্পত্তি, কোনটাই কারও ব্যষ্টিগত বা পৈতৃক সম্পত্তি নয়। প্রকৃতিদত্ত সম্পদ সৰাইকার মিলেমিশে ব্যবহারের জন্যে, কারও এতে মৌরসি মোকররি পাট্টা নেই। যদি কেউ বলেন অন্যে যেমন

গতর খাটিয়ে অর্থোপার্জন করে গ্রাসাচ্ছাদনের বন্দোবস্ত করে, আমিও তেমনি বুদ্ধি খাটিয়ে সেই জিনিসটাই করছি, বৌদ্ধিক পরিশ্রম আমারও যখন রয়েছে তখন আমিও মেহন্নতি মানুষ বলে গণ্য হৰ না কেন? এর জবাৰে এতটুকুই বলৰ যে-যে জিনিসের আদি-অন্ত-কুল কিনারা নেই সেই ৰৌদ্ধিক বা ভাবজগতের সম্পদগুলো বুদ্ধির জোরে যত পার দখল করো না কেন, কারও তাতে কিছুই বলার নেই, কিন্তু পার্থিব জগতের যে সম্পদগুলো সীমিত, যেমন ঘর-বাড়ী, জমি, অন্ন-বস্ত্র, টাকা এগুলো বুদ্ধির জোরে তুমি একা যদি আত্মসাৎ করে ফেল তাতে করে আর শত-সহস্র লোককে তার প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ থেকে বঞ্চিত করা হয় না কি? হ্যাঁ, বুদ্ধির জোরে অর্থোপার্জন নিশ্চয়ই করতে পার, কিন্তু সে উপার্জন যেন ততটুকুই হয়-তোমার পরিবার প্রতিপালনের জন্য বা তাদের দুর্দিনের সংস্থানের জন্যে যতটুকুর প্রয়োজন, তার চাইতে একপয়সাও বেশী নয়। সর্বদাই মনে রাখতে হবে অর্থের মূল্য ব্যবহারে। তোমার ঘরে তোমার প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ সঞ্চিত হ'লে ব্যবহার না থাকায় তা' মূল্যহীন হ'য়ে যায়। যতটা অর্থকে তুমি মূল্যহীন করে ফেলছ একজন বুভুক্ষু-বিবস্ত্র মানুষের প্রতি তুমি সেই পরিমাণ অবিচারও করে ফেলেছ। তোমার মূল্যহীন টাকাগুলো অন্যকে ব্যবহারের সুযোগ দিয়ে সেগুলোকে মূল্যবান করে নিতে হবে। তাই বলি

যারা পার্থিব সম্পদের অন্যতম বিনিময়–মাধ্যম এই অর্থের উচিত ব্যবহার জানে না প্রকৃতপক্ষে তারা সমাজদ্রোহী। সমাজের যেটা প্রাণের কথা সেই 'একসঙ্গে চলার ভাব' তাদের মধ্যে নেই। মুখে বড় বড় কথা বলে মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যায় না। এই মূল্যবোধের পরিচয় ছোট বড় প্রতিটি কাজের মধ্য দিয়েই দিতে হয়। আর এই কাজগুলোর একমাত্র কারণ না হলেও অন্যতম হচ্ছে আর্থিক ক্ষেত্রে মানবিকতাকে স্বীকৃতি দেওয়া। যে সমাজ এই অসাম্যকে স্বীকার করে নিয়েছে, যে সমাজ কুযুক্তির অবতারণা করে এই অসাম্যকে জীইয়ে রাখতে চায় সে সমাজ সমাজ নয়। এই জাতীয় কুযুক্তির ধ্বজাধারীরা ধর্মের ভেক ধরে নিপীড়িত মানুষ–সমাজকে বোঝাতে চায় যে তাদের এই অর্থকৃচ্ছ্রতাপ্রসূত লাঞ্ছনা, অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব, চিকিৎসাভাব, গ্রীষ্মে রোদে পোড়া, শীতে কুঁকড়ে জমে মরা এগুলো সমস্তই নাকি বিধিলিপি, পূর্বকৃত কর্মের প্রতিক্রিয়া। কিছুদিন পূর্বে জনৈক কোটিপতিকে কোন একটি সভায় বলতে শুণেছিলুম যে আজকের সমাজে গীতার কর্মবাদ ভালভাবে প্রচার করা দরকার কারণ এই কর্মবাদকে নাকি ভালভাবে বুঝতে পারলে 'ডাষ্টবিনের' এই নিপীড়িত নরকঙ্কালের দল তাদের দুর্দশার জন্যে আর পুঁজিবাদীগণকে দোষ দেবে না; তারা সহজ ভাবেই তাদের দুর্দৈবকে মেনে নেবে। শুনুন, কী সাংঘাতিক কথা!

পুঁজিবাদের কি সুন্দর দর্শন! হয়তো কায়েমী স্বার্থবাদীদের তল্পিধারী একশ্রেণীর বেতনভুক তথাকথিত পণ্ডিত এই উক্তির সমর্থনে দর্শনও খুঁজে বার করতে চেষ্টা করবে। পরমব্রহ্ম মানুষকে এই শ্রেণীর দর্শনের হাত থেকে রক্ষা করুন।

জীবনে সত্যিকারের কোন মহৎ আদর্শ না পাওয়া পর্যন্ত মানুষের জাগতিক ভোগলিপ্সা মেটে না। নেকড়ে বাঘের মত তার খাবার আশা কিছুতেই পূর্ণ হয় না। সর্বদাই সে যেন বলছে- "মে ভুখা হুঁ।" তার মুখের হাঁ যেন খোলাই রয়েছে। আর পৃথিবীর বোকা মানুষগুলো নিজেদের বিধিলিপিকেই স্মরণ করে তার মধ্যে প্রবেশ করছে। এই হিংস্র নেকড়ের দল তাদের রক্ত-মাংস নিঃশেষে খেয়ে ফেলে নীরস হাড়গুলোকে বাইরে ফেলে দিচ্ছে। এই নেকড়ে-দর্শনকেও কি মানতে হবে? মুখে শ্রান্তি-ক্লান্তির চিহ্ন নিয়ে স্নান না করা, ময়লা পোশাক পরা যে মুটে-মজুর-চাপরাশীর দলকে চারপাশে দেখি, অর্থের শ্রী যাদের আছে তাদের কাছে এরা মানুষ নয়। কায়েমী স্বার্থের লক্ষ্মণই হচ্ছে এই যে সে নিজেকে ছাড়া আর কাউকে ভাবে না। সে খাদক, বাকীরা খাদ্য। নিজের জন্যে তার আরও অনেক কিছুই চাই।. যার মাসিক আয় তিন হাজার তার পক্ষে সেটা খুবই সামান্য, কিন্তু যার মাসিক আয় ত্রিশ তার কথাটা না ভাবাই ভাল; অথচ ওই ত্রিশ টাকা আয়েই

তাকেও বাড়ী–ভাড়া দিতে হয়, স্ত্রী–পুত্র–কন্যাকে প্রতিপালন করতে হয়, ছেলেকে লেখাপড়া শেখাতে হয়, বাচ্চার দুধ যোগাতে হয়, মেয়ের বিয়ে দিতে হয়–এ প্রয়োজনগুলো কি কেবল সমাজের ওপর তলাকার মানুষের জন্যে? এগুলো কি জীবনের সর্বনিম্ন আবশ্যকতা নয়? হাঁ, অবশ্যই এ সকল গরীবের কথাটা চিন্তা করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। চিন্তা করতে গেলেই নিজেকে কিছুটা ত্যাগ স্বীকার করতে হবে যে! গরীবের পেটে জ্বালা না থাকলে ধনীর বিলাসের উপকরণ জুটৰে কি করে? গরীবের মেয়েরা চিরকাল গোবর কুড়িয়ে বেড়াক আর তাদের ছেলেরা পুরুষানুক্রমে ধনীর গৃহে চাকরের কাজ করুক এই ব্যবস্থাটাই বেশ ভাল না! গরীবের উচ্চাশা! ছি– ছি–ছি–সেটা একটা দুরাশা!

পৃথিবীর কোন দুটো জিনিস সমান নয়। তাই সব কিছুকে এক ছাঁচে

ঢেলে সাজানোর কথা আমি বলছি না। তবু মানবতার খাতিরে, সুবিচারের খাতিরে বিশ্বের সম্পদ সকল মানুষের মধ্যেই সমভাবে বন্টিত হওয়া দরকার; আর জাগতিক সম্পদের সমান মালিকানা পাওয়া প্রতিটি মানুষের জন্মসিদ্ধ অধিকার। এ অধিকার থেকে কাউকে বঞ্চিত করৰার

সামান্যতম প্রচেষ্টাও ঘোরতর স্বার্থপরতার কাজ। বাস্তব জগতের ছোট-বড় কতকগুলি অসুবিধা যতক্ষণ আছে ততক্ষণ হয়তো নিক্তির ওজনে সমস্ত সুবিধা সকলকে দেওয়া সম্ভব নয়, তা ছাড়া গঠনমূলক কাজে উৎসাহ বা প্রেরণা দেবার জন্যে বা বিশেষ কতকগুলো কাজের আনুষঙ্গিক অঙ্গ হিসাবে মানুষ বিশেষকে কয়েকটা সাময়িক সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার প্রশ্ন বাদে অন্যান্য সমস্ত ক্ষেত্রেই সকল মানুষকেই সমান অধিকার তথা সমান সুযোগ-সুবিধা দিতেই হবে। জীবনধারণের অত্যাবশ্যক বস্তুগুলি-যেমন, বস্ত্র, বাসস্থান, আহার্য, চিকিৎসা ও শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিটি মানুষেরই কাঁটায় কাঁটায় সমান অধিকার পাওয়া দরকার। কেউ যদি বলেন "আজকে যে অন্নাভাবে বা বস্ত্রাভাবে কষ্ট পাচ্ছে সেটা শুধু তার পূর্বজন্মের কৃতকর্মের ফল-তাই এ ব্যাপারে আমাদের কোন সামাজিক দায়িত্ব নেই"-এর জবাবে আমি বলব কর্মের পরিমাপের সমান ফল যদি মানুষকে ভুগতেই হয় তাহলে ভোগটা তো তার মানসভূমিতে অন্যভাবেও হতে পারে। অন্নাভাবে বস্ত্রাভাবে ক্লেশ না পেয়েও বা সামাজিক বৈষম্যের দরুণ লাঞ্ছনা ভোগ না করেও মানুষ মানসিক ক্লেশের মাধ্যমে তার কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারে! তার সেই জাতীয় ক্লেশ ভোগ হয়তো সামাজিক সুবিচারের মাধ্যমে দূর করা সম্ভব নয়। যে দেশে মানুষের খাওয়া- পরা বা চিকিৎসার

কোন কষ্ট নেই–সেদেশেও মানসিক ক্লেশ আছে ও থাকবে, সেদেশেও মানুষকে অপমানের জ্বালা ভোগ করতে হবে। প্রিয়জনের মৃত্যুতে কাঁদতে হয়, রোগযন্ত্রণায় কাতরোক্তি করতে হয়, এ ক্লেশগুলো তো সামাজিক সুবিচারের দ্বারা দূর হবার নয়। কিন্তু ব্যাষ্টিগত বা সমষ্টিগত ক্লেশের যেটা বস্তুতান্ত্রিক অংশ সেটা সামাজিক সুবিচার বা সমতার দ্বারা অনায়াসেই সমাধান করা যেতে পারে। এজন্যে অন্যের কৃতকর্মকে বা অন্যের দৈবকে ধিক্কার দেওয়া বৃথা। বস্তুতঃ অন্যের ক্লেশ দেখে তার পূর্বকৃত কর্মের দোহাই–পাড়া কায়েমী স্বার্থের মনোভাব ছাড়া আর কিছুই নয় কারণ জিনিসটাকে একটা সামাজিক ব্যাধি বা অসঙ্গতি বলে' স্বীকার করে নেবার সঙ্গে সঙ্গে এ সম্বন্ধে নিজেরও একটা ব্যষ্টিগত দায়িত্ব এসে যায়।

একটু আগেই বলেছি যে, হয়তো কতকগুলো ছোট–বড় অসুবিধার জন্যে জাগতিক সম্পদ প্রতিটি মানুষের মধ্যে নিক্তির ওজনে ভাগ করে দেওয়া সম্ভব হ'য়ে উঠছে না বা ওঠে না; কিন্তু বৈষম্য দূর করবার কাজে হাত লাগাতে কে বারণ করেছে! ত্রিশ টাকা বেতন আর তিন হাজার টাকা বেতনের ব্যবধানটুকু কমিয়ে ফেলতে অসুবিধা কোথায়! হ্যাঁ, এতে হয়তো তিন–হাজার টাকার বেতন ভোগীদের বিলাস–

ব্যসন কিছুটা সঙ্কুচিত করে সেই অর্থে বেশ কিছু সংখ্যক মানুষকে মানুষের মত বাঁচৰার কিছুটা সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। কায়েমী স্বার্থের এইখানেই ৰোধহয় আপত্তি, এইখানেই ৰোধহয় কিছুটা অসুবিধা। কেন? প্রতিটি মানুষকেই পরিবার প্রতিপালনের মত সর্বনিম্ন বেতনের ব্যবস্থা দিয়ে যোগ্যতা ও দায়িত্ব অনুযায়ী ব্যষ্টি বিশেষকে যদি বিশ-পঁচিশ টাকা বেশী দেওয়া হয়, সেটাই ঠিক নয় কি? এতে মানুষের যোগ্যতা বা দায়িত্ব-বোধের প্রতি ঠিক ঠিক সুবিচারও করা হয়।

সমাজের আসল ব্যাধিটার দিকে মানুষ এখনও চোখ মেলে চাইছেনা। সংঘ বা সমিতিগুলো বিভিন্ন বৃত্তি-জীবীরা গড়ে তুলেছে সম্পূর্ণ ব্যষ্টিগত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থের প্রেরণায়। তাই এ জাতীয় সমস্যাগুলোর, শুধু এই জাতীয় সমস্যাই বলি কেন, জগতের প্রতিটি সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে মানুষ কেবল নিজেদের দিকেই তাকাচ্ছে। নীচের তলাকার মানুষের পানে চাইছে না। যে ওপরে আছে তাকে নামাবার কাজে যতটা শক্তি ব্যয়িত হচ্ছে, যে নীচে আছে তাকে তুলবার কাজে তার শতাংশের একাংশও ব্যয়িত হচ্ছে না, এইটাই সৰচাইতে দুঃখের কথা।

ব্যষ্টিগতভাবে কোন কালে কোন মানুষ এ সম্বন্ধে যে কিছু ভাবেনি এ কথাও ঠিক নয়। আমি কয়েকশ' বছরের সমাজ–দর্শনের সামাজিক বিবর্তনের বা বিভিন্ন মনীষীর সামাজিক চেতনার কথা বলছি না। মধ্যযুগের মানুষদের কারও কারও মধ্যে এই জাতীয় সামাজিক বৈষম্য দূর করার কথা জেগেছিল, চেষ্টাও তারা করেছিল। আমি দরিদ্রের প্রতি বৈশ্যের কৃপা–কণার কথা বলছি নে'– বলছি তাদের কথা যারা ভাৰত ধনীর ধন লুণ্ঠন করে দরিদ্রের মধ্যে বণ্টন করা একটা পুণ্যকর্ম। সে যুগের সে রবিনহুডেরা ভাবত, হয়ত এইভাবেই সামাজিক অসাম্য দূরীভূত হবে, কিন্তু তা' হৰার নয়, তাই তা হয়নি। পৃথিবীর কমবেশী প্রতিটি দেশেই এই জাতীয় রবিনহুডের অভ্যুদয় হতে দেখেছি। কিন্তু এতে সমস্যার সমাধান হয় না। তার কারণ দানে কেউ বাঁচে না; তাতে একটা ভিক্ষাজীবীর সমাজ তৈরী হয় বটে, কিন্তু সেই লোভী, জড় অকর্মণ্য সমাজ ভবিষ্যতে অধিকতর দারিদ্র্যের সূচনা করে দেয়। অপরপক্ষে লুণ্ঠনের ফলে পুঁজিৰাদ ধ্বংস হয় না কারণ এই জাতীয় ডাকাতিতে পুঁজিৰাদীর পুঁজি কমে হয়তো, কিন্তু পুঁজিৰাদের বীজ মরে না। মধ্যযুগের এই হীরোরা আজকের মানুষের রক্ত হয়তো গরম করে দেয় কিন্তু প্রেরণা জোগাতে পারে না। শক্তি সম্প্রয়োগে মানুষের সম্পদ ছিনিয়ে বস্তুতান্ত্রিক জগতে আপাতঃদৃষ্টিতে তাকে নিঃস্ব করে

ফেলা যায় বটে, কিন্তু বস্তুতান্ত্রিক জগতে ধনী হবার সুযোগ থেকে তাকে স্থায়ীভাবে বঞ্চিত করা যায় না। হিংসা হিংসাকেই ডেকে আনে। তাই এই নররক্তলোলুপ পিশাচের দল এরপরে আবার বড় রকমের ষড়যন্ত্র করতে বসে ও অল্পবুদ্ধি ডাকাতের দল শেষ পর্যন্ত তাদের হাতেই ধ্বংস হয়। শোষকরা দস্যুদের হাত থেকে যতবড় শাস্তি পেয়েছিল দস্যুরা শোষকদের হাতে তার চেয়েও বড় রকমের শাস্তি পায়।

শক্তি–সম্প্রয়োগে সমস্যার সমাধান হয় না। কারণ ব্যষ্টি বা সমষ্টি মনের যে বিষবৃক্ষকে এই শক্তি–সম্প্রয়োগের দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছিল তার বীজ মানুষের মনে থেকেই যায়। অবস্থার চাপ কিছুটা শিথিল হলেই তা' অঙ্কুরিত হ'য়ে ওঠে ও অধিকতর অনর্থের কারণ হ'য়ে দাঁড়ায়।

তবে, এই সমস্যার সমাধান কিসে? এ কথা ঠিক যে দরকার হৃদয়বৃত্তি পরিবর্তনের। আর এই হৃদয়বৃত্তির পরিবর্তন হিংস্রপদ্ধতিতে হওয়া সম্ভব নয়। অতৃপ্ত ক্ষুধা নিয়ে যদি কেউ কেবল সংঘ শক্তির ভয়ে নিজের ক্ষুধার কথা প্রকাশ না করে বা ক্ষুন্নিবৃত্তির অভিনয় করে তার মানে এ নয় যে ক্ষুধা মিটে যাবার শক্তি সে পেয়েছে বা সুযোগ পেলে সে নির্মমভাবে ক্ষুন্নিবৃত্তির প্রচেষ্টায় রত হবে না। কেউ কেউ

তাই বলেন কেবল মানবিক আবেদনেই এই হৃদয়বৃত্তির পরিবর্তন সম্ভব, অন্য কিছুতেই নয়। তাঁদের এই মনোভাব বা এই নীতি খুবই উচ্চস্তরের হলেও পৃথিবীর মাটি খুবই কঠিন, সেখানে এই শ্রেণীর সাত্ত্বিকী আবেদন খুব সহজে নিজের প্রাণরস সংগ্রহ করতে পারবে না। মানবিক আবেদন বা সত্যাগ্রহ জিনিসটা কি? বস্তুতঃ এ জিনিসটাও অবস্থার চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ প্রকারের শক্তি–সম্প্রয়োগ ছাড়া আর কিছুই নয়। একে বলতে পারি বিপ্রোচিত শক্তি–সম্প্রয়োগ। এতে করে স্থূলভাবে কোন শক্তির ব্যবহার না করে আইন–কানুনের সাহায্য না নিয়ে বা চোখ না রাঙিয়ে অথবা খুনোখুনি–রক্তারক্তি না করে মানুষকে কল্যাণের পথে চলতে আগ্রহশীল করে তোলা অথবা আরও সোজা ভাষায় বলতে গেলে চলতে বাধ্য করা হয়। অবস্থার চাপ জিনিসটা কী? শক্তি–সম্প্রয়োগ করে কল্যাণ–তরঙ্গে ব্যষ্টি বা সমষ্টিমনকে দুলিয়ে দেওয়া নয় কি? মানবিক আবেদনে বা সত্যাগ্রহে মানুষের মনের যে–অংশটি খুবই কোমল, যে–অংশটি একটুকুতেই দুলে ওঠে, সে–টুকুকেই ছোঁয়ার চেষ্টা করা হয়। তাই 'যারা বিচারশীল, যাদের মনে বেশ কিছুটা কোমলতা আছে, সত্যাগ্রহে বা মানবিক আবেদনে তারাই সাড়া দেয়। জড়বুদ্ধির কাছে এই জাতীয় আবেদন খুব বেশী মূল্য বহন করে না। তাদের মনকে দোলা দেবার জন্য,

কঠোরতম আঘাত হানবার প্রয়োজন আছে ও চিরদিন থাকবে অন্যথায় কেবল এই সাত্বিকী আবেদনের ফলে কবে কোন কঠোর মনের গোপন কোণে কোমল বীণাতন্ত্রী বেজে উঠবে তার অপেক্ষায় অনন্তকাল ধরে বসে থাকতে হয়। যে নিপীড়িত হতভাগ্যদের দুঃখমোচনের জন্যে এই আবেদন, তাদের অস্থিপঞ্জর ততদিনে গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে যাবে। তাই গান্ধীবাদ বা ভূ-দান আন্দোলন মানুষের সহৃদয়তার যতখানি মূল্যই দিক না কেন বা এর প্রবক্তারা যতই ঋষিকল্প মনুষ্য হোন না কেন এ নীতি ক্ষুদ্র স্বার্থপ্রলুব্ধ মানুষ সাধারণভাবে কখনোই গ্রহণ করবে না। পদযাত্রীর পায়ের ক্ষত তাদের কঠোর মনকে নাড়া দিতে পারবে না। গান্ধীবাদ কল্পনার স্বর্গে সুন্দর কিন্তু বাস্তবের পৃথিবীতে উদ্ভট আত্মম্ভরিতামাত্র।

হ্যাঁ, মানুষের মনে দোলা লাগিয়ে দিতেই হবে আর সেজন্যে কেবলমাত্র সাত্বিকী শক্তি বা মানবিক আবেদনের মুখ চেয়ে বসে থাকলে চলবে না। অবস্থার চাপ সৃষ্টির জন্যে প্রয়োজনবোধে সব ব্যবস্থাই নিতে হবে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইনের সাহায্যে চাপ সৃষ্টি করা বা শক্তিবাদী রাষ্ট্রে অবস্থার চাপে শোষকগণকে সৎপথে থাকতে বাধ্য করা কোনক্রমেই ত্রুটিযুক্ত বলে মনে করতে পারি না। তবে হ্যাঁ, যে ভাবেই হোক দোলা লাগানোটাই চরম কথা নয়, দোলার ঢেউ যাতে

ঠিক থাকে তার জন্যে যথোচিত নীতিশিক্ষার ব্যবস্থাও রাখতে হবে– এই দোলার তরঙ্গটুকু ঠিক রাখবার জন্যে ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনে অফুরন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। নজর রাখতে হবে পুরানো হওয়ার দরুন প্রাণশক্তি যেন ঝিমিয়ে পড়তে না চায়, পৌরুষ যেন ঘুমিয়ে পড়তে না পায়, মনের নিভৃত কোণে জড়তা যেন বাসা বাঁধতে না পায়।

যারা মানুষের হৃদয়বত্তার ওপরেই ষোলআনা নির্ভর করে মানবিক আবেদনকেই একামাত্র পুঁজি ৰলে গ্রহণ করেছে তারা ব্যর্থ হবে; যারা হৃদয়বৃত্তির পরিবর্তনের জন্যে কোনপ্রকার ব্যবস্থা না নিয়ে বা স্বভাব সংশোধনের জন্যে কোন নীতিগত বা আদর্শগত পন্থা অবলম্বন না করে কেবলমাত্র আইনের চাপে বা সঙ্গীন উঁচিয়ে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চায় তারাও ব্যর্থ হৰে কারণ তাদের এই কষ্টসৃষ্ট সাম্যবাদকে ডাকাতির পর্যায়ে যদি নাও ফেলি তবু ৰলৰ এটা ডাকাতির চাইতেও মারাত্মক জিনিস কারণ মানুষের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে আত্মপ্রকাশের যে প্রাণিক আকুতি আছে এতে তা' জড়শক্তির সাহায্যে দাবিয়ে' রাখা হয়। এভাবে দেৰে থাকা জৈবধর্ম–বিরোধী। তাই দমিত মন বিদ্রোহের মাধ্যমেই (কেউ যদি একে প্রতিবিপ্লব নাম দেয়, দিতে পারে কিন্তু আমি একে প্রতিবিপ্লব ৰলৰ না) নিজের স্ফূর্তির পথ বার করে নেৰে।

মানুষ তার প্রাণীন সম্পদ, তার আত্মিক সম্ভাবনাকে খুইয়ে, উদর–উপস্থজীৰী পশু হিসেবে বেঁচে থাকতে চায় না–পারে না।

অথচ জড়শক্তির সাহায্যে মানুষকে উদার (?) তথা সাধু (?) করে রাখতে গেলে তার ব্যষ্টি–স্বাধীনতা নির্মমভাবে ক্ষুণ্ণ করতেই হয়। দলবিশেষ বা গোষ্ঠীবিশেষের হাতে শক্তি কেন্দ্রীভূত করতেই হয়, মানুষ হিসেৰে মানুষের যে একটা বিশেষ মূল্য আছে এ ব্যবস্থায় তাকে অস্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। তার মূল্য স্বীকার করলেই বিপদ। কারণ সেক্ষেত্রে তাকে তার মতপ্রকাশের বা নিদেনপক্ষে তার মতটা যে কল্যাণকর সেটা ৰোঝাৰার অধিকারটুকুকেও স্বীকৃতি দিতে হবে। আর এই স্বীকৃতি দেবার সঙ্গে সঙ্গে নিছক জড়শক্তির সাহায্যে মানুষকে দাবিয়ে রাখাটা যে অন্যায় সেটাও প্রকারান্তরে মেনে নিতে হয়। এই মেনে নেওয়ার ফলে কষ্টসৃষ্ট তথাকথিত সাম্যবাদ তো বিপর্যস্ত হবেই; অধিকন্তু যে দল বা গোষ্ঠীর হাতে শক্তি কেন্দ্রীভূত হয়েছিল তারাও সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত সাধারণ মানুষের মিলিত আত্মিক তথা মানসিক শক্তির চাপে অল্পকালের মধ্যেই ক্ষমতাচ্যুত হবে। তাই এই গান্ধীবাদ আর জড়শক্তি কেন্দ্রিক তথাকথিত সাম্যবাদ এ দুটোর কোনটাই মানুষের কল্যাণ

করতে পারবে না। মানুষকে বেছে নিতে হৰে এমন একটা পন্থা যেখানে কোন অবস্থাতেই মানবতাবোধের বা মানবিক আবেদনের অভাব থাকবে না। অধিকন্তু প্রয়োজনবোধে জড়শক্তি তথা অন্য যে কোনপ্রকার শক্তি–সম্প্রয়োগের ব্যবস্থা থাকৰে।

মানবতার ভিত্তিতে কোন কিছু গড়ে তুলতে গেলে মানুষের প্রতি সত্যিকারের ভালবাসাটাই হবে তার ভিত্তিভূমি। যে বুদ্ধিমান বা যে বড় কর্মী বা আর পাঁচজনের চাইতে গুণের মাত্রা যার কিছুটা বেশী, সে খুঁটিনাটি প্রতিটি ব্যাপারেই কতখানি কী পেলুম আর কতখানি কী হারালুম তাই যদি খতিয়ে দেখে তাহলে তাদের সমবায়ে কোন সত্যিকারের কল্যাণধর্মী সমাজ গড়ে উঠতে পারে না। ভালবাসাটা যেখানে প্রধান সেখানে ব্যষ্টিগত লাভ– ক্ষতির প্রশ্নটা গৌণ হ'য়ে দাঁড়ায়। ব্যষ্টিগত লাভ–ক্ষতিটা আমি সম্পূর্ণভাবে উড়িয়ে দিতে চাই না কারণ ব্যষ্টিগত ক্ষতির মাত্রাটা বেশী হয়ে গেলে ভালবাসায় আবিলতা এসে যাবার সম্ভাবনা। তবে ব্যষ্টিগত স্বার্থে বড় রকমের ধাক্কা লাগলে অথবা যে কোন কারণেই হোক, নিজের অস্তিত্ব রক্ষা কষ্টসাধ্য মনে হলে ভালবাসা–ভিত্তিক সমাজের কাছ থেকে তার প্রতিকার দাবী করৰার অধিকার মানুষের থাকা উচিত। সুস্থ সমাজ গড়ে তোলৰার

একমাত্র মশলা যেখানে সত্যিকারের ভালবাসা সেখানে জোর-জবরদস্তি করে বা আইনের চাপে সমাজের এই সত্যিকারের রূপটুকু ফুটিয়ে তোলা কী করে সম্ভব? আগেই বলেছি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যারা তথাকথিত ভাববাদী অর্থাৎ যারা মনে করেন মানুষের কাণে কেবল আদর্শবাদের কথা শোণালেই একটি আদর্শ সমাজ গড়ে উঠবে, তাদের সাফল্যে আমি আস্থা রাখতে পারি না। আর যাঁরা নিছক শক্তি-সম্প্রয়োগের ওপর নির্ভর করেন তাঁদের আমি একেবারেই সমর্থন করতে পারছি না, কারণ আজ যে মানুষকে বেকায়দায় পেয়ে তার ওপর শক্তি-সম্প্রয়োগ করছে (নিজের ত্রুটি হয়তো সে সব সময় বুঝতেও পারে না) সে প্রতি মুহূর্তে রক্তপাতের মাধ্যমে পাল্টা শক্তি-সম্প্রয়োগের চেষ্টা যে করবে তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। কারণ অবদমিত বৃত্তিকে ফুটিয়ে তোলাই মানুষের স্বভাবধর্ম, আর এই বৃত্তি-স্ফুরণ যদি রোধ করতে হয় তবে স্বভাবটাতেই পরিবর্তন আনতে হবে। জিনিসটা একটা মূলনীতি-ঘটিত ব্যাপার। এ সম্বন্ধে কোন স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করার চেষ্টা একেবারেই অর্থহীন।

সর্বতোভাবে নিজের স্ফুরণের পথ খোঁজা জীবের স্বাভাবিক ধর্ম। এই স্ফুরণ কোথাও স্থূল-ভোগাত্মক আর কোথাও সূক্ষ্ম মানস-ভোগাত্মক। কিছু আগে বলেছি যে স্থূল ভোগ্যবস্তুগুলি

প্রত্যেকটি সীমিত, তাই তাদের কোনটাই ব্যষ্টিবিশেষের ঘরে পুঞ্জীভূত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। সূক্ষ্ম মানসতত্ত্বের ভোগ যে যত বেশী পারে করুক, মানসজগতে বা অধ্যাত্মজগতে যে যত বেশী সম্পদের অধিকারী হয় হোক, কিন্তু জড়-ভোগ্য জগতের সম্পদ একজনের কাছে যাতে বেশী না জমে তার জন্যে প্রয়োজনক্ষেত্রে কিছুটা শক্তি-সম্প্রয়োগ করতে হবে বৈকি, কিন্তু এ-ও তো জানি যে শক্তি- সম্প্রয়োগে সে তার সঞ্চিত সম্পদ থেকে কিছুটা বঞ্চিত হৰে বটে বা ভবিষ্যতে সঞ্চয়ের সুযোগও তার কমে যাৰে বটে, কিন্তু জড় ভোগ্যবস্তু পাবার জন্যে যে মনের ক্ষুধা (আসলে জড় বা মানস দুই প্রকার ভোগই 'মানসক্ষুধা থেকে উদ্ভূত, স্থূল ক্ষুধা তার চাইতে অনেক কমেই মিটে' যায়। এখানে স্থূলক্ষুধাকে অর্থাৎ crude mind এর প্রয়োজনকে বিশুষ্ক-মানসক্ষুধা বলতে আমার আপত্তি আছে) সেটাকে উপযুক্ত শিক্ষার দ্বারা ভিন্ন খাদে বইয়ে মানসভোগের ক্ষুধায় পরিবর্তিত করা নিশ্চয়ই কোন অসম্ভব কাজ নয়। মানুষ-সমাজে এই রকম শিক্ষারই প্রয়োজন আজ সব চাইতে বেশী। নিছক ভাববাদীর মত এতে জগৎকে অস্বীকার করাও হয় না আর জড়বাদীর মত মানবমনের উচ্চতর বৃত্তিগুলিকে জোর করে দাবিয়ে রাখার চেষ্টাও থাকে না।

মনের বৃত্তিগুলোকে উচ্চতর অনুভূতির পানে ছুটিয়ে দিতে না পারলে ক্ষুদ্রভোগের চিন্তাতেই সেগুলো নিজেদের জড়িয়ে রাখতে চাইবে। এ রকমধারা মানুষ যারা মুখে বড় বড় আদর্শের বুলি কপ্‌চে বেড়াচ্ছে, বক্তৃতা– মঞ্চে দাঁড়িয়ে জন–সাধারণকে পথনির্দেশনা দেবার অভিনয় করছে অথচ মনের ভেতরে ক্ষুদ্র স্বার্থের কীটগুলোকে সযত্নে পুষে রেখেছে তারা যে কোন দুর্বল মুহূর্তে জনসাধারণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে ফেলবে; অন্তত করাটাই তাদের পক্ষে স্বাভাবিক কাজ হবে। নিজেকে তৈরী করবার সাধনায় না নেৰে যারা কল্যাণ ধর্মীয়সমাজ গড়তে চায়, অধঃপতনটা যে কেবল তাদেরই হবে তা' নয়, তারা গোটা মানুষজাতটাকে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে; যাদের নিয়ে তাদের কাজ সেই মানুষকে তারা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতে পারবে না। গোড়ার দিকে নেতৃত্ব লাভের জন্যে হয়তো নিজেরা কিছুটা যোগ্যতা অর্জনের চেষ্টা করবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেদের যোগ্যতা অর্জনের চাইতে অন্যকে অঙ্গুলিহেলনে পরিচালনা করাটাই জীবনের সারবস্তু হয়ে দাঁড়াবে। ব্যষ্টিপ্রাধান্য বা দলপ্রাধান্যের মতলৰ নিয়ে মানুষজাতকে নিজেদের যন্ত্র হিসেবে বেশী দিন ধরে ব্যবহার করা যে সম্ভব নয় ও অবদমিত গণমানস যে একদিন না একদিন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠেই একথাটা ঠেকে শেখার সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে দাৰিয়ে রাখৰার একটা অপচেষ্টা

তাদের মধ্যে নিশ্চয়ই জাগৰে। মানুষের মন অবদমিত হ'য়ে থাকতে চায় না, তাই তাদের মন স্ফুরণের পথ খুঁজতে চাইৰে। ব্যষ্টি বা দলগত স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ যতই মাথা তুলতে চাইৰে স্বৈরতন্ত্রীরাও তত শক্তি–সম্প্রয়োগ করবে ও এর ফলে তাদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত যোগ্যতা–অর্জনের চেষ্টা কিছুমাত্র থাকৰে না, থাকৰে শুধু শক্তি–অর্জনের প্রয়াস। যারা একদিন কল্যাণকৃৎ হিসেবে কাজে নেৰেছিল তারাই শেষ পর্যন্ত জড়শক্তিসর্বস্ব হ'য়ে দাঁড়াৰে। কোন মানব–গোষ্ঠীর বৃহৎ অংশ জড়শক্তিকে বেশী প্রাধান্য দিয়ে ফেললে শেষ পর্যন্ত সবাই স্ব–স্ব–প্রধান হয়ে দাঁড়াবে, নীতিজ্ঞানের বিন্দুমাত্র অবশেষ থাকৰে না। সমাজে দারুণ মাৎস্যন্যায় দেখা দেবে। তাই নীতিবাদ ও শক্তি সম্প্রয়োগের মধ্যপন্থা নিয়ে যাঁরা কাজে নাৰৰেন বা নেৰেছেন তাঁরাও শেষরক্ষা করতে পারবেন না, যদি না মনের মধ্যে থেকে হীনতার কীটগুলোকে ধ্বংস করার সাধনা তাঁদের থাকে। এই মধ্যপন্থাবলম্বীরাও শেষ পর্যন্ত নিছক শক্তি–সম্প্রয়োগবাদীদের মতই হ'য়ে দাঁড়াবেন।

মন থেকে ক্ষুদ্রতার গ্লানি মুছে ফেলবার প্রয়াসই ধীর অথচ দৃঢ় পদবিক্ষেপে মানুষকে বৃহতের পানে নিয়ে যায়, শাশ্বত মহামানবতায় প্রতিষ্ঠিত করে। তাই বিশ্বমানবের সমস্যা

সমাধানে যাঁরা নেৰেছেন তাঁদের নিছক করাটাই তাদের পক্ষে স্বাভাবিক কাজ হবে। নিজেকে তৈরী করবার সাধনায়

না নেৰে যারা কল্যাণ ধর্মীয়সমাজ গড়তে চায়, অধঃপতনটা যে কেবল তাদেরই হবে তা' নয়, তারা গোটা মানুষজাতটাকে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে; যাদের নিয়ে তাদের কাজ সেই মানুষকে তারা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতে পারবে না। গোড়ার দিকে নেতৃত্ব লাভের জন্যে হয়তো নিজেরা কিছুটা যোগ্যতা অর্জনের চেষ্টা করবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেদের যোগ্যতা অর্জনের চাইতে অন্যকে অঙ্গুলিহেলনে পরিচালনা করাটাই জীবনের সারবস্তু হয়ে দাঁড়াবে। ব্যষ্টিপ্রাধান্য বা দলপ্রাধান্যের মতলৰ নিয়ে মানুষজাতকে নিজেদের যন্ত্র হিসেবে বেশী দিন ধরে ব্যবহার করা যে সম্ভব নয় ও অবদমিত গণমানস যে একদিন না একদিন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠেই একথাটা ঠেকে শেখার সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে দাৰিয়ে রাখৰার একটা অপচেষ্টা তাদের মধ্যে নিশ্চয়ই জাগৰে। মানুষের মন অবদমিত হ'য়ে থাকতে চায় না, তাই তাদের মন স্ফুরণের পথ খুঁজতে চাইৰে। ব্যষ্টি বা দলগত স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ যতই মাথা তুলতে চাইৰে স্বৈরতন্ত্রীরাও তত শক্তি–সম্প্রয়োগ করবে ও এর ফলে তাদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত যোগ্যতা–অর্জনের চেষ্টা কিছুমাত্র থাকৰে না,

থাকৰে শুধু শক্তি-অর্জনের প্রয়াস। যারা একদিন কল্যাণকৃৎ হিসেবে কাজে নেৰেছিল তারাই শেষ পর্যন্ত জড়শক্তিসর্বস্ব হ'য়ে দাঁড়াৰে। কোন মানব-গোষ্ঠীর বৃহৎ অংশ জড়শক্তিকে বেশী প্রাধান্য দিয়ে ফেললে শেষ পর্যন্ত সবাই স্ব-স্ব-প্রধান হয়ে দাঁড়াবে, নীতিজ্ঞানের বিন্দুমাত্র অবশেষ থাকৰে না। সমাজে দারুণ মাৎস্যন্যায় দেখা দেবে। তাই নীতিবাদ ও শক্তি সম্প্রয়োগের মধ্যপন্থা নিয়ে যাঁরা কাজে নাৰৰেন বা নেৰেছেন তাঁরাও

শেষরক্ষা করতে পারবেন না, যদি না মনের মধ্যে থেকে হীনতার কীটগুলোকে ধ্বংস করার সাধনা তাঁদের থাকে। এই মধ্যপন্থাবলম্বীরাও শেষ পর্যন্ত নিছক শক্তি-সম্প্রয়োগবাদীদের মতই হ'য়ে দাঁড়াবেন। মন থেকে ক্ষুদ্রতার গ্লানি মুছে ফেলবার প্রয়াসই ধীর অথচ দৃঢ় পদবিক্ষেপে মানুষকে বৃহতের পানে নিয়ে যায়, শাশ্বত মহামানবতায় প্রতিষ্ঠিত করে। তাই বিশ্বমানবের সমস্যা সমাধানে যাঁরা নেৰেছেন তাঁদের নিছক আদর্শটুকু গ্রহণ করলেই চলবে না, তার সঙ্গে সঙ্গে আদর্শ নিয়ে এগিয়ে চলবার শক্তিও সংগ্রহ করতে হবে। এই শক্তি-সংগ্রহের চেষ্টাই সাধনা- বৃহতের সাধনা। মনে রাখতে হবে কোন 'থিয়োরী'ই জীবের ত্রাণকর্তা নয়। যে উদগ্র কর্মশক্তি জৈবভাবের ছোট-বড় প্রতিটি প্রসারকে উন্মুক্ত, অবারিত করে

তুলতে সাহায্য করে, যে প্রচন্ড কর্মশক্তি ভাবলোকের শেষ – প্রান্তের কাছে অস্তিত্বের কঠোর বাস্তবতার মিলন ঘটায়, সে–ই জীবের ত্রাণকর্তা। আর্থিক, মানসিক, ধার্মিক বা সামাজিক সর্বক্ষেত্রেই এ কথাটা শাশ্বত সত্য।

ব্যষ্টি কামনার পূর্তির জন্যে ক্ষুদ্র বস্তুর পেছনে যে ছোটা তাতে আর যাই থাকুক, অনেককে এক করবার বীজমন্ত্র নিহিত থাকে না। অনেককে এক করতে গেলে অনেকের মাঝে যে সাধারণ সামান্য মানুষ–ভাব বা জীবভাবটুকু লুকিয়ে রয়েছে–এক খণ্ড পরম শ্রেয়রূপে–তাকেই ভালবাসতে হৰে। যে সেই অখণ্ড, অবারিত, উদার বিশ্বৈকভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয় নি বা হ'তে আগ্রহশীল নয়, তার মধ্যে এই সহজ ভালবাসাটুকু ফুটে ওঠে না। বৃহতের ভাবনা যেখানে নেই, উদার ও অসাম্প্রদায়িক ভাবে সর্বগ–বুদ্ধি ব্রহ্মকে যে একমাত্র ধ্যেয় হিসেবে নিতে শেখেনি, কোন প্রকার গঠনমূলক কাজে হাত লাগাবার প্রয়াস তার পক্ষে একেবারেই অর্থহীন, কারণ এ কথা ধ্রুবসত্য যে সে নিজের ও সমাজের চরম ক্ষতি করে দিয়ে শেষ পর্যন্ত যবনিকার অন্তরালে সরে যেতে বাধ্য হবে।

ছোটবড় আর পাঁচটা সমস্যার মত অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের পন্থা কেবলমাত্র একটিই। আর সেটা হ'ল মানুষের

প্রতি সত্যিকারের ভালবাসা। এই ভালবাসাই তাকে পথনির্দেশনা দেবে, বুঝিয়ে দেবে কোথায় কী করণীয় কী অকরণীয়। এর জন্যে হাজার-গণ্ডা বই পড়ার দরকার নেই। মূক জনসাধারণের ভাগ্য নিয়ে যারা ফাল্কা খেলে তাদের দ্বারস্থ হবারও প্রয়োজন নেই। দরকার কেবল ওই একটি জিনিসের-সত্যিকারের দরদ নিয়ে মানুষের পানে চেয়ে দেখা।

সামান্য একটা দৃষ্টান্ত দিই। যারা দক্ষিণপন্থী অর্থাৎ শক্তি-সম্প্রয়োগে বিশেষ আস্থা রাখেন না, জমিদারী প্রথা বিলোপ বা বৃহৎশিল্প রাষ্ট্রীকরণের ব্যাপারে তাঁরা হয়তো বলবেন উপযুক্ত মূল্য বা ক্ষতিপূরণ দিয়েই এগুলো দখল করা উচিত। যাঁরা শক্তি-সম্প্রয়োগে বিশ্বাসী কিন্তু সাধনা ও আধ্যাত্মিক শিক্ষায় মানুষের হৃদয় পরিবর্তনে বিশ্বাসী নন তাঁরা বলবেন এই পুঁজিবাদীরা অনেকদিন ধরে টাকা লুটেছে, এদের ক্ষতিপূরণ দেবার প্রশ্নই উঠতে পারে না, কিন্তু যারা মানুষের প্রতি সত্যিকারের ভালবাসা রাখেন তাঁরা এ দু'য়ের কোনটাকেই মেনে নিতে পারবেন না। ক্ষতিপূরণ দিয়ে এই জাতীয় বৃহৎ সংস্থাগুলি দখল করতে গেলে সুদীর্ঘকাল ধরে কিস্তিবন্দিতে প্রাক্তন মালিকের প্রাপ্য মেটাতে হবে, সুতরাং দীর্ঘকালের মধ্যে ওই জনসাধারণ বিশেষ সুবিধা ভোগ করতে পারবে না। এদিক দিয়ে বিচার করে তাঁরা ক্ষতিপূরণের

ব্যবস্থা মানতে পারবেন না। আবার নির্বিচারে সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হ'লে সমাজের একটা বৃহৎ অংশ হয়তো দারুণ অর্থকৃচ্ছ্রতার মধ্যে পড়বে। সামাজিক ভারসাম্য হয়তো তার ফলে নষ্ট হ'য়ে যাবে। সম্পত্তির মালিক মাত্রেই সুস্থ, সমর্থ যুবক নয়, তাদের মধ্যে অনেকে রোগী, অনেকে বৃদ্ধ, পঙ্গু, অনেক বিধবা, অনেক অপ্রাপ্তবয়স্ক রয়েছে। বিনা ক্ষতিপূরণে সব কিছু জবর দখল করতে গেলে তাঁদের অবস্থা কী হবে? তাছাড়া সম্পত্তির মালিক মাত্রেই ধনী নয়, তাদের মধ্যে অনেক নিম্নমধ্যবিত্ত অথবা দরিদ্রও রয়েছে। ক্ষতিপূরণ বা মূল্য–বিনিময়ে সম্পত্তি গ্রহণের নীতি স্বীকার না করলেও যাঁরা মানুষকে ভালবেসেছেন তাঁরা এই রাষ্ট্রীকরণের ফলে যাঁরা এই অসুবিধায় পড়বেন, তাঁদের কথাও দরদ দিয়ে ভেবে দেখবেন ও তদনুযায়ী কাজ করবেন। যারা বৃদ্ধ, পঙ্গু, অপ্রাপ্তবয়স্ক বা দুঃস্থা নারী এরূপ ক্ষেত্রে তাদের জন্যে কোন মাসোহারা বা থোক টাকা দেবার ব্যবস্থা করতে হবে বৈকি! যারা সুস্থ, সবল, যুবক ও প্রৌঢ় তাদেরও অন্য কোন বিকল্প জীবিকা না থাকলে শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমের বিনিময়ে অর্থোপার্জনের সুবিধা দিতে হবে ও এই সুযোগ দেবার সময়ে তাদের যোগ্যতা ও প্রয়োজনের কথাও একটু সহানুভূতির সঙ্গেই ভেবে দেখতে হবে। যে একটি বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানের

মালিক তথা কর্ণধার ছিল তার যদি সমস্ত পুঁজিই ওই প্রতিষ্ঠানেতেই নিয়োজিত হ'য়ে থেকে থাকে, সেক্ষেত্রে তার সম্পত্তি দখল করার সময়ে তাকে তার যোগ্যতা বুঝে ওই জাতীয় কোন কাজে নিয়োগ করতে হবে। হাতে ক্ষমতা পেয়ে ব্যষ্টি বা দলৰিশেষ আক্রোশের বশীভূত হ'য়ে যদি ওই ব্যষ্টিকে ষ্টেশনের কুলির বা পাথর–ভাঙ্গার কাজে লাগিয়ে দেয় সেক্ষেত্রে হয়তো অবস্থার চাপে পড়ে সে তা' করতে ৰাধ্য হৰে, হয়তো ক্ষমতার মোহে পড়ে কিছু সংখ্যক লোক তা' দেখে আরামও পাৰে, কিন্তু অনভ্যস্ত জীবিকার চাপে আর অবমাননার গ্লানিতে অল্পকালের মধ্যেই সেই মানুষটি শেষ হয়ে যাবে। এককালে যে মানুষকে শোষণ করে প্রতিপদে মানুষের ন্যায়সঙ্গত অধিকারকে দাৰিয়ে রাখবার চেষ্টা করে এসেছিল সেও মানুষ–একথা মুহূর্তের জন্যেও ভুলে থাকলে চলবে না। সবাইকে নিয়েই আমাদের ঘর করতে হবে। সবাইকেই শুধরে নিয়ে মানিয়ে নিয়ে একসঙ্গে কল্যাণের পথে এগিয়ে চলতে হবে। অতীতে কে কী করেছে সেই কথা মনে রেখে আক্রোশের ভাব নিয়ে চললে পরে বুঝতে হৰে আমরা আত্মহত্যার পথই বেছে নিয়েছি।

সমাজের উন্নতি বা প্রগতি ব্যষ্টিবিশেষের একক প্রচেষ্টায় হয় না বা হ'তে পারে না। কেউ দেয় মস্তিষ্ক, কেউ দেয়

হাত, কেউ পা। তাই সুবিচার করতে গেলে পা–কে হীন আর মাথা–ই সর্বস্ব অথবা মাথাটার কোন দাম নেই–মস্তিষ্ক বা বুদ্ধিজীবী মাত্রেই শোষক আর যারা গায়ে–গতরে খেটে চলেছে তারাই সব কিছু–এই দুই প্রকার চিন্তাধারাই সমান বিপজ্জনক। আসল কথাটা হচ্ছে কে নিজের সামর্থ্য কতখানি কাজে লাগিয়েছে সেইটাই বিচার করে দেখা। সমুদ্র বাঁধতে হনুমানের পর্বত ব'য়ে আনা আর কাঠবেড়ালীর নুড়ি বয়ে' আনা তত্ত্বগত বিচারে তুল্যমূল্য। কারও আন্তরিকতাতেই আমরা সন্দেহ রাখতে পারি না, অবজ্ঞাও করতে পারি না। নিজের সম্পদ যে যথাযথ ভাবে খাটায়নি, যে নিজের সম্পদ ষোল আনা খাটিয়েছে, [সে] তার চাইতে কিছুটা বেশী কাজও করে থাকে তবে তাকে কোন ৰাড়তি তারিফ করতে পারব না।

দিন এগিয়ে চলে। কাল এগিয়ে চলে। মানুষের ঐশ্বর্য, সাম্রাজ্য, বীর্য সেই কাল–পটে ছোট বা ৰড় খানিকটা ঝিলিক মেরে চলে যায়। এতে সমাজের কাঠবিড়ালীরাই ঠিকমত স্বীকৃতি পায় না, তাদের নুড়ি পর্বতের আড়ালেই ঢাকা পড়ে থাকে। নেতৃস্থানীয় মানুষ অনেক বড় বড় কাজ করে যান–ইতিহাসের পাতায় সেগুলো জ্বলজ্বলে অক্ষরে লেখা থাকে, ভবিষ্যতের ছাত্রেরা তা' নিয়ে গবেষণা করে। কিন্তু এই রথী–মহারথীদের স্বর্ণকেতন যে প্রাকৃত মানবগোষ্ঠী বয়ে নিয়ে

গেছল তারা বিস্মৃতির অন্তরালে তলিয়ে যায়। হয়তো তাদের কথা ভাবতে গেলে ভাবার আর শেষ থাকে না। সবাইকার মৃত্যুর সংবাদ কি খবরের কাগজে ছাপানো চলে! সবাইকার জন্যে কি শোকসভা বা স্মৃতিস্তম্ভের ব্যবস্থা করা সম্ভব! আমি বলি এ সম্ভব-অসম্ভব নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাৰার দরকার নেই। আমরা যার মধ্যে কর্মযোগের যতটুকু বিকাশ দেখি-সে মানুষ বিদ্যা-বুদ্ধি পদমর্যাদায় যেমনই হোক না কেন মুক্তকণ্ঠে তার কথা স্বীকার করতে হবে। বুকের রক্ত ঢেলে যারা মানুষ- সমাজকে প্রাণশক্তি যুগিয়ে যায় তারা আমাদের স্বীকৃতির মুখ চেয়ে কাজ করে না। কিন্তু আমরা তাদের কর্মসাধনাকে অস্বীকার করে সামাজিক অবিচার কেন করৰ?

"মেহন্নতি মানুষেরই দুনিয়া"- একথাটুকুকে চরম সত্য বলে মেনে নিলে ৰৌদ্ধিক পরিশ্রমকে অস্বীকার করতে হয় বা মনে মনে তার মূল্য বুঝেও তাকে কোণঠাসা করার চেষ্টা করা হয়। দারিদ্র্য এই তথাকথিত মেহন্নতি মানুষেও আছে আর তথাকথিত বুদ্ধিজীবী মানুষেও আছে, আমরা এ দু'য়ের কারও সমস্যাকেই প্রধান করে দেখৰ না। আমরা মানুষের সমস্যা সমাধান করৰার সময় তার আর্থিক ও মানসিক অভাবগুলো বুঝে মানুষের মন নিয়ে, মানুষের ভালবাসা নিয়ে তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে যাৰ। কোন দলবিশেষের মুখ

চেয়ে এই দুনিয়াটার গায়ে "শ্রেণীবিশেষের সম্পত্তি' বলে ছাপ মেরে দোৰ না।

মানুষকে এগিয়ে যেতে হৰে মনীষায়, শিল্পে, কর্মোদ্যোগে আর এই বিকাশগুলোর প্রত্যেকটিই হবে সর্বশ্রেণীর মানুষের আন্তরিকতাপূর্ণ সহযোগিতায়। এখানে পণ্ডিত–মূর্খ বা স্ত্রী–পুরুষের ভেদ তো থাকৰেই না– মনুষ্যসৃষ্ট সামাজিক কোন প্রকার ভেদকেই চরম ব্যবস্থা বা ঐশ্বরীয় ব্যবস্থা বলে মেনে নেওয়া চলবে না। ভেদবুদ্ধি স্বীকার করতে গেলে একশ্রেণীর মধ্যে মহাম্মন্যতা আর অপর শ্রেণীর মধ্যে হীনম্মন্যতার সংঘর্ষের ফলে সমাজের কাঠামো ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। মানুষের হীনম্মন্যতা তার সহজভাবে এগিয়ে চলার পথে ৰাধা সৃষ্টি করে আর মহাম্মন্যতা মানুষকে বোঝাতে চায় যে, আর যে সকল মানুষ তার সমাজে রয়েছে তারা ঠিক তার সমাজের নয়। তারা অনেক হীন, অনেক নীচে, অনেক মূর্খ, অনেক কুসংস্কারাচ্ছন্ন। তাদের সঙ্গে কারৰার করতে গেলে কী "পহিলে লাথ্ পিছাড়ি ৰাত” নীতি নিয়ে চলা উচিত? এই মনোভাবের ফলে সুষ্ঠু সমাজ জীবন তো গড়ে ওঠেই না, বরং প্রতিটি মানুষের সঙ্গে প্রতিটি মানুষের মধ্যেকার স্বাভাবিক প্রীতির ডোর বেশী ব্যবধান সৃষ্টি হওয়ার ফলে ছিঁড়ে যায়। এই মহামন্যদের মধ্যে যারা কিছুটা বুদ্ধিমান

তারা তাদের আচরণে খানিকটা দূর পর্যন্ত নিজেদের মনোভাবকে ঢেকে রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু তথাকথিত হীন–নীচ মানুষগুলোর মুখ থেকে যদি দু' একটা জোরালো সত্যকথা ছিটকে এসে তার অতিস্ফীত মানসে ধাক্কা দেয় তখনই সে নিজের মূর্তি ধারণ করে। যাকে হীন বা ছোট ভেবে এসেছে তার কথাগুলো মেনে নেওয়া তার পক্ষে একটা অসম্ভব জিনিস হয়ে দাঁড়ায়। নিজের পক্ষে যুক্তির সমর্থন না পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই তথাকথিত হীন মানুষটার উদ্দেশ্যে সে আক্রমণাত্মক ভাষা ব্যবহার করতে আরম্ভ করে। দরিদ্রকে তার দারিদ্র্যের জন্যে গঞ্জনা, কুৎসিতকে তার রূপের ব্যাখ্যা করে, তথাকথিত ছোটজাতকে তার জাতের কথা বলে বা অল্পবয়স্ককে তার অপ্রবীণতার কথা শুণিয়ে সে তার হারানো গৌরব ফিরে পাবার চেষ্টা করে। এ মনোভাব যে ৰৌদ্ধিক দেউলিয়াপনা ছাড়া আর কিছুই নয় সে কথা বোঝাবার জন্যে কালি–কাগজ খরচ করৰার দরকার হয় না।

সমাজের প্রবীণদের মধ্যে কতকগুলো বড়রকমের কুসংস্কার জমাট বেঁধে থাকে যা সরিয়ে দেওয়া সামাজিক সুবিচার রক্ষার পক্ষে অত্যাবশ্যক হ'লেও প্রবীণেরা এ তথ্য বুঝেও বুঝতে চান না। যৌক্তিক পরাভৰকে অস্বীকার করার উদ্দেশ্যে তাঁরা নিজেদের দীর্ঘজীবনের অভিজ্ঞতার দোহাই পাড়তে

থাকেন। বাস্তব-জগতে অভিজ্ঞতার মূল্য কেউ অস্বীকার করে না কিন্তু মনে রাখা দরকার যে সব সময়েই যে অতীতের পুনরাবৃত্তি হবে অর্থাৎ অতীতের অভিজ্ঞতা যে সব সময়েই কাজ দেবে এমন কোন কথা নেই। অভিজ্ঞতা ঘটনা-পারম্পর্য নির্ধারণে কতকটা সাহায্য করে বটে, কিন্তু দূরদৃষ্টি না থাকলে সে অভিজ্ঞতা কোন কাজই দেয় না। পট পরিবর্তনের ফলে দূর ভবিষ্যতে যে ঘটনা সংঘাত দেখা দিতে পারে তার সঙ্গে অতীত অভিজ্ঞতার সঙ্গতি রেখে মানুষকে ভবিষ্যতের নীতি নির্ধারণ করতে হয়। দূর অনাগতে পট-পরিবর্তনটি কীভাবে হতে পারে সে জ্ঞান প্রবীণদের চাইতে নবীনদের বেশী থাকাই স্বাভাবিক। কারণ সামনের দিকে চলাটাই তার ধর্ম। তাই বেশী দূরের জিনিস তাকেই বেশী করে দেখতে হয়। আমি এখানে কৈশোর বা প্রথম যৌবনের ভাব-প্রবণতার কথা বলছি না। আমি বলছি বর্তমানের "প্রারব্ধ" (momentum)-টুকু বুঝে নিয়ে ভবিষ্যতে কতখানি সামনে ঝুঁকে পড়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে, তারই কথা। কৈশোর আর প্রথম যৌবনের ভাবপ্রবণতাটা ঝোঁক মাত্র। এ ঝোঁক নিজে ভবিষ্যতের নীতি নির্ধারণে সাহায্য করে না কিন্তু ঝোঁক যার রয়েছে ঝোঁকের স্বরুপ বোঝবার ক্ষমতাটা তারই যে সব চাইতে বেশী আর তদনুযায়ী নীতি-নির্ধারণে তারই অধিকার যে সব চাইতে বেশী সে কথা অস্বীকার করতে

পারি না। যারা জড়স্থাণুবৎ পড়ে রয়েছে ঝোঁকের উন্মাদনা তারা কতটুকু বুঝৰে? তাই সমাজের যাত্রাপথে যেখানে প্রতিনিয়তই সামনে চলার নীতি-নির্ধারণ করে নিতে হয় সেখানে কেবল অভিজ্ঞতাটুকুকেই পুঁজি করলে চলবে না। চলার দ্রুতি নির্ধারিত হবে প্রবীণের অতীত অভিজ্ঞতা আর তরুণের গঠনধর্মী হৃদয়াবেগ-এ দুয়ের মণিকাঞ্চন সংযোগে। মণি বা কাঞ্চন কাউকে দূরে সরিয়ে রাখব না। প্রত্যেককেই তার প্রাপ্য মর্যাদা দিয়ে, প্রত্যেকের প্রতি সুৰিচার করে মানুষ জাতকে স্বমর্যাদায় মহিমান্বিত করে তুলতে হবে।

সমাজের যাঁরা নেতৃস্থানীয় তাঁদের মধ্যে যেখানে অন্যকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবার মনোভাব পেয়ে বসে সেখানে একটা বড় রকমের বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়। এই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবার মনোভাবটা যে সব সময়ে মহাত্মন্যতা-প্রসূত তা' নয়, অনেক সময় নিজের অজ্ঞতা ঢেকে রাখবার জন্যেও তাঁরা অন্যকে তাচ্ছিল্য করে থাকেন। মহাত্মন্যতা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর আর এই জাতীয় অজ্ঞতা ঢেকে রাখবার উদ্দেশ্যে অন্যকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা আরও ঢের বেশী ক্ষতিকর। বিদ্যা-বুদ্ধি, রূপ-গুণ, পদমর্যাদা, বয়স যার যেমনই হোক না কেন একথা প্রতিটি মানুষেরই মনে রাখতে হবে যে, যাকে সে নিজের চাইতে হীন মনে করে এমন অনেক জিনিসই আছে যা

সে (যাকে তুচ্ছ মনে করা হয়) তার চাইতে বেশী জানে। একথা খানিক আগেও বলেছি, আবার বলছি তার কারণ, মানুষ-সমাজে যত প্রকারের অনর্থ ঘটে থাকে তার প্রায় শতকরা পঁচাত্তর ভাগই হয়ে থাকে মানুষের প্রতি মানুষের সুবিচারের অভাবে।

(মানুষের সমাজ, ১ম খণ্ড)

দ্বিতীয় খণ্ড

বিচার

"বিচার" শব্দটার ভাবগত অর্থ হল–সত্য নির্ধারণের জন্যে বিশেষ প্রকারের মনঃসঞ্চালন। যদিও মানুষের আপেক্ষিকতাকে নিয়েই কারবার, তবুও এই আপেক্ষিক জগতে যা' সত্য বলে প্রতীত হয়, সমাজদেহে তাকেই ৰলৰ 'বিচার'। বিচারের সব চাইতে বড় লাভ এই যে এর সম্যক প্রয়োগের ফলে সমাজদেহে শুভ–অশুভ, শিব–অশিবের মধ্যে একটা অশেষ যুধ্যমান ভাব স্থায়ীভাবে থেকে যায়–যার ফলে মানব–মনীষা শিবত্বের পথ বেছে নিতে অধিকতর সুযোগ পেয়ে যায়। অনেকেই বলেন, "মানুষের বুদ্ধি কতটুকু যে মানুষ মানুষের বিচার করবে, মানুষের বিচার করবার কোন অধিকার মানুষের নেই।” কথাটা আমি মোটেই অস্বীকার করছি না, তবু ৰলৰ আপেক্ষিক জগতে মানুষ যে পরিমাণ ৰৌদ্ধিক পুঁজি নিয়ে এসেছে তার উচিত–ব্যবহার না করাটাও কি অন্যায় নয়? বিচার হয়তো সব সময় ঠিক হয় না, বিচারের মাপকাঠি নির্ধারণেও অনেক সময় ত্রুটি থেকে যায় অথবা বিচারকের চিন্তাধারা বা মনোবৃত্তি হয়তো অনেক সময়ে তাকে আর পাঁচজনের কাছে আদর্শ মানুষরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করে না। তবু বা তাই বলে কি বিচার ব্যবস্থাকেও রহিত করে দিতে হবে? না,–নিশ্চয়ই না। মনীষার প্রগতিতে

কোন কিছুরই মান বা ষ্টান্ডার্ড কোনকালেই শাশ্বত বলে গৃহীত হয় নি বা হবে না। তবু সব কিছুতেই 'ইম্পারফেকশন' (imperfection) থেকে 'পারফেকশন' (perfection)–এ পৌঁছুবার একটা প্রচেষ্টা রাখতেই হবে, আর এই প্রচেষ্টাই পরোক্ষভাবে মানুষজাতির সর্বাত্মক কল্যাণের জয়যাত্রার পথ সুগম করে দেবে।

কোন কিছুর সম্বন্ধে কোন একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছুবার সঙ্গে সঙ্গে বিচারের কার্য শেষ হয়ে যায়। তাই বিচার নিজে কোন একটা স্বয়ং–সম্পূর্ণ জিনিস নয়। বিচারের সিদ্ধান্তকে কার্যে রূপ দেওয়া হ'লে তবেই একটা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়, অর্থাৎ গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যষ্টি বা সমষ্টির সম্বন্ধে শাস্তিমূলক–আরও ঠিক ভাবে বলতে গেলে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হলে তবেই সমাজজীবনে বিচারের সার্থকতাটুকু অনুভূত হয়। বিচারের মাপকাঠিটা যখন কোন অবস্থাতেই সন্দেহাতীত ভাবে সত্য নয় তখন তার ওপর ভিত্তি করে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাউকে শাস্তি দিতে হ'লে খুব বেশী রকমের সতর্কতার যে প্রয়োজন একথা কেউই অস্বীকার করতে পারবে না। ব্যষ্টিগতভাবে, আমি মনে করি যে বিচারের পদ্ধতি যতই ভাল হোক না কেন, ভুল–ত্রুটি যখন কিছুটা থেকে

যাৰেই যাৰে তখন এটাই বলতে হয় যে মানুষ মানুষের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিক এটা প্রকৃতির অভিপ্রেত নয়।' খুব নিবিষ্টভাবে ভাবলে পরে দেখতে পাই যে কাউকেই শাস্তি দেবার উদ্দেশ্য নিয়ে যখনই কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় সে সময় শাস্তিদাতার মনে বিচারকের ভাবের চাইতে প্রতিশোধ নেৰার ভাব অর্থাৎ একটা হিংসামূলক ভাবই জেগে ওঠে। তাই আমি বলি যে "শাস্তিমূলক ব্যবস্থা" কথাটাই মানুষের সমাজ জীবন থেকে রহিত হয়ে যাওয়া উচিত। কারো বিরুদ্ধে কেউ (তিনি বিচারকই হোন অথবা সাধারণ মানুষই হোন) যখন কোন ব্যবস্থা নেবে তখন সেটা শাস্তিমূলক না হয়ে সংশোধনমূলক হওয়া উচিত। সংশাধনমূলক ব্যবস্থাতে অপরাধী–তা' সে যে রকমের হীন অপরাধেই লিপ্ত হোক না কেন, কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ করার মত কোন কিছু খুঁজে পাৰে না। বিচারের ত্রুটি থেকে গেলেও সেক্ষেত্রেও তার কোন ক্ষতি হবে না, যদি সে সত্যি করে অপরাধী হয় সেক্ষেত্রেও সংশোধনমূলক ব্যবস্থায় সে যেমন উপকৃত হৰে, সে যদি অপরাধী না হয় তাহলেও সংশোধনমূলক ব্যবস্থায় তার উপকার ছাড়া অপকার হবে না। আমার আসল বক্তব্য এই যে, বিচার পদ্ধতির ত্রুটির জন্যে কোন নিরীহ লোক যেন ৰলৰার বা ভাববার সুযোগ

না পায় যে "অর্থাভাবে আমি ভাল উকিল রাখতে পারি নি বলে বিনাদোষে আমার শাস্তি হয়েছে।" প্রকৃত অপরাধী যদি আইন-কানুনের জাল ছিঁড়ে ৰাইরে পালিয়েও যায় অথবা পুলিশের অযোগ্যতার দরুণ ধরা না পড়ে, তাতে সমাজের ক্ষতি হৰে সত্যি, কিন্তু তার চাইতেও বড় ক্ষতি হবে যদি বিচার-পদ্ধতির দোষে নিরীহ ব্যষ্টিকে শাস্তি ভোগ করতে হয়। সামাজিক অথবা মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে সবার বিরুদ্ধে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা নেবার অধিকার সবারই আছে। এটা মানুষ-মাত্রেরই একটা জন্মগত অধিকারের কথা। যাকেই কোন না কোন কারণে মানুষের সংস্পর্শে আসতে হয় তারই ত্রুটি শোধরাবার অধিকার সমাজের অন্যান্য মানুষের যে আছে এ কথা কোন তার্কিকই অস্বীকার করতে পারবেন না। সমাজের সুস্থতা রক্ষার কার্যে এ অধিকারের স্বীকৃতি অপরিহার্য। তাহলে দেখতে পাচ্ছি বিচারের অনুপূরক হিসাবে যেটা দরকার সেটা হচ্ছে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা। এতে চণ্ডনীতি, দণ্ডনীতি, জনসাধারণের ওপর সরকারের দোর্দণ্ড প্রতাপ বা দাপট দেখাবার কোন অবকাশ নেই। শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে সংশোধনমূলক ব্যবস্থার মূলগত পার্থক্যটাও এইখানেই। শাসন-ব্যবস্থায় সামাজিক বা রাষ্ট্রিক কাঠামোটাকে মজবুত রাখবার জন্যে যে বিশেষ একটা কঠোরতার প্রয়োজন বিচারের ক্ষেত্রে সে কঠোরতার প্রয়োজন তো নেই-ই, বরং

এর পেছনে রয়েছে একটা কল্যাণমূলক কোমল মানবিক চিন্তাধারার মধুর স্পর্শ। শাসন- ব্যবস্থার সঙ্গে তাই বিচার-ব্যবস্থা অনেকক্ষেত্রে একমত হয়ে চলতে পারে না। শাসনের কঠোরতাকে অনেক সময় বিচারক তার মানবিক যুক্তি দিয়ে নস্যাৎ করে দিতে পারেন ও দেবেনও, ও রাষ্ট্রব্যবস্থার কাছে সেক্ষেত্রে শাসন কর্তৃপক্ষের রায়ের চাইতে বিচারকের রায়ই শ্রেষ্ঠ বলে গৃহীত হবে। যদি তা' না হয় বা যেখানে তা' না হয় সেক্ষেত্রে বুঝতে হবে যে রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে ব্যষ্টি বা দলবিশেষের স্বেচ্ছাচার চলছে।

মানুষ তার বৌদ্ধিক সামর্থ্যটুকু দিয়েই মানুষের দোষগুণ বিচার করে- তার এই চেষ্টাকে অন্যায় বলে মনে করতে পারি না-অন্ততঃপক্ষে যতক্ষণ তা' কল্যাণমূলক আদর্শকে সামনে রেখে এগিয়ে চলেছে। তাই মানুষের বিচার মানুষই করবে, কিন্তু বিচার ব্যবস্থার যে শেষাংশ অর্থাৎ শাস্তি-ব্যবস্থা সেটা কতখানি মানুষের অধিকারভুক্ত জিনিস তা' নিয়ে নীতিবাদীদের মধ্যে মতভেদ ছিল ও আছে। কারও যদি বিচার করা হয় ও তদনুযায়ী যদি কোন ব্যবস্থা না নেওয়া হয় সেক্ষেত্রে যার বিচার করা হ'ল তাকে বিচারগত দোষত্রুটির বোঝা বইতে হয় না কিন্তু যেক্ষেত্রে বিচারের ত্রুটি থেকে গেলে নিরীহ মানুষকে কষ্টভোগ করতে হয়,

অর্থাৎ বিচার অনুযায়ী কাউকে শাস্তি দিতে যাওয়ার অর্থ বেশ কিছুটা ঝুঁকি (risk) নেওয়া। কোন বিচারকই জোর করে বলতে পারবেন না যে অমুক ব্যক্তি সত্যসত্যই অপরাধী ও অমুক ব্যক্তি সত্যসত্যই নিরপরাধ। তাঁকে রায় দিতে হয় সাক্ষ্য-প্রমাণাদির ভিত্তিতে, উকিলের সওয়াল-জবাবের ভিত্তিতে। কিন্তু এই সাক্ষ্য-প্রমাণাদির সত্যতা যাচাই করার কোন পন্থাই থাকে না। অভিজ্ঞ উকিলের বাক্যবিন্যাসের টানাজালে অনেক রুই-কাৎলা বিচারককেও অনেক সময় নোবুদ হয়ে শেষ পর্যন্ত উকিলের জয়-জয়কার ঘোষণা করতে হয়। আবার এই অভিজ্ঞ উকিল যদি অবসরপ্রাপ্ত বিচারক হন তা'হলে তো কথাই নেই। এককালে যে বিচারক তাঁরই অধীনে কাজ করেছেন পরবর্তীকালে তাঁর তথ্য প্রমাণাদি তথা যুক্তিকে অস্বীকার করতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাধে অর্থাৎ এই শ্রেণীর উকিল বিচারকের ওপর ব্যষ্টিগত প্রভাবও বিস্তার করেন। অবশ্য অনেক প্রাগ্রসর দেশেই আজকাল এই সকল অবসরপ্রাপ্ত বিচারকের আইন ব্যবসায় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এ ব্যবস্থাটি খুবই ভাল ও এতে জনসাধারণের সুবিচার পাওয়ার সম্ভাবনা কিছুটা বেড়েছে। তবু এ ব্যবস্থাতেও সুবিচার যে পাওয়া যাবেই এমন কথা হলপ করে বলা যাবে না। কারণ সেই গোড়াকার গলদগুলো অর্থাৎ সেই সাক্ষ্য-প্রমাণাদির সত্যতা যাচাই করা, উকিলের বাগ্জালের

কুয়াসা ভেদ করা খুৱ কম বিচারকের পক্ষেই বাস্তবক্ষেত্রে সম্ভব হ'তে পারে।

সাক্ষ্য-প্রমাণের সত্যতা নির্ধারণ করতে গেলে বিচারককে ব্যাপকভাবেই গুপ্তচর বিভাগের সাহায্য নিতে হবে, আর এজন্যে গুপ্তচর বিভাগের কাজের চাপ বেড়ে যাওয়ায় গুপ্তচরের সংখ্যাও হয়তো ৰাড়াতে হবে। কিন্তু গুপ্তচরের সংখ্যা ৰাড়ালেই সমস্যার সমাধান হৰে এমন আশাও ঠিক করতে পারছি না। কারণ যে সরষে দিয়ে ভূত ছাড়ানো হয় সেই সরষের মধ্যেই যদি ভূত ঢুকে থাকে তবে ভূত ছাড়ানো অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় অর্থাৎ উৎকোচের মোহে পড়ে পুলিশ-গোয়েন্দারা আসামী বা ফরিয়াদী পক্ষকে নাজেহাল করে দিতে পারে। যে কোন রাষ্ট্রের পক্ষে পুলিশ-গোয়েন্দার প্রয়োজন যথেষ্ট; তাই খুব বেশী যোগ্যতা সম্পন্ন লোক খুব বেশী সংখ্যায় সংগ্রহ করা যে কোন গবর্ণমেন্টের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। তাহলে দেখছি যে, যে সাক্ষ্য-প্রমাণাদির সত্যতা পুলিশ-গোয়েন্দার দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে তাদের এই নির্ধারণের সত্যতাও বিচারককে যাচাই করে নিতে হৰে। অবশ্য সর্বক্ষেত্রে বিচারক নিজে না করে জুরীদের দ্বারাও কিছুটা করিয়ে নিতে পারেন। এতে করে জুরীপ্রথার সার্থকতাটাও বুঝতে পারা যায়। ব্যষ্টিবিশেষের বিদ্যা বা

পদমর্যাদার দিকে নজর না রেখে কেবলমাত্র সাধুতার কথা বিবেচনা করে জুরী নির্বাচন করা দরকার।

বিচারের চরম দায়িত্ব বিচারকের ওপর থাকা বাঞ্ছনীয়, জুরীদের ওপর নয়, ও এই কারণে যে সকল ব্যক্তির চরিত্রগত দৃঢ়তা সন্দেহাতীত কেবল মাত্র তাঁদের মধ্য থেকে বিশেষভাবে বাছাই করে বিচারকের পদগুলি পূর্ণ করা প্রয়োজন। পুলিশ বা গোয়েন্দা বিভাগের কর্মচারীদের সংখ্যার চাইতে স্বাভাবিক নিয়মে বিচারকদের সংখ্যা কম ও বেতনও বেশী। তাই যথোপযুক্ত ভাবে চেষ্টা করলে প্রয়োজনমত যোগ্যতাসম্পন্ন বিচারক সংগ্রহ করা কোন দেশের পক্ষেই অসম্ভব নয়। জুরী নির্বাচনের ভার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলির ওপরেই ছেড়ে দেওয়া বাঞ্ছনীয় ও ব্যবসায়ী, দালাল ও রাজনৈতিক নেতা বা কর্মীদের মধ্য থেকে কাউকে জুরী হওয়ার সুযোগ না দেওয়াই ভাল। বিচারক যে সর্বক্ষেত্রে জুরীর সঙ্গে একমত হবেন এমন কোন কথা থাকতে পারে না কারণ তাতে বিচারকের অধিকার সঙ্কুচিত হয়। তাছাড়া জুরীরা যতই সৎ বা ধার্মিক লোক হোন না কেন তাঁরা যে তীক্ষ্ণধী বিচারকও হবেন এমনটি আশা করা যায় না। তাছাড়া কোন ঘটনা সম্পর্কে সরেজমিনে তদন্ত করে বিচারক

ও জুরীরা পৃথক সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারেন আর সেক্ষেত্রে বিচারকের সিদ্ধান্তটাই যে বেশী মূল্যবান এমন অনুমান করা ভুল হবে না। কিন্তু এও তো হ'তে পারে যে বিচারক পক্ষপাতদোষদুষ্ট হয়ে পড়েছেন অথবা ব্যষ্টিগত আক্রোশ নিয়ে কাজ করছেন অথবা তিনি আসামীর অনুষ্ঠিত কুকর্মের সঙ্গে পরোক্ষভাবে লিপ্ত ছিলেন। এর প্রতিবিধান কোথায়?
তাই মনে হয় কোন মামলায় জুরীরা বিচারকের চরিত্রে যদি সন্দিগ্ধ হয়ে পড়েন বা বিচারকের রায়ে অসন্তুষ্ট হন সেক্ষেত্রে সেই রায়টি প্রকাশ্যভাবে ঘোষিত হৰার পূর্বেই সম্পূর্ণ ঘটনাটি ঊর্ধ্বতন বিচার কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত হওয়া দরকার।
ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষও যদি জুরীদের মতই সমর্থন করেন সেক্ষেত্রে প্রথমোক্ত নিম্নতন বিচারককে পূর্বপদে বহাল রাখা নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয় হবে না।

আমি মধ্যযুগীয় কাজীর বিচারকে ঠিক সমর্থন করছি না। তবে কাজীরা নিজেরা যেমন ব্যষ্টিগত দায়িত্বে ও যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়ে ছদ্মবেশে ঘটনাস্থলে গিয়ে সত্যানুসন্ধান করতেন অথবা কৌশল–প্রয়োগ করে আসামী বা ফরিয়াদীর মুখ থেকে সত্য কথা বার করে নেবার চেষ্টা করতেন বর্তমান কালের বিচারকেরও তেমনি করা দরকার। এতে তাঁদের দায়িত্বও ৰাড়ৰে। তাই তাঁদের সংখ্যা ও বেতন এ দুটোও ৰাড়াৰার হয়তো প্রয়োজন পড়বে। বিচারকেরা তাঁদের অভিজ্ঞতালব্ধ

প্রমাণের ভিত্তিতে যাতে রায় দিতে পারেন তার জন্যে তাঁদের অধিকারও আরও বাড়িয়ে দেবার দরকার হ'তে পারে।

তবু বলব সুবিচার-প্রাপ্তির আমরা যতই ব্যবস্থা করি না কেন, বিচার যে ষোল আনা ঠিক হবেই হবে এমন জিনিসটা কিছুতেই আশা করতে পারি না। জুরীরও ভুল হ'তে পারে, মিলিতভাবে তাঁদের উভয়েরও ভুল হ'তে পারে। ক্ষণিকের আবেগে বা উত্তেজনায় তাঁদের উভয় পক্ষই অবিচারকে প্রশ্রয় দিয়ে ফেলতে পারেন। তাই কোন অবস্থাতেই কোন বিচারের সিদ্ধান্ত চরমভাবে সুসিদ্ধান্ত বলা যেতে পারে না। আর ঠিক এই জন্যেই বাধ্য হয়ে বলতে হবে যে, যে সিদ্ধান্তের অভ্রান্তিতে সন্দেহ থেকে যাচ্ছে তার ওপর নির্ভর করে শাস্তি দেওয়া যেতে পারে না।

নীতিগত বিচারেও দেখতে পাই যে, সমাজের শুচিতা রক্ষার জন্যে মানুষ মানুষের সম্বন্ধে সংশোধনী-ব্যবস্থা নেবার অধিকারী, শাস্তি ব্যবস্থার নয়। যে বিধানে মানুষের অস্তিত্বের প্রতিটি স্পন্দন নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে মানুষকে শাস্তি দেবার অধিকার কেবলমাত্র সেই বিধানেরই আছে, অন্য কারুর নেই। তবু মানুষ যদি তার বিচারকে জোর গলায় ত্রুটিমুক্ত ঘোষণা করতে পারত বা তার শাস্তি-ব্যবস্থাকে অধিকারানুগ বলে

প্রমাণ করতে পারত তাহলেও হয়তো কথা ছিল; কিন্তু তাও তো মানুষ পারে না। তাই সমাজ–রক্ষার খাতিরে মানুষ মানুষের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা যদি নিতে চায় তবে সে ব্যবস্থাটা হবে সংশোধনমূলক, শাস্তিমূলক নয়। তার বিচার পদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ হলেও সংশোধনমূলক ব্যবস্থায় কারও কোন ক্ষতির সম্ভাবনাও নেই।

বিচার বা সংশোধনমূলক ব্যবস্থা সম্বন্ধে বেশী কিছু ভাবার আগে বিচারকের মান (standard) যাতে ঠিক থাকে সেদিকেও দৃষ্টি দেওয়া দরকার। যাকে মানুষের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা করে বিচারকের আসনে বসিয়েছি, তার বুদ্ধি–বিবেচনা তথা নৈতিক চরিত্র অমলিন কিনা সেদিকে বেশ কড়া নজর রাখতে হবে ও এজন্যে আবশ্যকতাবোধে মধ্যে মধ্যে বিচারকের স্বভাব–সম্বন্ধে জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থার কাছ থেকে রিপোর্ট চেয়ে পাঠাতে হবে। যে বিচারক নিজে মদ্যপ বা দুশ্চরিত্র বা কোন না কোন প্রকারে সমাজবিরোধী কার্যে লিপ্ত, অন্য কারো দোষ–বিচারের অধিকার তার কিছুতেই থাকতে পারে না। বিচারকের ষ্ট্যান্ডার্ডের (standard) ওপর খুব বেশী জোর দিচ্ছি তার কারণ বিচার এমন একটা জিনিস যেখানে আইনের ধারাগত ব্যবস্থার চাইতে স্থান–কাল–পাত্রগত বিবেচনাটাই প্রধান জিনিস। অপরাধ–সংহিতার

(criminal code) সঙ্গে নৈতিক সংহিতার (moral code) বিরোধ ঘটলে শেষ পর্যন্ত নৈতিক-সংহিতারই প্রতিষ্ঠার পথ করে দিতে হবে। বিচার - করতে বসে যেখানে কোন মানুষকেই অপরাধী ৰলে না ধরে তার দ্বারা আদৌ কোন অপরাধমূলক কাজ হয়েছে কিনা ও হয়ে থাকলে কী অবস্থায় সে সেই কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছিল অথবা ওই কার্য সে স্বগতভাবে করেছিল কি পরগতভাবে অন্যের যন্ত্রহিসেবে করেছিল সেইটাই যখন প্রাধান বিবেচ্য তখন এই গুরুতর বিবেচনার ভার সমাজ যার ওপর ছেড়ে দেবে তাকে নিশ্চয়ই সাধারণ মানুষের চাইতে উষ্চতর স্তরের মানুষ হ'তে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের মেধাবী ছাত্র হ'লেই যে সে ভাল বিচারক হৰে এমন কথা কিছুতেই মানতে রাজী নই। যারা ভাল উকিল বা ভাল ব্যারিষ্টার, তাদের আইনগত জ্ঞান বা বাকপটুতা অনস্বীকার্য, কিন্তু তারা যে ভাল ন্যায়-বিচারক এটার প্রমাণ তাতে মেলে না। ন্যায়বিচারের নজীর পাওয়া যায় ব্যষ্টিগত বা সমাজজীবনের ছোটৰড় অজস্র ঘটনার মধ্য দিয়ে। অপরাধীকে বিচার করতে বসে' কেন সে অপরাধ করেছিল সেই কথাটাই প্রথমে ভেবে দেখতে হবে। অপরাধীর দোষগুণ তথা স্বেচ্ছায় বা পরেচ্ছায় অনুষ্ঠিত কর্মগুলি যথাযথ ভাবে বিশ্লেষণ করে দেখতে গেলে

অপরাধীগণকে আমরা মোটামুটি নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করতে পারি।

১। স্বভাগত অপরাধ

জন্মগত কারণে কিছু সংখ্যক পুরুষ ও নারী একপ্রকার বিকৃত মানসিকতার অধিকারী হয়ে থাকে। এদের এই মানসিক বিকৃতির কারণ এদের দৈহিক গ্রন্থিসমূহের বিকৃতির মধ্যেই নিহিত থাকে। গ্রন্থিগত বিকৃতি অনুযায়ী এরা আবার মূলতঃ দুটি ভাগে বিভক্ত:-

(ক) একশ্রেণী যারা স্বভাবগতভাবে খুবই শান্ত, কিন্তু সত্য ৰলা বা পরোপকার করা এদের স্বভাব ধর্ম বিরোধী। সত্যের অপলাপ ও পরের ক্ষতি করায় এরা একটা পৈশাচিক রকমের আনন্দ পায়। সাধারণতঃ লৌকিক জগতে এরা কতকটা জড়বুদ্ধি। ভাল কথাই হোক, মন্দ কথাই হোক কোন কিছুই গ্রহণ করা এদের সামর্থ্যের বাইরে। এরা এদের অল্পবুদ্ধিতে যতটা বোঝে সেই হিসেবেই কাজ করে যায়। সাধারণতঃ এরা একশ্রেণীর ঊনমানস হলেও স্বভাবগত শুচিতার জন্যে ঊনমানসেরা অবশিষ্ট মানুষদের কাছ থেকে যে কৃপা বা অনুকম্পা পেয়ে থাকে-এরা তার থেকে বঞ্চিত

হয়। এরা হাঁটতে শেখে দেরীতে, কথা বলতে শেখে দেরীতে, সোজা জিনিসও বুঝতে বেশ সময় নেয়, বেশী বয়স অবধি মুখ থেকে লালা পড়ে। অভিভাবক ও শিক্ষকের আন্তরিক চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও লেখাপড়া শেখা এদের দ্বারা হয় না। প্রাপ্তবয়স্ক হবার পূর্বেই এরা সমাজজীবনে এদের বৃত্তির স্ফুরণ ঘটাতে থাকে। এরা সাধারণতঃ ছিঁচকে চোর হয়, ডাকাত হয় না; দুশ্চরিত্র হয় কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে সমাজবিরোধী কাজে লিপ্ত হ'তে সাহস করে না। এরা স্বেচ্ছায় ও পরেচ্ছায় উভয় ভাবেই পাপকার্যে লিপ্ত হয়ে থাকে।

(খ) দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্ম-অপরাধী আরও ভয়ঙ্কর। এরা কারণে-অকারণে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই ক্রুরতার পরিচয় দিতেই যেন ভালবাসে। কাটাকাটি- খুনোখুনি করা এদের পক্ষে স্বাভাবিক কাজ। চোরের বা ডাকাতের দলের নরহত্যাও অন্যান্য বিভীষিকাপূর্ণ কাজগুলোর ভার এরাই নিয়ে থাকে। সাধারণ পকেটমার, ছিঁচকে বা সিঁদেল চোরের কাজগুলো এরা করতে চায়' না। সেগুলোকে এরা খুব ছোট কাজ, অকুলীন চোরের কাজ বলে মনে করে। অপরাধী-সমাজে এরা সাধারণতঃ খানদানী অপরাধী বলেই গণ্য হয়। এদের চিন্তাধারা বা চালচলনের দ্বারা মনে হয় এরা যেন অপরাধ-অনুষ্ঠানের জন্যেই পৃথিবীতে এসেছিল। দয়ামায়া বা বিবেক-

বুদ্ধি-এগুলো এদের কাছে দুর্বলতা ছাড়া আর কিছুই নয়। আসলে এগুলোকে এরা বুঝতেই পারে না। জগতের অনেকগুলো দিকেই এদের বুদ্ধি একেবারে ভোঁতা হ'লেও এরা বোকা নয়। নিজেদের স্বভাবানুগ অপরাধ অনুষ্ঠানের সময় এরা বেশ বুদ্ধিমত্তার পরিচয়ই দিয়ে থাকে। মানুষের অস্থি-সংস্থানবিদ্যায়, কিছুটা মনস্তত্ত্বে আর পুলিশ ও জনসাধারণের কাছে মনস্তাত্ত্বিক অভিনয়ে রীতিমত দক্ষতার পরিচয় দিয়ে থাকে। ভাল পরিবেশে জন্মালেও এই শ্রেণীর জন্ম-অপরাধীরা শেষ পর্যন্ত অপরাধ অনুষ্ঠানের পথই বেছে নেয় ও এই স্বভাবযুক্ত নারীরা সৎপাত্রে বিবাহিতা হবার পরেও সৎ জীবন যাপন করতে সক্ষম হয় না। এরা স্বেচ্ছায় পতিতা-বৃত্তি বেছে নেয়।

জন্ম-অপরাধীর স্বভাব ও জীবনধারা যেমন বিচিত্র রকমের তেমনই এদের অপরাধেও অজস্র রকমের প্রকারভেদ রয়েছে। কেউ বা সাধুতার অভিনয় করে গোপনে চুরি-ডাকাতি করে, কেউ বা জালিয়াতি বা ডাকাতি করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে দরিদ্রের মধ্যে দান-খয়রাৎ করে দেয়। কেউ বা চোরের দালাল হিসেবে কাজ করে যেতে ভালবাসে। এমন জন্ম-অপরাধীও আছে যারা কেবল সুখ পাৰার জন্যেই অপরাধ অনুষ্ঠান করে- ব্যষ্টিগতভাবে তারা হয়তো

অর্থোপার্জনের কোন সুযোগই পায় না অথবা সুযোগ পেলেও সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করে না। জন্ম–অপরাধীদের স্বভাব, • জীবনযাত্রা প্রণালী তথা বিশেষ বিশেষ ধরণের অপরাধের প্রতি আসক্তি– এগুলো কোনটাই খাপছাড়া ভাবে হয় না ও এগুলো বেশ একটা ছককাটা পথ ধরে চলে। মনস্তাত্ত্বিকেরা এ নিয়ে গবেষণা করে অনেক কিছুই জেনেছেন, অনেক কিছু জানার চেষ্টাও করেছেন। সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের, বিশেষ করে পুলিশ বিভাগের সক্রিয়–সহযোগিতা পেলে অপরাধীর মনস্তত্ত্ব বিচারে এঁরা আরও সাফল্যজনক ভাবে এগিয়ে যেতে পারবেন। অপরাধীর মনোবিজ্ঞান বিশ্লেষণ করা আমার এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়। তবে এ কথাটা ঠিক যে এই শ্রেণীর জন্ম–অপরাধীরা সমাজের সব চাইতে বড় বোঝা, সব চাইতে বড় দায়। এই অপরাধীরা মানুষের শরীর নিয়ে পৃথিবীতে আসে বটে, কিন্তু মনের দিক দিয়ে এরা মনুষ্যেতর জীব। শুধু তাই–ই নয়, এদের শারীর–সংরচনাও সাধারণ মানুষের চাইতে আলাদা। মানুষ তার বৌদ্ধিক বিকাশ–নিবন্ধন যে মধুর পারিবারিক–পরিবেশকে হাতের কাছে পেয়ে থাকে ও নিজের স্বভাবের গুণে সেই পরিবেশকে মধুর থেকে মধুরতর করে থাকে এদের বেলায় কিন্তু তার ব্যতিক্রম ঘটে থাকে। মধুর পরিবেশ পেয়েও এরা – কিন্তু সে পরিবেশকে ঠিক ভাবে গ্রহণ করতে পারে না। নিজেদের বিকৃত মানসিকতার

পরিতৃপ্তির জন্যে এরা অনেক সময় স্নেহশীল পিতাকেও ভুল বুঝে বিষপ্রয়োগে হত্যা করে, স্নেহশীলা জননীর বক্ষেও নির্মমভাবে ছুরি চালায়। তাই মানুষের স্বভাবের স্বাভাবিক লক্ষণগুলো নিয়ে বিচার করে দেখতে গেলে এদের ঠিক মানুষ বলে মেনে নেওয়া চলে না। প্রকৃতিও মানুষকে যে সুবিধা বা অসুবিধাগুলো দিয়ে থাকে এদের ক্ষেত্রে সে তার কিছু ব্যতিক্রম ঘটায়। এরা অনেক প্রাকৃতিক তত্ব অতি বুদ্ধিমান বা বিচক্ষণ মানুষের চাইতেও সহজে বুঝে নিতে বা ধরে ফেলতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ নির্ধারণের ক্ষমতা মানুষের চাইতে মনুষ্যেতর জীবের বেশী থাকে। এদের ক্ষেত্রে সেই ক্ষমতা থাকতে দেখা যায়। মনস্তত্ত্ববিদ এদের অনেক কিছুই মনস্তাত্বিক সমীক্ষা-নিরীক্ষায় ধরে ফেলেছেন। কিন্তু এদের স্বভাব সংশোধনের জন্যে কোন উপযুক্ত শারীর-বৈজ্ঞানিক বা মনোবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা এখনও উদ্ভাবিত হয় নি। মনোবৈজ্ঞানিক বা শারীর-বৈজ্ঞানিকরা এদের ত্রুটি বা বিকৃতি কোথায় তা' ৰোঝেন, কিভাবে সে বিকৃতি দূরীভূত হ'তে পারে তাও বোঝেন, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ওই বিকৃতিগুলোকে সরানোই কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রই এই সব হতভাগ্যদের ব্যাধি সারাবার কাজে খুব বেশী আগ্রহ দেখাতে চায়নি-এরা পশুর মত বেঁচে থাকে, পশুর মতই

অকারণে পাপাচারে লিপ্ত হয় আর পশুর মতই নিজেদের সস্তা জীবনের বোঝাটা ফাঁসির মঞ্চে লটকিয়ে দেয়।

'মস্তকের বদলে মস্তক'-বিচারের এই সিদ্ধান্তটুকু অভ্রান্ত বলে মেনে নিলে এর পরে বলবার আর কিছুই থাকে না। তবু মনে হয় জন্ম-অপরাধীরা তাদের শরীর বা মনোগত বিকৃতির জন্যে যে অপরাধের অনুষ্ঠান করে চলে, তথাকথিত সুসভ্য মানুষেরা তাদের রোগ সারাবার চেষ্টা না করে ঠিক সেই জাতীয় অপরাধের অনুষ্ঠানই করে না কি? এটা কি ঠিক মাথার যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে মাথা কেটে ফেলার ব্যবস্থা দেওয়ার মত নয়? কোন রোগীর রোগ সারাতে পারছিনা বলে তাকে যদি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় আমার মতে সেটা যতখানি অপরাধ এই শ্রেণীর জন্ম-অপরাধীকে হত্যা করাও ততখানি অপরাধ। সুসভ্য মানুষ সমাজের কর্তব্য তাদের রোগ সারাবার ব্যবস্থা করা। হত্যা করে তাদের জীবনের বোঝা হালকা করে দেওয়ায় আর যাই থাক সুসভ্যতার পরিচয় থাকে না। তাই আমার মনে হয়, এই শ্রেণীর জন্ম-অপরাধীর বিচার শুধু অপরাধের মাত্রা বুঝে করলেই চলৰে না, মানবিক হৃদয়বত্তা নিয়েই অপরাধীকে দেখতে হৰে ও তার ব্যাধিমুক্তির পথনির্দেশনা দিতে হবে।

যে রোগী সংক্রামক ব্যাধিতে ভুগছে তাকে চিকিৎসক সুস্থ মানুষের ভীড় থেকে সরিয়ে রাখতে চান। অন্যথায় তার বিষ সুস্থদেহে সংক্রমিত হ'তে পারে। ঠিক এইজন্যেই এই শ্রেণীর জন্ম-অপরাধীকে তথা সমস্ত শ্রেণীর অপরাধীকেই অন্যান্য মানুষদের থেকে কিছুটা দূরে সরিয়ে রাখার প্রয়োজন হয়। তার চিকিৎসা কারাগারে অথবা আরও প্রকৃষ্ট ভাষায় বলতে গেলে সংশোধনাগারেই হওয়া উচিত। কারাগার তার শাস্তির জায়গা নয়, রোগমুক্তির হাসপাতাল। জন্ম-অপরাধীরা যে মানসিক রোগে ভুগে চলেছে তার চিকিৎসা একা মাত্র মনস্তত্ত্ববিদের দ্বারা হওয়া সম্ভব নয়। এজন্যে সমাজতত্ত্ববিদ ও চিকিৎসকেরও সহযোগিতা প্রয়োজন। মনস্তত্ত্ববিদ মনের ব্যাধিটুকু দেখিয়ে দেবেনে, বুঝিয়ে দেবেন কী কী কারণে এই ব্যাধির উদ্ভূতি হয়ে থাকে। তিনি মানসিক চিকিৎসায় রোগমুক্তির যতদূর পর্যন্ত হ'তে পারে নিজে ততটুকু করেও দেবেন, তারপর কাজ রয়েছে চিকিৎসকের। দেহযন্ত্রের যে বিকলতার জন্যে এই রকমের ব্যাধির উদ্ভব হয়, চিকিৎসক ঔষধের সাহায্যে বা শল্যকরণের সাহায্যে সে ত্রুটিগুলি দূর করে দেবেন, তারপর কাজ করবেন সমাজতত্ত্ববিদেরা। সমাজতত্ত্ববিদ ওই রোগমুক্ত অপরাধীকে সমাজে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে দেবেন। মনস্তত্ত্ববিদ যদি কেবলমাত্র দোষ দেখিয়েই ক্ষান্ত হন তবে কাজের কাজ কিছুই হবেনা।

চিকিৎসক যদি অপরাধীর দেহযন্ত্রের বিকলতাটুকুই ধরে দেন তাহলেও কোন লাভ নেই। অবশ্য ঠিক আজকের দিনে মনস্তত্ত্ববিদ, চিকিৎসক ও সমাজতত্ত্ববিদের মিলিত প্রচেষ্টাতেও রোগী হয়তো আশানুরূপ ফল পাবে না, কারণ মনোবিজ্ঞান আজও অনুন্নত অবস্থাতেই রয়েছে। শরীরগত যে সকল বিকৃতির জন্যে মানসিক বিকৃতি দেখা দেয় সেগুলি দূর করবার সামর্থ্য শরীর-বিজ্ঞানীরা যথাযথভাবে অর্জন করতে পারেনি। আর সমাজবিজ্ঞান সবে চউকাঠ ডিঙ্গিয়ে - ঘরে ঢোকবার চেষ্টা করছে। সে এগিয়ে চলেছে অত্যন্ত দ্বিধা-বিজড়িত পদবিক্ষেপে। তবু এই জন্ম-অপরাধীদের জন্যে এই রকমের ব্যবস্থাই নিতে হৰে। মানুষ যতদিন এদের জন্যে এই জাতীয় মানবিক ব্যবস্থা না নিচ্ছে ততদিন পর্যন্ত শুধু শুধু এদের আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে প্রহসন করার কোন অর্থ হয় না। ভালভাবে মনে রাখা দরকার এরা রোগী-আর এদের রোগ জবরদস্ত রকমের। অবশ্য অধ্যাত্ম সাধনায় এই রোগ অল্পদিনের মধ্যে ও যৌগিক প্রক্রিয়ায় তদপেক্ষা কিছুটা বেশীদিনের মধ্যে সেরে যেতে পারে। কিন্তু সেজন্যেও দরকার উপযুক্ত পরিবেশ। তাই জেলখানার পরিবেশ আরও পবিত্র, আরও মানবোচিত করে তোলা দরকার।

২। অভ্যাসগত অপরাধ

নৈতিক দৃঢ়তা যেখানে কম, মনঃশক্তি যেখানে জাগিয়ে তোলবার কোন প্রচেষ্টাই হয়নি, অথবা সামাজিক শাসন যেখানে অত্যন্ত শিথিল, সেখানে মানুষ নিজের রিপুগত বৃত্তিকে উদ্দাম ভাবে ছুটিয়ে দেবার পথ বেছে নিতে কোন দ্বিধা বোধ করে না। সাধারণ মানুষ তার বৃত্তিকে নৈতিকতার যুক্তিতে বুঝিয়ে সুঝিয়ে শান্ত করে রাখে ও এইভাবে নিজেকে সমাজবিরোধী কাজ থেকে দূরে রাখে। নৈতিকতাবোধ থাকা সত্ত্বেও যার মনের জোর কম সে অনেক সময় জেনে শুণে কতকটা যেন যন্ত্রবৎ সমাজবিরোধী কাজে লিপ্ত হয়। যার নৈতিকতাৰোধ আছে সে সমাজের ভয়ে ক্ষণিকের চিত্তচাঞ্চল্যকে শান্ত বা দমিত করে রাখে ও এর ফলে সমাজে সুস্থতা ও ব্যষ্টি-জীবনের শুচিতা' অব্যাহত থাকে। কিন্তু কু-পথে চলবার এই তিনটে বাধার যে কোন একটা দূর্বল হয়ে থাকলে মানুষ কুকার্যে প্রবৃত্ত হয় ও ৰাধার ভয় না থাকায় ক্রমশঃ ওই কুকার্যের প্রতি অধিকতর আসক্ত হ'তে থাকে। এইভাবে সমাজবিরোধী কার্যে সে বেশ অভ্যস্ত, বেশ পাকাপোক্ত হয়ে দাঁড়ায়। এরা জন্মগতভাবে কোন ব্যাধি নিয়ে আসে নি, তাই এদের চিকিৎসায় শরীর-বিজ্ঞানীর (ডাক্তারের) স্থান অতি গৌণ। উপযুক্ত নীতিশিক্ষা, মনোবল অর্জনের প্রক্রিয়া, ও কিছুটা কড়া সামাজিক পরিবেশে রাখবার ব্যবস্থা করা গেলে

এদের রোগ অল্পায়াসেই সারিয়ে তোলা যায়। তাই এদের সম্বন্ধে বিচার করবার সময় বিচারকের পক্ষে মানবিক সংবেদনের চাইতে কানুনের ধারার দিকে নজর রেখে চলাই বেশী বাঞ্ছনীয় ও সমাজকল্যাণকর হবে। অভ্যাসের ফলে এরা যত বড়ই দুর্বৃত্ত হোক্ না কেন আর শেষ পর্যন্ত এরা যদি স্বভাব-দুর্বৃত্ত আখ্যাও পায় সে ক্ষেত্রে জন্ম-অপরাধীদের মত ভয়ানক স্বাভবের লোক এরা কিছুতেই হ'তে পারে না। অল্পবিস্তর বিচার-বুদ্ধি এদের সব সময়েই থাকে আর সেইজন্যেই এদের ব্যাধিগ্রস্ত বলে ঢালাওভাবে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখা চলে না। এরা সাধুতার অভিনয় করতেও জানে। এরা দিনে সাধু সেজে রাত্রে চুরি করে, দিনে জমিদার সেজে রাত্রে ডাকাতি করে, প্রকাশ্যে সতী-স্বাধ্বী সেজে গোপনে পতিতাবৃত্তি করে। অপরাধের মাত্রাবিচারে এরাই হয়তো সব চেয়ে বড় অপরাধী। মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসা ও জেলখানার কড়া শাসন এদের স্বভাব-সংশোধনে যথেষ্ট সাহায্য করে (অবশ্য এ ক্ষেত্রেও যদি পরিবেশের শুচিতা থাকে তবে)। নীতিশিক্ষা না দিয়ে বা মনোৰল অর্জনের প্রক্রিয়া না শিখিয়ে কারও ওপর অতিরিক্ত কড়া শাসন চালিয়ে গেলে অনেক সময় পরোক্ষভাবে এই জাতীয় অপরাধী সৃষ্টির কাজেই সাহায্য করা হয়। যে সকল পিতামাতা নীতিশিক্ষা দেন না, সৎজীবন যাপনের উপযুক্ত মনোৰল অর্জনে সাহায্য করেন না অথচ কারণে

অকারণে বেত্রাঘাত করেন–তাঁদের সন্তানেরা উত্তরজীবনে সমাজবিরোধী কাজেই লিপ্ত হয়ে থাকে। যে সকল অভিভাবক কন্যা অসৎ পথে যেতে পারে এই ভয়ে লেখাপড়া শেখান না, নীতিশিক্ষা দেন না, উচ্চ আদর্শ সামনে তুলে ধরে মনোবল অর্জনের সাহায্য করেন না, তাঁরা যদি জবরদস্তি করে বিধবা বা অনূঢ়া কন্যাকে পর্দার অন্তরালে রাখবার চেষ্টা করেন সেক্ষেত্রে তাদের মধ্যে পর্দা সরিয়ে গোপনে পৃথিবীকে দেখবার আগ্রহ জেগে যায় ও এর ফলে তারা একটা লোকদেখানো শুচিতা রক্ষা করে গোপনে পাপাচরণে লিপ্ত হয়। অনেক সময় শাসনের বেড়াজাল ডিঙ্গিয়ে তারা স্পষ্টভাবেই সমাজবিরোধী কার্যে লিপ্ত হয়।

এই শ্রেণীর অভ্যাসগত অপরাধীকে আধ্যাত্মিকতার পথে আনা বেশ কষ্টকর। তবে মনস্তাত্ত্বিক আবেদনের সাহায্যে তা' যে একেবারেই অসম্ভব এমন কোন কথা নেই। এরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বুদ্ধিমান, ক্ষুদ্র স্বার্থের কারণে এরা সমাজদ্রোহিতা, দেশদ্রোহিতা অথবা রাষ্ট্রদ্রোহিতা করে; নিজের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে এদের একটা বৃহৎ অংশ রাজনৈতিক নেতা সেজে দিনের পর দিন জনসাধারণকে ঠকিয়ে চলে। পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ বড় বড় যুদ্ধই এই শ্রেণীর অপরাধীরা বাধিয়েছে। অপরাধী সমাজে যারা রুই–কাৎলা

তারা এই শ্রেণীর মধ্য থেকেই এসেছে। দুঃস্থ জনসাধারণ টানাজালের সাহায্যে কখনও এদি'কে ডাঙ্গায় তুলেছে, কখনও বা এরা জাল ছিঁড়ে পালিয়ে গেছে। এদের বিচার করতে গেলে শুধু যে বুদ্ধিমত্তারই প্রয়োজন তা' নয়, সাহস ও সতর্কতার প্রয়োজনও অত্যন্ত বেশী। বড় বড় চোরাকারবারী বা ভেজালবিক্রেতাও এই শ্রেণীর অপরাধীদেরই প্রতিনিধি। অনেক সময় এরা বিচারকের স্বাধীনতাতেও হস্তক্ষেপ করতে চায়, বিচারকের আসন টলিয়ে দিয়ে পাপের জয়যাত্রা অব্যাহত রাখতে চায়। এদের শায়েস্তা করার জন্যেই বিচারকের হাতে খুব বেশী ক্ষমতা থাকা দরকার।

৩। পরিবেশগত অপরাধ

জগতে এমন মানুষও অনেক আছে যারা দেহগত বা জন্মগত কারণে অপরাধপ্রবণ হয় নি, বৃত্তির তাড়নায়, শিক্ষার অভাবে অথবা সামাজিক শাসনের অভাবের দরুণও যারা অপরাধে লিপ্ত হয় নি বা হয় না, উপযুক্ত পরিবেশ পেলে হয়তো তারা সাধু-চরিত্রের আদর্শ মানুষ বলে পরিগণিত হতে পারত। তবু তারা আজ অপরাধী বলে সভ্য সমাজে ধিকৃত হচ্ছে। সৎব্যষ্টিও যে পরিবেশের চাপে পড়ে অসৎ হ'তে পারে এরা তারই জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। স্বভাব-দুর্বৃত্ত ব্যষ্টির শান্ত ও

সৎস্বভাবের পুত্রকে পিতার কাছ থেকে নির্যাতনের ভয়ে সমাজবিরোধী কার্যে লিপ্ত হ'তে হয় আর এই সমাজবিরোধী কাজগুলো অভ্যাসের ফলে ক্রমশঃ তার স্বভাবে পরিণত হয়। পতিতানারীর কন্যা সৎজীবন যাপনের শত ইচ্ছা থাকা সত্বেও মাতা তথা পরিবেশের চাপে পড়ে অকথ্য নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে সমাজবহির্ভূত জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়। আপাতঃদৃষ্টিতে এদের এই অসহায় জীবনের জন্যে অসৎ পিতামাতা বা অভিভাবককেই সাধারণতঃ আমরা দোষ দিয়ে থাকি। এজন্য কিন্তু তারাও সর্বক্ষেত্রে ষোল আনা অপরাধী নন। কারণ তাদের ওপরেও অনেক সময় অন্য রকমের চাপ অর্থাৎ আর্থিক চাপ থেকে যেতে পারে ও অভাবের ফলেই 'অন্যায় করছি' জেনেও এঁরা নিজেরা অন্যায় করে থাকেন ও সন্তানদের অন্যায়কে প্রশ্রয় দেন তথা নির্যাতন করে তাদের অন্যায়ে প্রবৃত্ত করেন। কোন কোন উদ্বাস্তুর মধ্যে সমাজবিরোধী ভাবের প্রবণতা দেখে যাঁরা তাদের নিন্দায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন তাঁরা একটু তলিয়ে দেখলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখবেন যে অর্থকৃচ্ছ্রতার ফলেই তারা সন্তান-সন্ততিগণকে সমাজবিরোধী কার্যকলাপে উৎসাহ দিয়ে থাকেন। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই অর্থাভাবটা যে এর একমাত্র হেতু, তা' নয়। পিতামাতা বা অভিভাবক যেখানে স্বভাব- দুর্বৃত্ত, তাঁরা নিজেদের ব্যাধি বাড়ীর অন্যান্যদের মধ্যে সংক্রমিত করে

দিতে চান। কিছুদিন পূর্বে সংবাদপত্রে দেখেছিলুম জনৈক উচ্চ মধ্যবিত্ত ঘরের মহিলা তাঁর সন্তানকে সিনেমায় যাবার পয়সা দেবার লোভ দেখিয়ে প্রতিবেশীর গৃহ থেকে বস্ত্রাদি অপহরণ করতে উৎসাহ দিতেন অর্থাৎ পরোক্ষভাবে চাপ দিতেন। জিনিসটা জানাজানি হয়ে যাবার পরে অনুসন্ধান করে দেখা যায় যে তাদের বাড়ীতে মোটেই অর্থাভাব নেই। ভদ্রমহিলা পরিবেশের চাপ সৃষ্টি করে নিজের মানসিক ব্যাধি সন্তানে সংক্রমিত করে দিচ্ছিলেন। অনেক অভিভাবক নিজেদের কৃপণতার জন্যে অথবা অন্য যে কোন কারণেই হোক সন্তানদের সুখাদ্য সুপেয় থেকে বঞ্চিত রেখে (এই বঞ্চিত রাখার ক্ষেত্রে যদি কোন যুক্তিও থাকে তবে সেটা সন্তানকে না বুঝিয়ে) তাদেরই সামনে অন্য লোককে তাই দিয়ে আপ্যায়ন করেন–এর ফলে সন্তান তার স্বাভাবিক ভোগেচ্ছা পরিতৃপ্তির জন্যে কতকটা অবস্থার চাপে পড়ে চৌর্যবৃত্তি গ্রহণ করে। এমন লোকও অনেক আছে যারা নিজেরা অর্থাৎ বাড়ীর লোকেরা সুখাদ্য-সুপেয় গ্রহণ করে কিন্তু ভৃত্যের জন্যে সাধারণ খাদ্য বা অখাদ্যের ব্যবস্থা দেয়। তাদের ভৃত্যেরাও লোভের বশবর্তী হয়ে চুরিবিদ্যায় অভ্যস্ত হ'তে থাকে। এমন অভিভাবককেও দেখেছি যারা প্রত্যক্ষভাবে সন্তানকে মারপিট ও গালিগালাজ করতে উৎসাহ দেন। আমি এও দেখেছি স্বভাব-শান্ত সন্তান অনেক সময়েই তার পিতামাতার মতে মত

দিতে পারে না কিন্তু শেষে প্রহারের ভয়ে তাঁদের আদেশ মানতে বাধ্য হয়। পল্লীগ্রামে এমনও দেখেছি যে দায়ভাগ-শাসিত সমাজের যুবক সম্পত্তির অধিকার খোয়াবার ভয়ে তার নিষ্ঠুর অভিভাবকের প্ররোচনায় নিরীহ পত্নীর ওপর অকথ্য অত্যাচার করে। এগুলো সমস্তই পরিবেশসৃষ্ট অপরাধের নিদর্শন।

পরিবেশসৃষ্ট অপরাধীদের মধ্যে যারা স্বভাবগত অপরাধীতে পরিণত হয়নি, তাদের বিচারকালে আইনের ধারাকে প্রাধান্য দিলে চলবে না। উপযুক্ত তদন্তের পর যখনই জানা যাৰে যে অমুক অমুক কারণে বা অমুক অমুক ব্যক্তিদের চাপে পড়ে অপরাধী (তা' সে যে বয়সেরই হোক না কেন) সমাজ-বিরোধী কার্যে লিপ্ত হয়েছিল, বিচারকের উচিত সেক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞানী তথা মনস্তত্ত্ববিদের সহায়তায় ওই সকল অপরাধীকে তার পূর্ব পরিবেশ থেকে মুক্ত করা। এজন্যে আর কোন সংশোধনমূলক ব্যবস্থার প্রয়োজন বড় একটা হবে না। কিন্তু পরিবেশ-সৃষ্ট অপরাধী যদি দীর্ঘকালের অভ্যাসের ফলে স্বভাবগত অপরাধীতে পরিণত হয় সেক্ষেত্রে পরিবেশ পরিবর্তনটুকুই যথেষ্ট ৰলে বিবেচিত হ'তে পারে না। তার সঙ্গে সঙ্গে বিধান- সংহিতার ধারা অনুযায়ী তার সম্বন্ধে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা নেবার প্রয়োজনও থেকে যায়।

যে মোটামুটি সুস্থ শরীর ও মন নিয়ে জন্মেছে, সমাজের শাসন বা নীতিজ্ঞানের অভাবও যার নেই, পরিবেশের চাপে পড়ে যাকে অসাধু হতে হয় নি, সেও অনেক সময় সঙ্গদোষে পড়ে কতকটা নিজেরই অজ্ঞাতসারে অসাধুতার পথে পা বাড়ায়। এমন লোকের সংখ্যা সমাজে হয়তো শতকরা নিরানব্বুই জন যারা নিজেদের সম্বন্ধে বলে থাকে যে "আমি নিজে যখন ভালো তখন যার সঙ্গেই মিশি না কেন তা' নিয়ে আর কারও মাথা ঘামাৰার দরকার নেই। আমি কারও পাল্লায় পড়ে খারাপ হব না। ভাল-মন্দ বোঝবার বয়স আমার যথেষ্ট হয়েছে"-অর্থাৎ কেউ এদের অসৎসঙ্গ থেকে নিবৃত্ত করুক এমন কথা ভাবতেও এদের ভাল লাগে না বা ভাবতেও এদের আত্মম্ভরিতায় বাধে। বিশেষ করে যদি কোন অল্পশিক্ষিত ব্যষ্টি তার চেয়ে অধিক শিক্ষিত ব্যষ্টিকে অসৎসঙ্গ থেকে নিবৃত্ত হ'তে পরামর্শ দেয়, সেক্ষেত্রে এ ধরণের মানসিক অভিব্যক্তি উৎকটভাবে দেখা দেয়। সমাজে পদমর্যাদায়, বিত্তে বা বিদ্যায় সে নিজেকে যার চাইতে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে সে সাধারণতঃ ভেবে থাকে যে তার চাইতে যে অধম, তার পক্ষ থেকে কোন পরামর্শ আসা একেবারেই অনভিপ্রেত। বিপথগামী শিক্ষিত পুত্র তাই অনেক সময় পিতামাতার সৎপরামর্শকে আদৌ কোন মূল্য দিতে চায় না।

মানবমনের স্বাভাবিক ধর্ম কিন্তু অন্যধরণের কথা বলে। সাত থেকে সত্তর যে বয়সেরই মানুষ হোক না কেন সঙ্গের প্রভাব তার ওপর পড়তেই হৰে, অর্থাৎ কিনা যেখানে সৎ-মনোভাবের প্রাবল্য, অসৎমনোবৃত্তির মানুষ সেখানে এলে ধীরে ধীরে সৎ হ'তে ৰাধ্য হবে, আর যেখানে অসৎ মনোভাবের প্রাবল্য দেবচরিত্রের মানুষও সেখানে কিছুদিন ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করলে বিপথগামী হ'তে বাধ্য হৰে। আজ যে মদ্যপ নয়, সে কিছুদিন নিয়মিতভাবে মদ্যপ-সমাজে মেলামেশা করুক, বন্ধু-বান্ধবদের পক্ষ থেকে প্রত্যহ অ-মদ্যপদের সম্বন্ধে বিদ্রুপ শুণতে শুণতে আর মদ্যের অদ্ভুত গুণের কথা জানতে জানতে তারও একদিন ইচ্ছা যাবে একটু চেখে দেখি। বন্ধু-বান্ধৰেরাও বলৰে- "তোমাকে নেশা করতে বলছি না, একটু চেখে দেখ না, এতে তো আর খারাপ হয়ে যাবে না! তুমি দেখছি বড্ড নীতিবাদী? আরে ভাই, পৃথিবীতে কি আর অতবেশী নীতিবাদী হ'লে চলে!" কিন্তু এই চেখে দেখাই একদিন কাল হয়ে দাঁড়ায়। সেদিনকার সেই নির্দোষ মানুষটি জানতেও পারে না যে মদ্যই সেদিন থেকে তাকে চাখতে শুরু করল। ঠিক এইভাবেই সঙ্গদোষে মানুষ দুশ্চরিত্রতা, পরনিন্দা, চৌর্যবৃত্তি প্রভৃতি অপগুণ গ্রহণ করতে থাকে। যে সকল বাড়ীর মেয়ে বা পুরুষদের সংসারের কাজকর্ম কম, জীবনে

যারা কোন উচ্চ আদর্শও গ্রহণ করে নি, ধার্মিক দৃষ্টিভঙ্গিও যাদের নেই, অথবা জীবিকা-অর্জনের জন্যে যাদের প্রাণপাত প্রয়াস করতে হয় না সাধারণতঃ তারা অতিমাত্রায় পরনিন্দুক হয়ে থাকে। আর এদের সঙ্গে মিশে উচ্চ-আদর্শবাদী বা পরিশ্রমশীল মানুষও ধীরে ধীরে পরনিন্দার মাধ্যমেই নিজের দৈনন্দিন জীবনের সামান্য অবকাশটুকু ব্যয়িত করতে চায়। যে সকল বাড়ীর পিতামাতা বা বড়রা কলহপরায়ণ সে বাড়ীর ছোটরাও সঙ্গদোষে কলহপরায়ণ হয়ে ওঠে। যে বাড়ীর মেয়েরা অতিমাত্রায় পরনিন্দায় রত থাকে, সে বাড়ীর ছোটরা অতি-অবশ্য পরনিন্দুক হয় কারণ বড়রা ছোটদের মাধ্যমেই পরনিন্দার উপকরণগুলি সংগ্রহ করে। স্কুল-কলেজেও ছোটরা বড়দের সঙ্গে বেশী মেলামেশা করেই বখামি শিখে থাকে। নিজের সমাজে, তারা কিন্তু যতদূর সম্ভব নির্দোষ হাসি-আনন্দ নিয়েই ব্যস্ত থাকে। এই সঙ্গ- নির্বাচন জিনিসটা এতই সতর্কতার সঙ্গে করা দরকার যে অধিকাংশ সময়েই অল্পবয়স্ক লোকেরা ততখানি সতর্কতা মেনে চলতে পারে না। মানুষের মধ্যে যে দুষ্প্রবৃত্তিগুলি সুপ্তভাবে থাকে সঙ্গদোষে সহজেই তা' উদ্দীপ্ত হয়। তবু যারা অল্পবয়স্ক, অভিভাবক, পাড়ার লোক বা শিক্ষিতদের মিলিত প্রচেষ্টায় তাদের অসৎসঙ্গ থেকে অনেকখানি বাঁচানো সম্ভব হ'তে পারে। কিন্তু অসৎসঙ্গ যেখানে ঘরের মধ্যেই রয়েছে অথবা পাড়ার মধ্যে আশেপাশে

ভীড় জমিয়েছে সেখানে তা'দিকে তার হাত থেকে রক্ষা করা অত্যন্ত কষ্টকর। ব্যাপকভাবে ধর্মীয় আদর্শ তথা নীতিশিক্ষার ব্যবস্থা ও পুলিশী কঠোরতার ব্যবস্থা ছাড়া এর হাত থেকে পরিত্রাণের অন্য কোন পথ নেই। আধুনিক পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরণের বৃত্তিরুজ্জীবক চলচ্চিত্র বালক-বালিকা বা কিশোর-কিশোরী বা যুবক-যুবতীদের মতিভ্রান্তি ঘটায়। পর্দায় দৃষ্ট অপরাধানুষ্ঠান বা সস্তা প্রেমাভিনয় বা দুঃসাহসিকতার কাজ দেখে তাদের ব্যষ্টিগত জীবনে অনুরূপ কার্যে প্রবৃত্ত হবার ইচ্ছা জাগে। এটাও এক শ্রেণীর সঙ্গদোষেরই নিদর্শন। পর্দার চরিত্রগুলিকে সে পরিচিত ব্যষ্টিরূপেই তখন গ্রহণ করে, কিন্তু পরে তাদের ভূমিকার নকল করতে গিয়ে দেখে যে পর্দার পৃথিবীর চাইতে বাস্তবের পৃথিবী অনেক কঠোর। যারা নিজেরাই নিজেদের অভিভাবক, তাদের যদি বাড়ীর বন্ধন শিথিল থাকে অথবা সম্মুখে কোন উচ্চ আদর্শ না থাকে তবে তাদের অসৎসঙ্গ থেকে বাঁচানো অসাধ্য না হ'লেও দুঃসাধ্য। এই সঙ্গদোষের ফলে যারা অপরাধে লিপ্ত হয় তারা যতক্ষণ না স্বভাব-অপরাধীতে পরিণত হচ্ছে ততক্ষণ সঙ্গদোষের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবগত পবিত্রতা অর্জন করতে থাকে। সুতরাং এই শ্রেণীর অপরাধীদের বিচার করবার সময় এদের সঙ্গের কথা তথা সঙ্গ-প্রভাবসৃষ্ট স্বভাবের কথা ভাবার পরেই এদের সম্বন্ধে সংশোধনী ব্যবস্থা

সূচীপত্র

নেওয়া দরকার। তবে এক্ষেত্রেও যারা স্বভাব–অপরাধীতে পরিণত হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে কেবল সঙ্গ–বর্জনেই কাজ হবে না, কারণ তারা নিজেরাই নিজেদের কুসঙ্গ। এদের জন্যে কঠোরতর ব্যবস্থা নেবার প্রয়োজন অবশ্যই আছে। সমস্ত প্রতারণামূলক কাজই (বিভিন্নভাবে লোকঠকানো, জালিয়াতি, জুয়া, লুন্ঠন, নারীহরণ, বিনা টিকিটে যানবাহন ব্যবহার প্রভৃতি) সাধারণতঃ সঙ্গদোষেই হয়ে থাকে। কারাগারেও এই শ্রেণীর অপরাধীদের মধ্যে যারা স্বভাবগত অপরাধীতে পরিণত হয়েছে তাদের অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে রাখা দরকার। অন্যথায় এদের ব্যাধি অন্যদের মধ্যেও সংক্রমিত হয়ে যেতে পারে।

৪। অভাবগত অপরাধ :

জীবনধারণের সর্বনিম্ন প্রয়োজন যে সকল দেশে মোটামুটি মেটানো হয়ে থাকে সে দেশগুলি ৰাদে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই অনুষ্ঠিত অপরাধসমূহের অধিকাংশই ঘটে থাকে অভাব নিবন্ধন। অবশ্য এই অভাবের তাড়নায় সমাজবিরোধী কার্যে লিপ্ত হওয়ার প্রবৃত্তি সর্বত্র বা সকল মানুষের মধ্যে সমানভাবে হয় না। নৈতিক দৃঢ়তার মাত্রাভেদে এই জাতীয় অপরাধেরও হ্রাস–বৃদ্ধি ঘটে থাকে। তবে নীতিবিজ্ঞান যতই দৃঢ় থাকুক

না কেন অভাবের তাড়নায় অস্তিত্ব যেখানে নস্যাৎ হবার উপক্রম হয়, সেখানে অধিকাংশ মানুষই সমাজের স্বীকৃত কাঠামোয় আঘাত হানবার চেষ্টা করে। এ অবস্থায় তারা যে যুক্তি দেখায় বা যদি কোন যুক্তি দেখায় মানবধর্মের মুখ চেয়ে তাকে অস্বীকার করতে পারি না। মানুষের বাঁচৰার সর্বনিম্ন অধিকারটুকুই সে অবস্থায় এরা দাবী করে আর এই অধিকারটুকুর ওপরেই নির্ভর করে সমাজের সুস্থতা, সমাজের সার্থকতা। অবশ্য পৃথিবীর ইতিহাসে এমন ঘটনা বিরল নয় যখন দেখা গেছে যে লক্ষ লক্ষ লোক মনুষ্যসৃষ্ট কৃত্রিম দুর্ভিক্ষের কৰলে পড়ে অনাহারে মরেছে। ফুটপাতে চলতে চলতে হাঁটু ভেঙ্গে আছড়ে পড়েছে, তবু পরস্বাপহরণে প্রবৃত্ত হয় নি। তাদের এই অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে মরণ–কামড় না দেওয়ার পক্ষে উগ্র নীতিৰোধ যদিও একটা কারণ তবুও সেটা একমাত্র কারণ নয়। অনাহারক্লিষ্ট মানুষেরা বিশেষ করে যদি তারা তিলে তিলে জীবনীশক্তি হারিয়ে ফেলতে থাকে, সেক্ষেত্রে তারা সংগ্রামের সৎসাহস হারিয়ে ফেলে। মৃত্যুকে নিশ্চিত জেনে মরণের কোলেই আশ্রয় নিতে চায়। শপরম্পরাগতভাবে ভুল দর্শন তথা ভুল ধর্মবিশ্বাসকে ভিত্তি করে জীবন–আদর্শকে গড়ে তুলে নিজের দুরবস্থাকে বিধিনির্দিষ্ট ব্যবস্থা বলেই মেনে নেয়। হয়তো সেইরকম সময় তারা যদি একজন তেজোদীপ্ত নেতা পেত, অগ্নিবর্ষী বক্তৃতা শুণত বা পথপরিক্রমার উপযুক্ত

নির্দেশনা পেত তাহলে হয়তো তারা সম্মিলিতভাবে তৎকালীন সমাজের কাঠামোর ওপর আঘাত হানত। সে অবস্থায় তাদের এই কাজকে সৎ–নীতিবিরোধী বললেও হয়তো বলতে পারি, কিন্তু অস্তিত্ব–ধর্মের যে বিরোধী নয় একথাটা তো ঠিক।

মনে–প্রাণে যারা দুর্নীতিকে ঘৃণা করে এমন সৎস্বভাবের লোকও অনেক সময় অভাবের চাপে পড়ে সাময়িকভাবে নিজের মনঃসাম্য বজায় রাখতে না পেরে নিছক অস্তিত্ব–রক্ষার তাগিদেই অপরাধে প্রবৃত্ত হয়ে থাকে। এ অবস্থায় বিচারক যদি তার অপরাধটুকু দেখে অথবা এ ব্যাপারে কার্যকারণ–তত্ত্বের প্রতি সামান্যমাত্র উদাসীনতাও দেখায় তার ফল কী ধরণের হ'তে পারে? এই জাতীয় অপরাধী–এরা হয়তো অধিকাংশই খেতে পরতে পাওয়া তথাকথিত সৎব্যষ্টির চাইতেও বেশী সৎ, শুধু সমাজের উৎপাদন ও বন্টন–বৈষম্যের ফলে অপরাধীরূপে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয় ও অসৎ সঙ্গে থেকে আর নিজের শাস্তিজনিত গ্লানি, ঘৃণা ও অপমানে মরিয়া হয়ে পরবর্তীকালে অর্থাৎ কারাগার থেকে মুক্তি পাবার পরে ধীরে ধীরে স্বভাব–অপরাধীতে পরিণত হয়।

অভাবের তাড়নাতেই দুর্ভিক্ষ–ক্লিষ্ট অঞ্চলে ব্যাপকভাবে অপরাধ সংঘটিত হ'তে দেখা যায়। আবার আর্থিক পরিস্থিতি

কিছুটা উন্নত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অপরাধের সংখ্যাও কমে যেতে থাকে। এ থেকে এটাই বোঝা যায় যে কোন দেশের অধিকাংশ মানুষ ও মোটামুটি বিচারে মানুষ জাতটা অপরাধপ্রবণ নয়। সে চায় খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে, সে চায় হাসি–খুশিতে দিনগুলো কাটিয়ে দিতে আর সে চায় তার স্বাভাবিক বিকাশের পথ যেন কোন একদেশদর্শী সমাজ–শাস্ত্রকারের নিষ্ঠুর লৌহ–কৰাটে প্রতিহত হয়ে থেমে না যায়।

অভাবের তাড়নায় নিজের বিবেক–বুদ্ধির বিরুদ্ধে গিয়ে যারা অপরাধ– অনুষ্ঠানে রত হয়, তারাও দিনের পর দিন কাজ করতে করতে স্বভাব– অপরাধীতে পরিণত হয়ে থাকে। পেটের জ্বালায় কেউ যদি চুরি ডাকাতি করে ফেলে অথবা বৃত্তির তাড়নায় যদি কেউ হীনকর্মে প্রবৃত্ত হয়ে পড়ে সে ক্ষেত্রে তার অভাব বুঝে সমাজের কর্তব্য যথাবিধি সে অভাব দূরীকরণের · চেষ্টা করা। কিন্তু সমাজ যদি সে কর্তব্য প্রতিপালন না করে (আগেই বলেছি– ঠিক 'সমাজ' বলতে যা' বোঝায় মানুষ এখনও তা' গড়ে তুলতে পারে নি), বরং তার অপরাধটাকেই বড় করে দেখে, তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়, সেক্ষেত্রে অপরাধীর মন থেকেও কৃতকর্মের জন্যে পশ্চাত্তাপের ভাবও নষ্ট হয়ে যায় আর তার পরিবর্তে জেগে ওঠে একটা মরিয়া ধরণের মনোভাব। সে তখন ভাবে

বদনাম যা' হৰার তা তো হয়েই গেছে, এখন আর সৎপথে থেকে কষ্ট করি কেন "ডুবছি যখন ডুবেই দেখি পাতাল কতদূর”? অভাবের তাড়নায় (সে অভাব অন্ন-বস্ত্র বা দৈহিক বা মানসিক যে সংক্রান্তই হোক না কেন) মানুষ যখন কু-কার্য করে বসে তখন সে তার এই কুকার্যের জন্যে সমাজের ওপরেই দোষারোপ করে। সে বোঝাতে চায় সমাজ-ব্যবস্থার ক্রটিতেই তার এই অভাব তৈরী হয়েছিল। কথাটা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সত্য। কোন পরিবারের উপার্জনশীল ব্যষ্টির অকালমৃত্যু হ'লে সঙ্গে সঙ্গেই সেই পরিবারে দারিদ্র্যের একটা কালো ছায়া নেৰে আসে। অনেকক্ষেত্রেই সংসার ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, তার সকল মাধুর্য, সকল পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যায় কেবল অভাবের চাপেই। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করে সমাজে পরগাছার সংখ্যা বাড়িয়ে দেয় অথবা সমাজবিরোধী শক্তিসমূহের ক্রীড়নকে পরিণত হয়ে শেষ পর্যন্ত চোর, ডাকাত, গুণ্ডা, পকেটমার বা ভিক্ষুক ব্যবসায়ী-প্রতিষ্ঠানের দালাল তথা অন্নদাসে পরিণত হয়। এর সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত সমাজে লোকদেখানো শুচিতা-অশুচিতার ৰোধ অত্যন্ত প্রবল, সে সমস্ত সমাজের অল্পবয়স্ক বিধবারা সমাজ-বিরোধী জীবন যাপনে বাধ্য হয় বা বিভিন্ন কারণে প্রলুব্ধ হয়।

সূচীপত্র

সুতরাং অভাব–কেন্দ্রিক এই যে বিভিন্ন সমাজবিরোধী কার্যকলাপ এর সমাধানের মূলসূত্র নিহিত রয়েছে সুস্থ অর্থনৈতিক তথা সামাজিক কাঠামোর মধ্যে। আজ যাকে চোর বলে ঘৃণা করছি, আপনি না বলে 'তুই' বলে সম্বোধন করছি সেই হয়তো সুস্থ সামাজিক অবস্থার মধ্যে প্রতিপালিত হ'লে একজন নামকরা মনীষীতে পরিণত হোত। আজ যাকে গণিকা ৰলে অবহেলা করছি, জীবনের পূর্বাহ্ণে সমাজের তরফ থেকে কিছুটা সহানুভূতি পেলে সে হয়তো মহিলা সমাজের নেতৃত্ব করত; হয়তো বা প্রখ্যাতনামা নেতার জননীরূপে পূজিতা হোত। তাই বলি এইসব হতভাগা বা হতভাগিনীরা আমাদেরই মিলিত প্রচেষ্টায় সৃষ্ট পাপের বোঝা মাথায় ব'য়ে বেড়াচ্ছে। এরা নিজেরা পাপ তৈরী করেনি বা করলেও তার পরিমাণ অনুদারচিত্ত তথাকথিত সাধুদের চাইতে হয়তো কমই হবে, অন্ততঃ বেশী তো নয়ই। **অভাবে যে পাপাচরণ তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবার অধিকার বিধাতারও আছে কিনা সন্দেহ, মানুষের তো নেই–ই**। তবু নৈতিকতার দৃষ্টিতে এই শ্রেণীর পাপাচারণকে সমর্থন করতে পারি না। আমি তো ৰলৰ, এই ধরণের পাপাচরণে প্রবৃত্ত হবার পূর্বে পাপোন্মুখ ব্যষ্টিদের উচিত বিপ্লবের পথ গ্রহণ করা। নীতিজ্ঞানসম্পন্ন ব্যষ্টিদের উচিত তাদের সেই পথে যথাযথভাবে পরিচালনা

করা। বিপ্লবের আগুনে খাদটুকুকে গলিয়ে ৰা'র করে আসল সোণাটুকুকে ঘরে তুলে নেওয়া।

অভাবসৃষ্ট অপরাধীদের সম্বন্ধে সংশোধনীমূলক ব্যবস্থা হিসাবে এই বিপ্লবের বাণী শেণানো ছাড়া সংব্যষ্টির সামনে দ্বিতীয় কোন পন্থা আছে বলে আমার মনে হয় না। এ ব্যাপারে বিচারকের অবস্থা ঠিক ঠুটো জগন্নাথের মত–তার কিছু ৰলৰারও নেই, কিছু করৰারও নেই। মনস্তত্ত্ববিদ ও সমাজতত্ত্ববিদেরও কর্মক্ষেত্র অত্যন্ত সীমিত। তাঁদের সামনে যে পথটুকু রয়েছে তা' একান্ত অপরিসর। এর সমাধান সম্পূর্ণভাবেই নির্ভর করে রাষ্ট্রবিশেষের তথা সমগ্র বিশ্বের দৃঢ় আর্থিক বুনিয়াদের ওপর। এজন্যে যদি কাউকে দোষ দিতে হয়, দিতে হবে পৃথিবীর প্রতিটি রাষ্ট্রনেতাকে। জনসাধারণকে বড় বড় আশার বাণী শুণিয়ে বা হিমাদ্রিস্পর্শী প্রলোভন দেখিয়ে গদি দখল করলেই তাঁদের কাজ শেষ হয় না। বড় বড় বুলির আড়ালে নিজেদের অযোগ্যতাকে ঢেকে রাখলে ৰৌদ্ধিক লড়াইয়ে জয়ী হওয়া যায় কিন্তু তাতে কুকুর–শেয়ালের মত যাদের জীবন সেই প্রাকৃত মানুষের সমাজ অস্তিত্বরক্ষার দাবীর বাস্তব স্বীকৃতি পায় না। পেটের ক্ষুধা ভুলে গিয়ে মনের ক্ষুধাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে রাষ্ট্রকে তথা বিশ্বমানবসমাজকে মজবুত করে গড়ে তোলার মহাযজ্ঞে

মনে প্রাণে তারা কিছুতেই আত্মনিয়োগ করতে সক্ষম হয় না। উদর যার পূর্ণ অন্যের ক্ষুধাকে অস্বীকার করতে তার বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার করতে হয় না। তাদের এই অস্বীকৃতি বা নরপিশাচদের এই মমতাহীন অভিনয় আমরা অনেক দেখেছি ও সহ্য করতেও অভ্যস্ত হয়ে গেছি। কিন্তু এরা যখন অভাবসৃষ্টি করে অভাবগ্রস্তদের অপরাধে প্রবৃত্ত করে, শস্য গুদামজাত করে কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে অনশন- ক্লিষ্ট মানুষকে পরোক্ষভাবে লুন্ঠনকার্যে উস্কানি দেয় অথবা একদিকে সামাজিক চাপ দিয়ে কুলত্যাগ করতে বাধ্য করে, অন্যদিকে অর্থের মোহ দেখিয়ে নারীকে কুলত্যাগিনী হতে প্রলুব্ধ করে, যখন অধিকাংশ দেশের সমাজের ওপরতলাকার জন্যে তৈরী আইনে এরা নিজেদের বেশ দোষমুক্ত, বেশ সাধুটি সাজিয়ে রাখে, তখনও তাদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ কিছু বলতে পারে না। বলতে চাইলে তাদের সামনে যে পথটি খোলা থাকে সেটা গণবিপ্লবেরই পথ। এই নরপিশাচদের হাত থেকে সাধারণ সরল মানুষদের বাঁচাবার পবিত্র দায়িত্ব যাঁরা নেবেন সাধারণ মানুষ তাদের রাষ্ট্রনেতাদের মধ্যে থেকেই খুঁজে পেতে চায়। অবস্থার চাপে ফেলে যারা মানুষকে পশুতে পরিণত করে, আমার তো মনে হয় বিচার যদি করতে হয় তাহলে সেই চাপ যাদের পক্ষ থেকে এসেছিল বিচার তাদেরই হওয়া উচিত। যারা অভাবের চাপে অপরাধী হয়েছে। তাদের

বিচারের ভার বিচারকের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার অর্থ বিচারকের প্রতি অবিচার করা।

কিন্তু অভাবগত অপরাধের ষোল আনা ক্ষেত্রেই যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই দায়ী এমন কথা বলা চলে না। অনেক সময় সচ্ছল অবস্থাপন্ন ব্যক্তিও শোক- দুঃখ প্রভৃতি মানসিক গ্লানিগুলো ভুলে থাকার জন্যে অথবা নিজের দুর্দান্ত বৃত্তিসমূহকে চরিতার্থ করবার জন্যে মদ্যপান, বিভিন্ন ধরণের নেশা, জুয়া, দুশ্চরিত্রতা, অতি-বিলাসিতা, ঔদরিকতা প্রভৃতিকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকে ও এই নেশার বশে যখন সে স্বচ্ছলতা হারিয়ে ফেলে তখন সে নেশার পূর্তির জন্যে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে আর ঋণমুক্তির সম্ভাবনাও যখন সে আর খুঁজে পায় না তখন বিভিন্ন ধরণের সমাজধ্বংসী অপরাধে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এই জাতীয় অপরাধের কারণ আপাতঃদৃষ্টিতে যে অভাব সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। কিন্তু এ অভাবের জন্যে সমাজ দায়ী নয়, এর ষোল আনাই তার সৃষ্টি। তাই এই জাতীয় অপরাধীর বিরুদ্ধে সংশোধনী ব্যবস্থা নেবার প্রয়োজনও আছে। এদের শোধরাবার প্রথম ও প্রধান পন্থা হ'ল এদের নেশামুক্ত করা।

৫। সাময়িক অপরাধ উন্মুখতা :

আর একধরণের অপরাধও সমাজে কিছু কিছু দেখা যায়। সেটা হচ্ছে সাময়িক অপরাধ উন্মুখতা। এটা হ'ল এক বিশেষ ধরণের মানসিক ব্যাধি, যা' কোন বিশেষ পরিবেশে সাময়িকভাবে সৃষ্ট হয় আবার কিছুক্ষণ পরে দূরে সরে যায়। Kleptomania বা চৌর্য–বাতিক এই ধরণেরই মানসিক ব্যাধি। অপরাধের অনুষ্ঠানের পরে এরা লজ্জিত হয়। অপহৃত বস্তু প্রত্যর্পণে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, মানসক্ষেত্রেও অনেক সময় এরা সাময়িকভাবে লুন্ঠন, নারী হরণ, মদ্যপান বা দুশ্চরিত্রতাকে প্রশ্রয় দিয়ে ফেলে অথচ খোঁজ নিলে দেখা যায় সেগুলোতে তার ব্যষ্টিগতস্বার্থ কিছুমাত্র ছিল না। সাধারণতঃ দুর্বল–মনা লোকেরা চুরি, নরহত্যা বা বিভিন্ন প্রকারের পাপানুষ্ঠান চোখে দেখে তাই নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে থাকে ও প্রৰল অন্তর্মন্থন তথা আলোড়নের ফলে নিজে শুভবুদ্ধির পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। বিশেষ বিশেষ দেশ কাল বা পাত্রগত পরিবেশের মধ্যে এসে যখনই পূর্বেকার আলোড়নের পুনরুদয় হয় তখনই সে অপরাধ অনুষ্ঠান করে বসে। নিজে চুরি না করে চুরির কথা তথা চুরির পদ্ধতি চিন্তা করতে করতে অনেক সময় সে এমনধারা কথা বলতে থাকে যা' শুণে মনে

হয় সেই সত্যিকারের অপরাধী। কোন বীভৎস হত্যাকাণ্ড দেখবার পরে অনেক সময় এই সকল দুর্বলমনা ব্যক্তি নিজেকেই অপরাধী বলে ভাবতে আরম্ভ করে চিন্তার ঘোরে অনেক সময় নিহত ব্যক্তির বস্ত্র বা অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ বা অন্য কোন চিহ্ন নিজের বাড়ীতে এনে লুকিয়ে রাখে ও সমাজে অপরাধের বিশদ ব্যাখ্যা দিতে থাকে। "এইভাবে লোকটাকে ধরে নিয়ে গেলুম," "এইভাবে ছোরা চালালুম" প্রভৃতি। এরূপ ক্ষেত্রে পুলিশের তাকে অপরাধী বলে মনে করা ও বিচারকের পক্ষে সাক্ষ্য প্রমাণাদির ভিত্তিতে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া মোটেই আশ্চর্য নয়। এই ধরণের ক্ষেত্রে গোপন তদন্ত, পুলিশের তৎপরতা ও বিচারকের অর্ন্তদৃষ্টি এই তিনটের কোনটারই কিছুটা অভাব থেকে গেলে নিরপরাধের পক্ষে শাস্তি ভোগ করবার সমূহ সম্ভাবনা থেকে যায়।

অধিকাংশ অপরাধের মূল উৎস–অভাব। তবু অভাবটাই এর একমাত্র কারণ নয়। অর্থনৈতিক বনিয়াদ সুদৃঢ় হ'লেও অপরাধ অনুষ্ঠানের অন্যান্য কারণগুলি উপস্থিত থেকে যেতে পারে ও তার ফলে সামাজিক শান্তি ও শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হ'তে পারে। অভাব দূর হবার সাথে সাথে সঙ্গদোষ তথা পরিবেশ সৃষ্ট অপরাধানুষ্ঠানও কিছু কিছু কমৰে ৰটে, কিন্তু জন্মগত ও

অভ্যাসগত কারণে অনুষ্ঠিত অপরাধের হার বড় একটা পরিবর্তিত হবে না।

অপরাধ জিনিসটা কী কী কারণে অনুষ্ঠিত হয় মোটামুটি ভাবে তা' বিশ্লেষণ করা গেলেও বা কারণগুলোর বিজ্ঞান-সম্মত ভাবে তালিকা প্রস্তুত করা গেলেও যে জিনিসটা আমাদের চোখের সামনে সব চাইতে রহস্য-ঘন ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে সেটা হচ্ছে মানব-মনের বৃত্তি বৈচিত্র্য ও তার স্থান-কাল-পাত্রগত সবলতা বা দুর্বলতা। নৃশংস ধরণের অপরাধগুলোর কারণ খুঁজতে গিয়ে আমাদের অনেক সময়ে রীতিমত বিভ্রান্ত হয়ে পড়তে হয়। অপরাধী হয়তো পূর্বলিখিত বাঁধাধরা কোন শ্রেণী-ভুক্ত অপরাধী নয়। অপরাধের গুরুত্ব বিচারে তাকে দৈবাৎ সংঘটিত বা সাময়িক উত্তেজনার বশে সংঘটিত অপরাধ বলে ক্ষমা বা উপেক্ষা করা যায় না। নৃশংসভাবে অনুষ্ঠিত অপরাধগুলোর যে কারণগুলো মোটামুটি বিচারে ধরে ফেলা যায় সেগুলো হচ্ছে-

১। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বিচার-বুদ্ধির অভাব হেতু বা উত্তেজনার আধিক্য- নিবন্ধন অনুষ্ঠিত অপরাধ;

২। বিষয়-সম্পত্তিগত রেষারেষি;

৩। মর্যাদায় গুরুতর আঘাত লাগা বা যে কোন প্রকার রিপুগত তাড়নায়;

৪। নারীঘটিত ব্যাপার ও

৫। গুরুতর মতভেদ।

যার মানসিক সরলতার অভাব আছে সে সৎ মানুষ হওয়া সত্ত্বেও উপরি–উক্ত কারণগুলোর যে কোন একটাকে অবলম্বন করে যে কোন ভীষণ রকমের অপরাধ করে ফেলতে পারে। অপরাধগুলো যে কেবল মাথা গরম অবস্থাতেই হয় তা' নয়, এক নম্বর কারণ ব্যতিরেকে বাকী কারণগুলো ঠাণ্ডা মাথার মানুষের মধ্যেও ভর করতে পারে অথবা এত দীর্ঘকাল ধরে মানুষের মাথায় চেপে থাকতে পারে যে তাকে আর গরম মাথায় অনুষ্ঠিত অপরাধ ৰলে তাচ্ছিল্য করা যায় না, হয়তো দেখা যায় যে কোন গুরুতর অপরাধের প্রস্তুতি কোন ঠাণ্ডা মাথার লোক ছ'মাস ধরে চালিয়ে গিয়েছিল আর এই প্রস্তুতি চালাবার পূর্বে তার জীবনে অপরাধ–প্রবণতার কোন ইতিহাস ছিল না। বস্তুতঃ এই শ্রেণীর অপরাধগুলো আগে যা' বলেছি–এগুলোর কারণ মানুষের মানসিক দুর্বলতার

ওপরেই নির্ভর করে। আর নৃশংস বৃত্তিগুলো ফুটে ওঠে দেশ-কাল-পাত্রগত পরিবেশ ভেদে, কোথাও ২/৪বছর পরে, কোথাও ২/৪ মিনিটের মধ্যে। যেখানে সেটা ৫/১০ মিনিটের মধ্যে জেগে উঠেই কাজ হাসিল করে চলে যায় সেখানে সেটাকে আমরা গরম মাথায় অনুষ্ঠিত অপরাধ বলে কিছুটা লঘু করে দেখি। আর যেখানে অপরাধটা বহুকাল ধরে তিলে তিলে জমে উঠেছিল অথবা সুষ্ঠুভাবে অপরাধ-অনুষ্ঠান করবার জন্যে অপরাধী স্বেচ্ছায় নেশাগ্রস্ত হয়েছিল বা অন্যকে নেশাগ্রস্ত করেছিল সেখানে তাকে ঠাণ্ডা মাথায় অনুষ্ঠিত অপরাধ বলে ক্ষমা করতে কার্পণ্য করি। আসলে অপরাধের মাত্রা দু'য়েতেই সমান ও মনস্তাত্বিক বিচারে দু'য়ের পার্থক্য অতি সামান্য।

মানুষ যেখানে, যে কোন কারণেই হোক স্বভাবগত অপরাধীতে পরিণত হয় নি, যার অপরাধের পেছনে অপরাধবোধের কোন নজীরও নেই, যে সকল নূতন অপরাধীর ক্ষেত্রে অন্য কোন রকমের অবস্থার চাপও নেই বা যাদের শরীরগত বা মনোগত কারণে কোন মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত ৰ'লে ঘোষণা করবার কোন কারণও নেই, তাদের বিরুদ্ধে সংশোধনী ব্যবস্থা নেবার প্রস্তাব কতটুকু মূল্য বহন করে- এ প্রশ্ন সমাজ-হিতৈষী ব্যষ্টিমাত্রেরই মনে জাগতে

পারে। অভিজ্ঞ বিচারক বা সমাজহিতৈষী ব্যষ্টি এরূপক্ষেত্রে সংশোধনী ব্যবস্থার পরিবর্তে শাস্তির ব্যবস্থা বা দণ্ড-বিধানই করবেন। নীতিগত বিচারে তাঁদের এই অভিমতকে মেনে না নিয়ে উপায় নেই। তবু যখন জানছি যে বৃত্তির দাস দুর্বল-মনা মানুষ দেশ-কাল-পাত্রসৃষ্ট অবস্থার চাপে পড়ে অন্যায়ে রত হয় বা হয়েছিল তখন সে অবস্থাতে তার বৃত্তিগত উন্নতি বা মনোগত দৃঢ়তা জাগিয়ে তোলাই কি সমাজের করণীয় নয়? আর এই জাগিয়ে তোলাটা দণ্ডমূলক ব্যবস্থা না সংশোধনী-ব্যবস্থা? তবে হ্যাঁ, এই সকল ক্ষেত্রে সংশোধনমূলক ব্যবস্থার অঙ্গ হিসেবে কঠোর দণ্ডেরও ব্যবস্থা রাখার প্রয়োজন আছে। তাছাড়া সংশোধনী-ব্যবস্থায় শাস্তিরও একটা বিশেষ স্থান থাকলে বৃত্তির স্রোতে ভেসে যেতে অন্ততঃ শাস্তির ভয়েও লোকে চাইবে না। এর ফলে কতকটা অবস্থার চাপে অসৎ সদাচরণে বাধ্য হবে। এতে সমাজ উপকৃত হবে ও অসৎবৃত্তিসম্পন্ন ব্যষ্টিকে সৎপথে নিয়ে যাবার সমাজসম্মত সুযোগ পাবে। নিজের বৃত্তিগত হীনতা সম্বন্ধে যে সচেতন সেও ভদ্রসমাজে ভদ্রলোকের পরিচিতি বহন করেই অন্তর্দেহেও ভদ্র হওয়ার চেষ্টায় রত হবার সুযোগ পাবে।

নিন্দাবাদ, ঈর্ষা, দলাদলি, কর্মবিমুখতা, বচন-বাগীশতা প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের সমাজগত ত্রুটি সামান্য অনুকূল

পরিবেশ পেলেই মানুষকে বড় রকমের অপরাধী করে তোলে। আধুনিক পৃথিবীতে মানুষের মধ্যে এই ত্রুটিগুলো একটু বেশী করেই দেখা যাচ্ছে, এর কারণ রাজনীতি–প্রবণতা। বিশ্বের বর্তমান রাজনীতি সেবাপরায়ণতার সঙ্গে সম্পর্ক ছেঁটে ফেলে দিয়ে সম্পূর্ণভাবে ক্ষমতা–লিপ্সুভাবের ওপরেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই ক্ষমতা– লিপ্সুভাব মানুষের মন থেকে কমিয়ে ফেলতে না পারলে আধুনিক যুগে এই কদর্য রাজনীতি–প্রবণতা সমাজ থেকে সরবে না। যে ধরণের রাজনৈতিক বৃত্তি মানুষকে ধীরে ধীরে স্বভাব–অপরাধীতে পরিণত করে চলেছে, সময় থাকতে তার থেকে সতর্ক হবার চেষ্টা মানুষকে করতে হবে আর মানব–হিতৈষী প্রতিটি মানুষকেই এ সম্বন্ধে একটি সুদৃঢ় ও সুপরিকল্পিত নীতি নিয়ে কাজে নাবতে হবে। গোটা মানুষ জাতটাই যদি স্বভাব–অপরাধীতে পরিণত হয়, পরমত–সহিষ্ণুতা হারিয়ে ফেলে, নিজের শুভ–বুদ্ধির সকল সম্পদকে প্রতিষ্ঠার মোহে বিকিয়ে দেয় তাহলে ব্যর্থ হয়ে যাবে মানুষের এই সুদীর্ঘ সভ্যতার সাধনা–ব্যর্থ হয়ে যাবে তার অস্তিত্ব–বোধের মূল্য–নির্ধারণের সমস্ত প্রচেষ্টা।

অধিকাংশ দেশেই সেখানকার ধর্মমতাশ্রয়ী (based on religion) পাপ–পুণ্য বোধের ওপরেই 'ক্রাইম' বা অপরাধের সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়। দৃষ্টান্ত–স্বরূপ ইংলণ্ডের জনসাধারণের

প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী আত্মহত্যা একটা অতিবড় পাপ, ভারতবাসীর বিশ্বাস অনুযায়ী আত্মহত্যা অপরাধ হলেও তত বড় পাপ নয় আর জাপানে জনসাধারণের বিচারে আত্মহত্যা আদৌ কোন পাপ নয়। তিনদেশের দণ্ড-সংহিতাও তাই তিন রকমভাবে তৈরী হয়েছে। জাপানে আত্মহত্যা বা আত্মহত্যার চেষ্টা কোনটাই অপরাধ নয় বা কোনটার জন্যেই দণ্ডভোগ করতে হয় না। বর্তমান ভারতে আত্মহত্যার চেষ্টা অপরাধ কিন্তু আত্মহত্যাকারীকে দণ্ডভোগ করতে হয় না। ইংলণ্ডে কিন্তু আত্মহত্যার চেষ্টাও অপরাধ ও আত্মহত্যা করাও অপরাধ ও উভয়ের জন্যেই দণ্ডভোগ করতে হয়। তাহলে দেখছি পাপ বা পুণ্যের নামে যারা চিৎকার করে আকাশ-বাতাসকে কাঁপিয়ে তোলেন, অধিকাংশ সময়েই তাঁদের চিৎকার দেশের চতুঃসীমার বাইরে গিয়ে পৌঁছায় না। বিশেষ বিশেষ ধর্মমতাশ্রয়ী বিশ্বাস বা প্রাকৃতিক বা অন্যকোন কারণে সৃষ্ট সমাজের পুঞ্জীভূত সংস্কার এ দুটোর যে কোন একটাকে বা একসঙ্গে দুটোকে কেন্দ্র করে পাপ-পুণ্যৰোধ তৈরী হয় ও এই ৰোধ যে দেশভেদে পাল্টায় তা' নয়, কাল ও পাত্রভেদেও পরিবর্তিত হয়। প্রাচীন ভারতের লোকে নির্বিকার চিত্তে অসহায়া নারীকেচিতায় জ্বালিয়ে মারতো। সেটা যে কোন পাপ বা অন্যায় কাজ এ ৰোধ তাদের মনে জাগতো না। আর তাই যারা সতীদাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন সেকালের

সূচীপত্র

ভারতবাসী তাদের সমাজদ্রোহী, দেশদ্রোহী, পাপাচরণে প্রশ্রয়দাতা বলে মনে করেছিল। আজকের পৃথিবীর একটা পরিবর্তিত যুগে বসে' সেকালের সেই মানুষগুলোর সম্বন্ধে কোন ঘৃণা বা অবজ্ঞার ভাব পোষণ করা উচিত হবে না। জোয়ান অব আর্ককে যারা পুড়িয়ে মেরেছিল তাদের তৎকালীন পাপ–পুণ্যের ধারণা অনুযায়ী হয়তো অন্যায় করেনি। আবার একই কালে, একই দেশে পাপ–পুণ্যগত ধারণা বিভিন্ন হ'তে পারে। একজন শাক্তের পক্ষে মাংসাহার মোটেই পাপ কাজ নয় কিন্তু একজন বৈষ্ণবের পক্ষে মাংস ভক্ষণ তো দূরের কথা, পশুহত্যা দেখাও পাপ। তাই যে পাপ–পুণ্যতত্ত্ব সম্পূর্ণভাবে আপেক্ষিকতার দোষদুষ্ট, তাকে চরম মনে করে গলাবাজি করা বা সম্প্রদায় অথবা রাষ্ট্রীয় বিধানের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে যাওয়া একেবারেই অর্থহীন। তাই আজকের প্রতিটি মানুষকেই এ সম্বন্ধে অত্যন্ত উদার মনোভাব নিয়ে চলতে হবে, অন্যথায় তারা পরমত–অসহিষ্ণুতা, ধর্মরক্ষা বা পুণ্য–প্রতিষ্ঠার নামে পৃথিবীকে মধ্যযুগের মত নররক্তে রঞ্জিত করতে থাকৰে। যে দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থা যেমন ধারাই হোক না কেন পাপ–পুণ্য সম্বন্ধে কোন শাস্ত্র বিশেষের নির্দেশকে চরম বলে মেনে নেওয়া কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই বাঞ্ছনীয় হবে না। আজকের এই গণচেতনার যুগে কোন রাষ্ট্র যদি এই ধরণের

ভুল করে বসে তবে তার পক্ষে অস্তিত্বরক্ষা করা একেবারেই অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

পাপ বা পুণ্য দেশ, কাল, পাত্রভেদে মানসিক বিকৃতিরই নাম বিশেষ। যে ধরণের বিকৃতিকে একদেশে বা এককালে একজন পাত্র বলছে পাপ অন্যদেশে বা অন্যকালে বা অন্য একজন পাত্র বলছে পুণ্য। এ অবস্থায় বিচার-সংহিতা কিভাবে প্রণীত হওয়া দরকার। যদি বলা হয় বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর পাপ-পুণ্য সম্বন্ধীয় ধারণার ভিত্তিতেই বিচার-সংহিতা রচনা করতে হবে তা'হলেও প্রশ্ন ওঠে যে কোন অপরাধে যদি বাদী ও বিবাদী হিসাবে দুইটি বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষ আদালতে উপস্থিত হয়, তখন বিচার- ব্যবস্থা কেমন হবে? তাই বিচার-সংহিতাকে কাদের পাপ-পুণ্য সম্বন্ধে কি ধারণা তা' ভেবে অপরাধের সংজ্ঞা নির্ধারণ করলে চলবে না। তাদের একটা moral standard এর ভিত্তিতেই কোনটা অপরাধ আর কোনটা নয় তা' বুঝে নিতে হবে। Morality বা নীতি-বিরোধী কাজ বলতে আমি সেই জিনিসটাকেই বুঝি যা ব্যষ্টি বা দলগত স্বার্থের প্ররোচনায় অন্য কোন ব্যাষ্টি, দল বা অবশিষ্ট সমাজকে শোষণ করতে চায় বা তাদের অস্তিত্ব রক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে চায়। এই ধরণের নীতিবিরোধী ভাবের ভিত্তিতে যে সকল ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়

সেগুলোই অপরাধ। ব্যষ্টি-বিশেষের, কাল-বিশেষের পাপ-পুণ্যের ধারণাটাকে চরম বলে মনে করলে আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধন ঘটাবার সুযোগ অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ও সীমিত হয়ে যায় ও তার ফলে সমাজের গতিশীলতা ৰাধাপ্রাপ্ত হয়। চরম বিশৃঙ্খলার মধ্যে তার (সমাজের) মৃত্যু ঘটে। যেমন ধারা মৃত্যু ঘটেছিল প্রাচীন মিশরীয় সমাজের, রোমক সমাজের, গ্রীক সমাজের, প্রাক-বুদ্ধ বৈদিক সমাজের। এ ধরণের সংশোধনের সুযোগ না থাকলে সতীদাহ প্রথাকে আজও বলবৎ রাখতে হ'ত, কারণ তৎকালীন সমাজের বিচারে সতীদাহ ছিল পুণ্যকর্ম। তাই বিচারশীল ব্যষ্টিমাত্রেই বিচার-সংহিতায় পরিবর্তন বা পরিবর্ধনের সুযোগ রেখে দেওয়ারই পক্ষপাতী। ভারতবর্ষেও বৈদিক-যুগের স্মৃতি-শাস্ত্র আর্য কায়েমী-স্বার্থবাহীদের প্রভাবে প'ড়ে এই পরিবর্তনশীলতা যখনই হারিয়েছিল তখনই দেখা দিয়েছিল বৌদ্ধ-বিপ্লব। এই বিপ্লবের ধাক্কা মানুষকে অনেকখানি সচেতন করে দিয়েছিল; পরবর্তীকালে তারা ৰৌদ্ধ জৈন বা অন্য যে কোন মতবাদই গ্রহণ করে থাকুক না কেন, স্মৃতিশাস্ত্রে পরিবর্তন যে কাম্য, বা যুগে যুগে পাপ-পুণ্যের ধারণা যে বদলাতে বাধ্য এ কথা তারা অকপটে স্বীকার করে নিয়েছিল। তাই পরাশর সংহিতার যুগে দেখছি এক রকমের সমাজ-ব্যবস্থা, রামায়ণের যুগে একরকম, মহাভারতের যুগে আর একরকম, আর তারপরে

মনু সংহিতার যুগে আরও ভিন্ন রকমের। যাঁরা মনে করেন কাল, দেশ, পাত্রগত পরিবর্তন বা ভিন্নতা যতই ঘটুক না কেন, রাষ্ট্রীয় শক্তির সাহায্যে জনসাধারণের ঘাড়ে খেয়াল খুশীমত বিচার–ব্যবস্থা বা বিচার–সংহিতা চাপিয়ে দেব তারা ভুল করে। বিচার–সংহিতার মূলভিত্তি হবে মানুষের সামূহিক প্রয়োজন, এতে ব্যষ্টি বিশেষের বা দল বিশেষের খেয়াল খুশীর বা পাপ পুণ্য–সম্বন্ধীয় ধারণা বিশেষের কোন মূল্যই নেই।

সমাজ একটা গতিশীল সত্তা। তাকে ক্রম পরিবর্তনশীল আবেষ্টনীর মধ্য দিয়ে সীমাহীন সংগ্রামের মাধ্যমেই এগিয়ে যেতে হয়। বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন ধরণের সংগ্রামে তাকে নিজেকে অর্থাৎ সমাজদেহকে বিভিন্নভাবে সাজিয়ে নিতে হবে। অতীতে সে যে ধরণের সংগ্রাম করেছে, ভুললে চলবে না বর্তমানের সংগ্রাম সে ধরণের নয় আর ভবিষ্যতের সংগ্রামের ধরণ নিশ্চয়ই আরো পাল্টে যাবে। এজন্যে প্রতিটি পরিবর্তিত পরিবেশেই তাকে নৈতিক বিধানের ভিত্তিতেই নব নব বিচার সংহিতা তৈরী করে নিতে হবে, যেখানে ব্যষ্টি বা দলগত প্রয়াস ব্যষ্টি বিশেষের বা দল বিশেষের বা অবশিষ্ট সমাজের অস্তিত্ব রক্ষার বিরুদ্ধে না গিয়ে জীবনধর্মের যে ধারাটিকে মেনে চলেছে, তাকে পুরোপুরি স্বীকৃতি দেওয়াই সংহিতা–প্রণেতাদের কর্তব্য, অন্যথায় তাদের সংহিতা স্বাভাবিকতার

বিরুদ্ধে যাওয়ায় হয় অপাংক্তেয় হয়ে পড়ে থাকবে অর্থাৎ রাষ্ট্রের পক্ষে তাকে যথাযথভাবে বলবৎ করা সম্ভব হবে না (যেমন শিক্ষাবিস্তার ব্যাপকভাবে হয়নি বলে ইংরেজ-আমলে ভারতবর্ষে সদ্দা আইনকে যথাযথভাবে বলবৎ করা সম্ভব হয় নি) অথবা সমাজের একটা বৃহৎ অংশ আইনগত বিচারে অপরাধী রূপে গণ্য হবার সম্ভাবনা-যুক্ত হয়ে পড়ায় তারা দণ্ড এড়াবার জন্যে মিথ্যাচার ও অন্যান্য বহু প্রকার সমাজ-বিরোধী কর্মে লিপ্ত হয়ে পড়বে অর্থাৎ কিনা সমাজের নৈতিক মান অত্যন্ত নীচে নেমে যাবে। তাই এ ধরণের সংহিতা রচিত হ'লে শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকেই তার মর্যাদা হারাতে হয়, সমাজে তাকে হাস্যাস্পদ হ'তে হয়।

মানুষ যখন কোন নৃশংস ধরণের অপরাধ করে বসে তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে জনসাধারণের সহানুভূতি হারায়। অবশ্য যে সকল কর্মানুষ্ঠান যে দেশের মানুষ সাধারণতঃ পছন্দ করে না সেই জাতীয় কর্মের বিরোধিতা করতে গিয়ে যারা নৃশংসতার আশ্রয় নেয় সেক্ষেত্রে মানুষের সহানুভূতি-অপরাধীর পক্ষেই যেতে দেখা গিয়ে থাকে। নীতিগতভাবে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা ঠিক সমর্থন করা না গেলেও অবস্থা বিশেষে মানুষ এই প্রথার সমর্থক হয়ে পড়ে। প্রথাটির মধ্যে যখন সংশোধন-মূলক ব্যবস্থা নেই, অন্যের মনে ভীতন্মন্যতা

সৃষ্টি করা ছাড়া এর যখন কোন সদুপযোগ নেই তখন কেবলমাত্র ক্রোধের বশবর্তী হয়ে মস্তকের বদলে কেবল মস্তকের নীতি নিয়ে চলা সমাজোচিত ব্যবস্থা বলে মনে হয় না। যে সত্যকারের অপরাধী, যার পক্ষে জনসাধারণের সামাজিক, মানসিক বা ঐতিহ্যগত কোন প্রকারের সমর্থনই নেই সেই মানুষের (সে যতবড় অপরাধীই হোক না কেন–সে মানুষ) সুস্থ মানুষে পরিণত হবার–সমাজের সম্পদে পরিণত হবার কোন সুযোগই থাকবে না? অপরাধের জঘন্যতার জন্যেই যার প্রতি আমাদের তিলমাত্র মমতা নেই–এও তো হ'তে পারে, সে কৃতকর্মের জন্য অত্যন্ত অনুতপ্ত; এও তো হ'তে পারে সমাজের সত্যিকারের সেবা করে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে সে উদ্‌গ্রীব। তা' ছাড়া অপরাধ যদি মানসিক ব্যাধিই হয় তবে অপরাধীর রোগের চিকিৎসা না করে তাকে হত্যা করার ব্যবস্থা চরম দায়িত্ব–হীনতার পরিচায়ক নয় কি? যে যুক্তিতে অধিকাংশ সভ্য দেশে ক্ষণিকের উত্তেজনায় অনুষ্ঠিত অপরাধের জন্য অপেক্ষাকৃত লঘুদণ্ডের ব্যবস্থা আছে, ঠিক সেই ধরণের যুক্তিতেই অন্যান্য অপরাধীরাও অপেক্ষাকৃত সদ্ব্যবহার পাওয়ার আশা করতে পারে। মাথার যন্ত্রণার জন্যে মাথা কেটে ফেলবার ব্যবস্থা সমর্থন করা যায় কি? বলা যেতে পারে এই সকল অপরাধীকে যদি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত না করা হয় তাহলে তাদের জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের ব্যবস্থা

রাখতে হয়, কারণ তাদের মানসিক ব্যাধি সারাবার উপযুক্ত ব্যবস্থা পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই নেই। কিন্তু এ ধরণের ব্যবস্থা নিতে গেলে কারাগারগুলিতে যে স্থানাভাব ঘটবে! রাষ্ট্রের পক্ষে এতগুলি লোকের অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করা কি সম্ভবপর? আমি তো বলবো সেই লোকগুলি কেনই বা রাষ্ট্রের পয়সায় খাবে, রাষ্ট্র নিশ্চয়ই তাদের কাছ থেকে যথোপযুক্ত কাজ আদায় করে নেবে ও কারাভোগান্তে তারা যাতে সমাজে গিয়ে পরিশ্রমের বিনিময়ে অর্থোপার্জনের সুযোগ পায় প্রতিটি রাষ্ট্রেরই উচিত আন্তরিকতার সঙ্গে তার ব্যবস্থা করা। তাই কারাগারগুলি হৰে ঠিক সংশোধনী বিদ্যালয়ের মত। আর কারাধ্যক্ষ হবেন সমাজ–দরদী, মনস্তত্ত্ববিদ শিক্ষক। বিচারকের যোগ্যতার তুলনায় তাই জেলরের যোগ্যতা কম হওয়া উচিত নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ দেখে বা ওপরওয়ালার মনোরঞ্জনের যোগ্যতার পরিমাপ দেখে এ পদে লোক নিয়োগ করা অত্যন্ত ক্ষতিকর। সমাজ–বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে যারা কারাগারে এসেছে তারা যদি দেখে অহরহঃ তাদের প্রতি অবিচার করা হচ্ছে, মানুষ মানুষের হৃদয় নিয়ে তাদের সাথে মিশছে না, তারা যদি দেখে সরকারী বরাদ্দের তুলনায় কম বা নিকৃষ্ট খাদ্য পাচ্ছে, সেক্ষেত্রে তাদের মধ্যে হিংসাবৃত্তি তথা অপরাধ–প্রবণতা আরও বেশী করে দেখা দেবে। এ প্রসঙ্গে আরও একটা কথা মনে জাগে। ধরুন, একজন অপরাধী

যখন অত্যন্ত নিকৃষ্ট ধরণের অপরাধে জেলে গেল তখন তার ওপর নির্ভরশীল পরিবারবর্গের কি হবে? বাঁচতে তাদের হবেই, তাই তাদের ছেলেরা হয়তো পকেটমারের দলে ঢুকৰে, মেয়েরা পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করবে অর্থাৎ কিনা একটা অপরাদীকে শাস্তি দিতে গিয়ে দশটি অপরাধী সৃষ্টি করা হয়। সুতরাং অপরাধীকে কারাগারে আটকে রাখার সময় তার পরিবারবর্গের আর্থিক অবস্থার কথা নিশ্চয়ই বিবেচনা করে দেখতে হবে ও ওই পরিবারভুক্ত লোকেরা যাতে পরিশ্রমের বিনিময়ে সৎভাবে অর্থোপার্জনের সুবিধা পায় সে ব্যবস্থা রাষ্ট্রকেই করে দিতে হবে।

বিচার-ব্যবস্থায় ষোল আনা সুযোগ-সুবিধা সাধারণকে দিতে গেলে ব্যবস্থাটিকে আর্থিক দিক দিয়ে সাধারণের পক্ষে সুগমও করে দিতে হবে। এজন্যে যে ক'টি জিনিসের বেশী দরকার তার মধ্যে একটি হচ্ছে বিভিন্ন ধরণের বিচারকের সংখ্যা আরও বাড়িয়ে দেওয়া। এ কথা পৃথিবীর মোটামুটি সৰ দেশ সম্বন্ধেই খাটে, কাজের অতিরিক্ত চাপে পড়ে চারক অনেক সময় মামলার তারিখ পেছিয়ে দিতে বাধ্য হয়। জিনিসটা যে একেবারে খারাপ তা' বলছি নে বা অনেক সময় তারিখ পেছিয়ে দেবার ফলে নিরপরাধ ব্যষ্টির সুবিধাও হয়ে থাকে, কিন্তু অপরাধীরও যে সুবিধা হয় সে সাক্ষ্য-

প্রমাণাদি নষ্ট করে দেবার সুযোগ পেয়ে থাকে বা মিথ্যা সাক্ষ্য-সংগ্রহের উপযুক্ত অবকাশও পায় এ কথা অস্বীকার করা যায় না। জনস্বার্থের খাতিরে কোথায় তারিখ পেছিয়ে দেওয়া ভাল, অভিজ্ঞ বিচারক মাত্রেই তা' বোঝেন, কিন্তু যেখানে জন-স্বার্থের প্রশ্ন জড়িত নেই সেখানে কেৰল কাজের চাপের দরুণ তারিখ পেছিয়ে দিতে কোন বিচারকেরই অন্তর সায় দেয় না। সুতরাং বিচারকের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজন যে আছে একথা অনস্বীকার্য। আবার বিচারকের সংখ্যা বাড়ানোটাও সহজ নয়; অনেক ভেবে-চিন্তে যোগ্যতা যাচাই করেই সেকাজ করতে হবে। তবে অপেক্ষাকৃত সরল ও গতানুগতিক ধরণের অপরাধের মামলাগুলির বিচার নিষ্পত্তির ভার দায়িত্বশীল নাগরিকদের হাতেও ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে। এজন্য অবৈতনিক বিচারক নিয়োগের ব্যবস্থাও মন্দ ব্যবস্থা নয়। একথা অস্বীকার করা যায় না যে এই সকল অবৈতনিক বিচারকগণকেও যথেষ্ট পরিমাণে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে। ব্যবসায়ে যারা হঠাৎ বড়লোক হয়ে উঠেছে, খোশামোদিতে যারা বিশেষ নাম করে ফেলেছে সেই শ্রেণীর লোকদের মধ্য থেকে অবৈতনিক বিচারক নিয়োগের ব্যবস্থা যে সকল দেশে আছে সে সকল দেশের জনসাধারণের কাছে এধরণের বিচারকেরা বোঝা ছাড়া আর কিছুই নয়। একবার একটা গল্প শুণেছিলুম-এই ধরণের একজন অতি-পণ্ডিত

বিচারক পেশকার কোন নাসায় নস্যি গুঁজছে সেই দেখে আসামী বা ফরিয়াদীর বিরুদ্ধে রায় লিখতেন। বলা বাহুল্যমাত্র যে পক্ষ পেশকার বাবুর বাম হস্তের ব্যবস্থা ভাল রকম করে দিতেন, রায় সেই পক্ষেই যেত। বিংশ শতাব্দীর সভ্য সমাজের মানুষ আমরা এই ধরণের ব্যবস্থাকে অতীত গল্প হিসেৰেই দেখতে চাই–বর্তমানের ব্যবস্থা হিসেবে নয়।

ঔষধের চাইতে প্রতিরোধক ব্যবস্থার গুরুত্ব অনেক বেশী একথাটা জীবনের সর্বক্ষেত্রেই সমভাবে খাটে। তথাকথিত সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে যখন দেখছি অপরাধের গতিপ্রকৃতিও বহুপ্রকারের বৈচিত্র্য গ্রহণ করে চলেছে, তখন তার বিরুদ্ধে ঔষধের ব্যবস্থার চাইতে প্রতিরোধ ব্যবস্থার চিন্তা করা যে অধিক প্রয়োজন একথা অনস্বীকার্য। কী ধরণের সংশোধনী ব্যবস্থা নিলে অপরাধীর মনের ব্যাধি দূর হবে সে চিন্তার চাইতে তাই কী ধরণের ব্যবস্থা নিলে মানুষের মধ্যে অপরাধ–প্রবণতা দেখা দেৰে না–সেই চিন্তাই আজ সভ্য মানুষকে বেশী করে করতে হবে। মানুষ আনন্দ–প্রাপ্তির আদর্শকে সামনে রেখে কাজ করে চলে, লৌকিক বিচারের সে কাজ ভাল বা মন্দ, পাপ বা পুণ্য যে নামেই গণ্য হোক না কেন! আমরা মানুষের এই কাজের ওপর ভাল বা মন্দ, পাপ বা পুণ্যের ছাপ দিয়ে থাকি তার সাধ্য ও সাধনাক্রম বিচার

করেই। একথা ঠিক যে অধিকাংশ মানুষই মাতৃগর্ভ থেকে অসাধু হয়ে জন্মায় না। দেহ-সংস্থানের গ্রন্থিগত ত্রুটি-নিৰন্ধন এই সাধ্য- সাধনায় মানুষে মানুষে পার্থক্য দেখা গেলেও কোন অবস্থাটাই যে মানুষের সামূহিক শক্তির বহির্ভূত এ ধরণের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে রাজী নই। যে যেমনই হোক সাধ্য যদি নিষ্কলুষ হয়, সাধ্য যদি ব্যাপকতার পূর্ণভাব হয়, তবে সাধনগত ত্রুটি কোন মানুষকেই মনুষ্যেতর জীবে পরিণত করতে পারে না। হ্যাঁ, এর সাথে সাধন-ক্রমও যদি মনোবিজ্ঞানসম্মত হয়, তাহ'লে তো কথাই নেই, সেক্ষেত্রে অবশ্যই বহু মানুষ তার বর্তমানের বহু ভাবকে একের ভাবনায় অনুরণিত করে একত্বের পানে চলতে চলতে সমাজ-জীবনের অভ্যন্তরীণ ব্যষ্টি-বৈষম্যকে ক্রমশঃ এক সুরধারায়, একই ছন্দে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবে, আর সেইটাই হবে সমাজের সুস্থতার সত্যিকারের নিদর্শন। এই একের ভাবনা অধ্যাত্ম-ভাবনা ছাড়া আর কিছুই নয়। সর্বানুস্যূত সমষ্টি-বোধ যে তত্ত্বে সমাহিত সেই তত্ত্বকে ও তদুপলব্ধির পন্থাকে নিজের জীবন- বেদরূপে ব্যষ্টি তথা সমষ্টি মানুষকে গ্রহণ করতে হবে। যতদিন সে তা' গ্রহণ না করছে ততদিন মানুষ জাতকে নিয়ে কোন দৃঢ়, সুসংবদ্ধ পরিকল্পনাকে রূপায়িত করা কিছুতেই সম্ভব নয়। দৃঢ়-ভিত্তিক দণ্ড-সংহিতা বা সমাজ-সংহিতা সামাজিক মুক্তি এনে দিতে পারে না। যেখানে

আধ্যাত্মিক আদর্শ নেই, সেখানে সামাজিক, অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক, বা রাষ্ট্রিক কোন নীতিই বা কোন প্রচেষ্টাই মানুষকে শান্তির সন্ধান দিতে পারবে না। এই চরম সত্য কথাটা মানুষ যত শীঘ্র ৰোঝে ততই মঙ্গল।

পাপ বা পুণ্য এ'দুটোই হচ্ছে মানসিক বিকৃতি। বিশেষ দেশ, কাল বা পাত্রে যা দোষরূপে গণ্য তাই অন্য দেশ কাল বা পাত্রে পুণ্যরূপে আখ্যাত। সাধারণতঃ সকল দেশেই তাদের দণ্ড-সংহিতা স্থানীয় অধিবাসীদের পাপ- পুণ্যৰোধের ওপরেই রচিত হয়; আর জন-সাধারণের এই পাপ-পুণ্যবোধ তৈরী হয় প্রচলিত ধর্মশাস্ত্র-সমূহের মতবাদের ভিত্তিতে। আমি তো বুঝি যা মানসিক ব্যাপকতার সহায়ক, যার সাহায্যে তুমি জগৎকে অধিক থেকে অধিকতর ভাবে আপন করে কাছে টেনে নিতে পারবে সেইটাই পুণ্য আর যা তোমাকে আত্মসর্বস্ব স্বার্থপর করে তুলৰে তাই পাপ। পুণ্যকর্মে রত ব্যষ্টির মানস-দেহ যে ভূমিতে বিচরণ করে সেইটাই স্বর্গ আর পাপাচারীর মন যে লোকে ছুটে বেড়াচ্ছে সেইটাই নরক। কোন শাস্ত্রে কোথায় কে কী বলেছে তাই নিয়ে বিচার করবার প্রয়োজন আমি দেখি না, আর তাই আমি বলি, যে কারণগুলি ভৌগোলিক পরিস্থিতির ওপর নির্ভরশীল কেৰল সেগুলি বাদে অন্যান্য সমস্ত কারণ-সঞ্জাত সামাজিক জটিলতার নিরসন বিশ্ব-

মানবের জন্যে একই আইন-কানুনে, একই দণ্ড-সংহিতার দ্বারা হওয়া উচিত। মানুষে মানুষে, দেশে দেশে, সম্প্রদায় সম্প্রদায়ে বিভিন্ন ধরণের আইন প্রচলিত থাকুক-এটা কোন-ক্রমেই বাঞ্ছনীয় নয়। সৱাই সুখে হাসে, দুঃখে কাঁদে, শোকে বুক চাপড়ায়, সৱাইকার জন্যে অন্ন-বস্ত্র-বাসগৃহের প্রয়োজন, তৱে কেন আমরা আমাদের মনগড়া হাজার রকমের ছাপ মেরে মানুষকে মানুষের থেকে পৃথক করে রাখবো।

মোটামুটি বিচারে আইন রচনার অধিকার সর্বজন-স্বীকৃত বিশ্ব-সংস্থার ওপরেই অর্পিত হওয়া উচিত। অন্যথায় যে কোন সময়, যে কোন দেশে সংখ্যালঘুর পক্ষে অত্যাচারিত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। সবাই জানে, কোন দেশে বড় রকমের রাষ্ট্র-বিপর্যয় দেখা দিলে বিপ্লবী যদি জয়ী হয়, তখন সে দেশপ্রেমিক আখ্যা পায়; আর সংগ্রামে সে যদি পরাজিত হয় তখন নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও শাস্তির খড়গ তার ঘাড়ে এসে পড়ে। সে তখন দেশদ্রোহী আখ্যা পায়। কম বেশী সকল দেশেই শক্তিমানের ইচ্ছাই আইন। তার স্বেচ্ছাচারিতা অসমালোচ্য। কিন্তু এ অবস্থাটা কি বাঞ্ছনীয়? এটা কি সভ্যতার মুখে কলঙ্ক-লেপন করে না? সুতরাং আমি বলি আইন বিশ্ব-সংস্থা কর্তৃক প্রণীত হওয়া তো অবশ্যই উচিত তা' ছাড়া মানুষকে বিচার করবার চরম ক্ষমতা সেই বিশ্ব-

সংস্থার হাতেই থাকা উচিত। বিশ্ব–সংস্থা যদি কোন দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করে, সেক্ষেত্রে অধিকাংশ দেশেরই রাজনৈতিক ক্ষমতাবর্জিত বা ক্ষমতাচ্যুত সমষ্টি বা ব্যষ্টি–বিশেষ কাগজে– কলমে ব্যষ্টি স্বাধীনতার সুযোগ পেয়েও আসলে ক্রীতদাসের জীবন যাপন করতে থাকবে।

(মানুষের সমাজ, ১ম খণ্ড)

বিভিন্ন বৃত্তি

আইন ব্যবসায়ী

বাঁচবার উপায়কেই আমরা বৃত্তি বলে থাকি; মন তার অস্তিত্ব তথা বিকাশের জন্যে যে সকল উপকরণের ওপর নির্ভর করে থাকে বা যে সকল ভাবকে তার বিষয়–রূপে গ্রহণ করে থাকে, সেগুলোই হ'ল মানসিক–বৃত্তি। যে সূক্ষ্মতম ভাবটি মানুষকে আনন্দের আবেগে বিহ্বল করে দেয় তাকে

বলতে পারি আধ্যাত্মিক বৃত্তি। ঠিক তেমনই রয়েছে বহু প্রকারের শারীরিক বৃত্তি, শরীরের অস্তিত্ব রক্ষা তথা পোষকতার জন্যে যেগুলো অপরিহার্য। লৌকিক জগতে মানুষের যে জিনিসগুলো বাঁচবার উপায়–রূপে গৃহীত হয়, সেগুলোকেই তাই বলতে পারি তাদের বৃত্তি, যেমন কেউ চিকিৎসক, কেউ শিক্ষক, কেউ ব্যবসায়ী। সামান্য একটু বিচার করে দেখতে গেলে যে কোন লোকই অতি সহজে বুঝতে পারবেন বা মানতে বাধ্য হবেন যে এই ধরণের বৃত্তিগত ভেদের কারণে মানুষে মানুষে রীতিমত ভেদ দেখা দেয়। আর ঠিক এই জন্যেই উচ্চ–আদর্শবিহীন মানুষেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজেদের দল বা group গড়ে থাকেন। এর মনস্তাত্ত্বিক কারণ হচ্ছে এই যে, যাকে যে ধরণের বৃত্তি নিয়ে থাকতে হয় তার সংবেদনও তদনুরূপ হয়ে থাকে। আর এই সংবেদনের তথা মনোবৃত্তির সহধর্মিতা তাদের দল গড়ে তুলতে প্রোৎসাহিত করে থাকে। পেশাগত কারণে ঈর্ষা বা রেষারেষি যত বেশীই থাকুক না কেন উকিল উকিলের সঙ্গ চায়, সৈনিক সৈনিকের সঙ্গ চায়, চিকিৎসক চিকিৎসকের সঙ্গ চায় আর সাধু সাধুকেই খুঁজে বেড়ায়। জীবের মনস্তাত্ত্বিক গতি–প্রকৃতিগুলির দিকে ভালভাবে নজর করলে এটাও ভালভাৰেই বোঝা যায় যে মানস–সংবেদন দৈহিক অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে জড়ের সাথে সম্পর্কিত হওয়ায় যদিও জড়াশ্রয়ী হ'তে বাধ্য

হয় তবু তার সামনে চরম আদর্শটি ঠিক থাকলে জড় ভাবগুলি মানসভাবে ও মানসভাব অধ্যাত্ম-রঙেই রঞ্জিত হয়ে যায় ও তার ফলেই দল বা group মনোভাবের ঊর্ধ্বে ওঠবার সামর্থ্য মানুষ অর্জন করে। এই আধ্যাত্মিক-আদর্শের তথা ভূমাদৃষ্টির অভাবের ফলেই বিভিন্ন বৃত্তিজীবীরা সমাজের সম্পদে পরিণত না হয়ে সমাজ-শোষকে পরিণত হয়ে থাকেন। ব্যষ্টি-স্বার্থ বা দল-স্বার্থ যে সমষ্টি-স্বার্থের বাইরেকার সৃষ্টিছাড়া কিছু নয় এ তথ্যটা তাঁরা বেমালুম ভুলে যান। প্রথমেই আইন-জীবীদের কথা ধরা যাক। যাঁরা স্পর্শকাতর অতি ধার্মিক আমি তাঁদের দলের নই। আইন- জীবীরা জনসাধারণকে ঠকিয়ে বা তাদের কলহ-প্রবণতাকে উৎসাহ দিয়ে অর্থোপার্জন করে থাকেন, এ ধরণের মনোভাবের ধারকতা বা বাহকতা আমি সত্যের অপলাপ বলে মনে করি; কিন্তু যাঁরা এই ধরণের অভিযোগ এনে থাকেন তাঁদের কথাগুলো কি ডাহা মিথ্যা? কাগজে-কলমে প্রমাণ করা না গেলেও এ কথা ঠিক যে আইনজীবীদের একটি বৃহৎ অংশ সামাজিক অশান্তিকেই কায়েম রাখতে চান। কোন একটি রাজ্যে জমিদারী প্রথা রহিত হয়ে যাবার পরে জনৈক আইনজীবী লেখককে ৰলেছিলেন যে "জমিদারী প্রথা, থাকাকালে জমিদারে-জমিদারে ও জমিদারে-প্রজায় মামলা-মোকদ্দমা প্রায়ই লেগে থাকতো আর আমাদেরও কিছু

রোজগার হত, এখন প্রজাদের আর আদালতে আসবার দরকার হয় না, দোওয়ানী-ফৌজদারী দুই-ই কমে গেছে”- এখন ভেবে দেখুন আইনজীবী ভদ্রলোক নিজের জীবিকার কথা ভেবেই কথাগুলো বলেছিলেন। ব্যষ্টিগত জীবনে তিনি খুৰই সৎ ও শান্তিপ্রিয়। কিন্তু পেশার প্রকৃতি তাঁকে অশান্তি, হানাহানি-কাটা-কাটিকে সমর্থন করতে উৎসাহ যুগিয়েছে।

অপরাধীর অপরাধের ভীষণতা জেনে-বুঝেও সুদক্ষ আইনজীবী কেবলমাত্র অর্থের লোভে নিজেদের বুদ্ধিমত্তা, তথা ভাষার মারপ্যাঁচের সাহায্যে তাদের আইনের জাল কাটিয়ে যখন বার করে আনেন, তখন তিনি আর যা'ই করুন না কেন সমাজের শুচিতা রক্ষার কাজে নিশ্চয়ই সাহায্য করেন না। কেবলমাত্র ব্যষ্টি-স্বার্থের ও অর্থোপার্জনের খাতিরে যে ব্যষ্টি সমাজকে এইভাবে পাপের পঙ্কিলতার দিকে ঠেলে দেয় সে ব্যাষ্টিও কি অন্যায়ের প্রশ্রয়দাতা হিসেবে সমান অন্যায়কারী নয়? আইনের বিচারে অন্যায়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখাও যদি অন্যায় বলে গণ্য হয় তবে অপরাধীকে সংশোধনী ব্যবস্থার (শাস্তিমূলক ব্যবস্থা কথাটি ব্যবহার করতে আমি মোটেই ইচ্ছুক নই কারণ-মানুষ মানুষকে শাস্তি দেবার অধিকারী-এ কথা আমি কিছুতেই মানতে রাজী নই) আওতা থেকে বাইরে রাখার প্রচেষ্টাও সমাজ- বিরোধী কার্য ছাড়া

আর কিছুই নয়! এই জাতীয় প্রচেষ্টার আরও একটা গুরুতর দিক রয়েছে, আর সেটা হচ্ছে সংশোধনী ব্যবস্থার হাত থেকে অপরাধীর অব্যাহতি পাওয়াতেই বিচারের পরিসমাপ্তি হয় না– অনেক সময় নিরপরাধকে শাস্তিভোগ করিয়েই প্রকৃত অপরাধীর প্রবক্তা আত্মতৃপ্তির পথ খুঁজে পান। নিরীহ ব্যক্তির শাস্তি–ভোগের যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে কারণ–স্বরূপ হন তাঁদের অপরাধ নিশ্চয়ই আসামীর অপরাধের চাইতে বহুগুণ বেশী।

তবু আমি বলৰো সমাজে আইনজীবীর প্রয়োজন রয়েছে আর এই প্রয়োজনের গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। সাধারণ মানুষ নিজের বক্তব্য অনেক সময়েই গুছিয়ে বলতে পারে না। বিচারকালে ভীত–সন্ত্রস্ত মানুষ এমন আচরণ করে ফেলে যে, তার চোখ–মুখের ভাব বিচারকের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করে ও ওঁর সেই সন্দেহ তাঁর রায়কেও প্রভাবিত করে। সাধারণ মানুষকে এ ধরণের বিপজ্জনক পরিস্থিতি থেকে বাঁচানোর কাজে আইনজীবীর আবশ্যকতা অনস্বীকার্য। শুধু নিরপরাধকে রক্ষা করাই নয়, অপরাধীকেও ঘৃণা তথা উগ্র পক্ষপাতপূর্ণ ভাবাধারা সঞ্জাত অবিবেকোচিত রূঢ় শাস্তি–ব্যবস্থার হাত থেকে বাঁচাৰার কাজে এই আইনজীবীরা বিশেষভাবে সাহায্য করে থাকেন বা করতে পারেন।

অপরাধীকে সমর্থন করা যদি সমাজ-বিরোধী কাজ হয় সেক্ষেত্রে অপরাধীর প্রতি সমাজের সুবিবেচনার আবেদন জানানো কি সমাজ-বিরোধী কাজ নয়? আমি বলব-না। আইনজীবীর কর্তব্য হ'ল এইটে দেখা যে কারও যেন লঘুপাপে গুরুদণ্ড না হয়। অপরাধী যে ধরণের অবস্থার চাপে পড়ে অপরাধে প্রবৃত্ত হয়েছিল সেইটেই বুঝিয়ে বলা ও সেই অবস্থাসৃষ্টির ব্যাপারে অপরাধী নিজে কতটুকু দায়ী (অথবা সে আদৌ দায়ী নয়) এই কথাটা ঠিকভাবে বিচারকের সমক্ষে পেশ করতে একমাত্র আইনজ্ঞরাই পারবেন, এ কাজ সাধারণের নয়। অপরাধীও মানুষ ও বিচারকালে সে একজন অসহায় মানুষ-এই কথাটা মনে রেখে তার পক্ষের বক্তব্যগুলি ঠিকভাবে উপস্থাপিত করে দেওয়া নিশ্চয়ই অপরাধ নয়। আইনজীবীকে যাঁরা সমাজের পরগাছা বলেন তাঁদের সমর্থন করা এইজন্যেই আমি অন্যায় বলে মনে করি। আইনজীবীরা সমাজের অতি-প্রয়োজনীয় বুদ্ধিজীবীদেরই একাংশ। উকিলের খরচ কমানোর জন্যে যাঁরা বিভিন্ন ধরণের সালিশী বা পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে আগ্রহশীল তাঁদের উদ্দেশ্যের সাধুতায় সংশয় প্রকাশ না করেও ৰলৰ যে তাঁরা প্রকারান্তরে বিচার-ব্যবস্থাকে ব্যষ্টি বা দল বিশেষের খেয়ালের ওপর ছেড়ে দিতে চলেছেন। বিচারে যে সূক্ষ্ম মনীষার প্রয়োজন এই ধরণের সালিশীর সদস্যদের বা পঞ্চায়েতের প্রধানদের

অধিকাংশের মধ্যেই তা' আশা করতে পারি না। পঞ্চায়েত বা সালিশীর সদস্য নির্বাচনের ভার যদি অভিজ্ঞ বিচারকদের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে তাদের কাছ থেকে হয়তো বা কিছুটা সুবিচার আশা করতে পারি, কিন্তু সেক্ষেত্রেও তাদের ব্যষ্টিগত সাধুতা বা বিচার শক্তি থাকা সত্ত্বেও আইন–শাস্ত্রে উপযুক্ত জ্ঞানের অভাবে যে কোন মুহূর্তে তারা ত্রুটিপূর্ণ রায় দিতে পারে। ততটা ত্রুটি হয়তো আইনজ্ঞদের কাছ থেকে আসা করতে পারি না। আইন–ব্যবসায়ীগণকে জব্দ করার উদ্দেশ্যে যদি কেউ ব্যাপকভাবে সালিশী বা পঞ্চায়েত–প্রথা প্রবর্তন করতে চান তাঁকেও জনস্বার্থের পানে চেয়ে ওই পদগুলি যে নির্বাচিত পদ না হয়ে মনোনীত পদ হওয়া উচিত এ কথা মানতেই হবে। অবশ্য নির্বাচনপ্রার্থী কেবলমাত্র আইনজ্ঞরাই হ'তে পারবেন– এ ধরণের ব্যবস্থাও মন্দ নয়।

একদিন ছিল যখন আইনজ্ঞদের সম্মান ও অর্থ দুই–ই ছিল। আজ অর্থের সাথে সাথে সম্মানও তাঁরা হারাতে বসেছেন। ব্যবসায় যাঁদের ভাল চলে না, সব ক্ষেত্রে না হোক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, সেই সকল আইনব্যবসায়ীরাই রাজনৈতিক মঞ্চে গরম বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করেন। এঁদের মধ্যে জনসেবক যে একজনও নন–এমন কথা বলছি না তবু অধিকাংশেরই উদ্দেশ্য দেশ–সেবা নয়, সম্পূর্ণভাবে ব্যষ্টিগত

সমস্যার সমাধান করা। রাজনৈতিক প্রতিপত্তি জুটল ভালই, মন্ত্রী বা পার্লামেন্টের সদস্য হওয়া যাবে; প্রতিপত্তি যদি নাও জোটে ক্ষতি নেই, পিছনে একটা বিশেষ রাজনৈতিক দলের সমর্থন থাকায় ব্যবসায়ে কিছুটা সুরাহা হবেই হবে। এদের গরম গরম বক্তৃতার উদ্দেশ্য যে কতটা মহৎ তা' আর বুঝতে আজকালকার শিক্ষিত জনসাধারণের বিশেষ অসুবিধা হয় না। একটু ভাল করে তাকালেই দেখা যাবে যে গণতান্ত্রিক দেশগুলোর রাজনীতিতে তাই এই 'ব্রীফলেস' আইনব্যবসায়ীদের ভীড়। জনস্বার্থের ধুয়া তুলে জনসাধারণকে শোষণ করবার এমন সুযোগ আর অন্য কোন বৃত্তিজীবীরই নেই।

কিন্তু এর কারণ কি? এই ধরণের কপটাচরণ বা মানসিক অধোগতির জন্যে তারা নিজেরাই কি যোল-আনাই দায়ী? নিশ্চয়ই নয়। আমি এ জন্যে তাদের এক আনা দোষও দিই না। অভাবগ্রস্ত বুদ্ধিজীবীরা সাধারণতঃ চুরি-ডাকাতি না করে এই ধরণের মনস্তাত্বিক পদ্ধতিতেই গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করে নেয়।

সমাজের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যান্য পরিকল্পনার রূপায়ণের সাথে সাথে আইন-ব্যবসায়ে ভীড় কমানোর ব্যবস্থাও নিতে হবে। শিক্ষণ-ব্যবস্থায় বিজ্ঞান ও কারিগরি-

শিক্ষাকে সর্বাগ্রে, বাণিজ্যকে তারপর ও কলাশিক্ষায় তার চাইতেও কম উৎসাহ ছাত্রদের দিতে হবে অর্থাৎ কলাশিক্ষায় (Arts subject) আগ্রহশীল ছাত্রদের মধ্যে যারা খুব বেশী মেধাবী কেবল তাদেরই সুযোগ দিতে হবে ও তাদের মধ্য থেকে একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশকে–সমাজতত্ত্ব, পৌরতত্ত্ব, রাষ্ট্র-বিজ্ঞান ও তর্কশাস্ত্র সম্বন্ধীয় বিধানে পারদর্শিতা দেখালে আইন পড়বার সুযোগ দিতে হবে। কোন রকম বাদ–বিচার না করে যে কোন ছাত্রকে আইন পড়বার সুযোগ দিয়ে এই ব্যবসায়ে অযথা ভীড় বাড়িয়ে দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেওয়া কিছুতেই বাঞ্ছনীয় নয়।

চিকিৎসক

"শতমারী ভবেৎ বৈদ্যঃ সহস্রমারী চিকিৎসকঃ।"

কথাটা শুণে হাসি পায়, রাগও হয়–তবুও কথাটা সত্য। বুড়ো নাপিতের মত ছোকরা ডাক্তারকেও বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু অভিযোগের শেষ এইখানেই নয়। মারণ–কার্যটা ইঁদুর বা গিনিপিগের ওপর চালিয়ে গিয়েও শতমারী বা

সহস্রমারী হওয়া সম্ভব। কিন্তু বৈদ্য বা চিকিৎসক হয়ে যাওয়ার পরেও যদি মারণকার্য চলতে থাকে তবে সেটা খুবই সাংঘাতিক কথা নয় কি? আপনি পৃথিবীর যে কোন দেশের অধিবাসী হোন না কেন ক'জন ডাক্তারের ওপর বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা রেখে চলতে পারেন বলুন দেখি? আপনার পরিচিত অনেক ডাক্তারের মধ্যে বড়জোর এক-আধজনের ওপর আপনার আস্থা আছে। যাদের ওপর আস্থা আছে তাদের ওপরেও শ্রদ্ধা আপনার থাকতে পারে আবার না-ও থাকতে পারে অর্থাৎ কিনা যে ডাক্তারের কাছে আপনার রোগী সেরে উঠতে পারতো বলে আপনার ধারণা অর্থাভাবে ডাক্তারের কাছে আপনি চিকিৎসা করাতে পারলেন না। এ অবস্থায় ডাক্তারের যোগ্যতায় আপনার আস্থা হয়তো ঠিকই রইলো কিন্তু তাকে আপনার বন্ধু ৰলে নিশ্চয়ই আপনি ভাবতে পারলেন না, বা তার মানবতা ৰোধ সম্বন্ধে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়ার সুযোগ পেলেন না আর তাই তাকে শ্রদ্ধাও করতে পারলেন না। অথচ ডাক্তারের পেশাটা এমনই যে এতে যতটা না পেশা তার চাইতেও বেশী রয়েছে সমাজ-সেবা। সমাজসেবাটাই এতে মুখ্য কথা, তবে সমাজ-সেবকেরা তো আর বায়ুভুক্ হয়ে বেঁচে থাকতে পারে না-তাই তাকে সরকার, স্বায়ত্ত-শাসিত প্রতিষ্ঠান, জনকল্যাণকারী সংস্থা অথবা জনসাধারণের অর্থাৎ তার সেব্যদের কাছ থেকে

নিজের গ্রাসাচ্ছাদন বাবদ কিছুটা অর্থ গ্রহণ করতেই হয়। চিকিৎসকের কাজ তাই অন্য কোন জীবিকা-বিহীন ব্যক্তির কাছে জীবিকা হ'তে পারে কিন্তু তাকে কিছুতেই ব্যবসায় পর্যায়ভুক্ত করা যেতে পারে না। অসহায় মানুষ তার আর্থিক, সামাজিক বা ৰৌদ্ধিক যত সম্পদই থাকুক না কেন, চিকিৎসককে সে দেখে থাকে অন্ধকারে আলোকরশ্মির মত, ডুবন্ত অবস্থায় 'লাইবেল্টে'র মত-এই আদর্শবাদ, এই কর্তব্য-নিষ্ঠা ক'জন চিকিৎসকের মধ্যে দেখতে পান!

কোনো ডাক্তারের কাছে যান, তিনি আপনাকে লঘুরোগে গুরু 'প্রেসক্রিপসন' দেবেন। নিজের 'ডিস্পেন্সারী' থাকলে তো কথাই নেই; 'চেম্বার-প্রাক্টিস্' করলেও সেই একই কথা-রোগীর ঘাড়ে কিছু 'পেটেন্ট' ওষুধ চাপিয়ে দিতেই হবে। 'মিকশ্চার' যে থাকৰে না তা' নয়, কারণ সেটা তো একটা বাঁধা গৎ। আমি অবশ্য এখানে 'এ্যালোপ্যাথ'দের কথাই বিশেষ করে বলছি, আর সৰ চাইতে মজার কথা হ'ল এই যে এঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে রোগটা ধরেন কেবলমাত্র আন্দাজের ওপর। রক্ত-মল-মূত্র প্রভৃতি পরীক্ষার পরে প্রায়ই দেখা যায় যে তাঁদের এই আন্দাজটা সম্পূর্ণভাবেই ভুল হয়েছিল। অথচ তাঁদের এই আন্দাজের খেয়াল মেটাতে গিয়ে রোগীকে ঔষধের পর ঔষধ গলাধঃকরণ করতে হয়। অবস্থাটা কতখানি

শোচনীয় বলুন দিকিনি! অসহায়কে নিয়ে এ কী ধরণের রসিকতা!

বর্তমান পৃথিবীর প্রচলিত চিকিৎসা–রীতিকে মোটামুটি তিনটে শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। প্রথমে সর্বাধিক প্রচলিত হচ্ছে স্থূলভাবে ঔষধ ব্যবহার করে বা সূচিকা প্রয়োগ করে রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। 'এ্যালোপ্যাথী', আয়ুর্বেদ ও 'হেকেমী', তিনটেই এই পর্যায়ে পড়ে। কারণ রোগ–নির্ধারণ বা নিদান সম্বন্ধে এদের মতভেদ থাকলেও স্থূলভাবে ঔষধ ব্যবহার ও ঔষধ হিসেবে বিষের ব্যবহার এ তিনের মধ্যেই খুব প্রচলিত। কিন্তু রোগীর লক্ষণের দিকে না তাকিয়ে রোগের লক্ষণকেই মুখ্যভাবে দেখার ফলে এদের ঔষধ নির্ধারণ কার্যে রীতিমত ঝুঁকি নিতে হয়। অন্যান্য ব্যাপারে ঝুঁকির চাইতে ঔষধ ব্যবস্থার ঝুঁকিতে বিপদের মাত্রা অনেক বেশী, কারণ এর সাথে জড়িয়ে রয়েছে–মানুষের জীবন–মরণের সমস্যা।

রোগ–জীবাণুর ওপরে নির্ভর করে অথবা রোগের ওপর নির্ভর করে ব্যবস্থাপত্র দেওয়ায় সৰ চাইতে বড় বিপদ হচ্ছে এই যে জীবাণুর স্বরূপ নিয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছানো প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। তাছাড়া জীবাণুর ফলে রোগ হয়, না

অন্য কোনো কারণে রোগ সংক্রমিত হওয়ার ফলে এই রোগ-জীবাণুর সৃষ্টি হয়- এটা একটা তর্কের জিনিস।

রোগের বাহ্যিক লক্ষণ একাধিক রোগের একই রকম হ'তে পারে। সুতরাং এক রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রামার্থ প্রস্তুত ঔষধ অন্য রোগে একেবারেই নিষ্ফল প্রমাণিত হ'তে পারে অথবা তা' অন্য রোগের পক্ষে ক্ষতিকর বিবেচিত হতেও পারে, তার ওপরে আবার ঔষধার্থে বিষের ব্যবহার থাকায় তা'তে করে রোগীর জীবনী-শক্তির ওপরেও বড় রকমের আঘাত লাগতে পারে। এখন ভাবুন দেখি চিকিৎসকের মধ্যে যদি যোগ্যতার অভাব থাকে বা তিনি যদি সম্পূর্ণভাবে ব্যবসাদারী মনোভাব দ্বারা পরিচালিত হন তবে জনসাধারণের অবস্থাটা কী ধরণের হয়ে উঠতে পারে। বায়ু-পিত্ত-কফাদিগত ভাবে রোগ-নির্ধারণ অথবা তৎসহ রক্তকেও একটি ধাতু হিসাবে গ্রহণ করে রোগের নিদান বা ব্যবস্থাপত্র দিতে এককালে হয়তো অসুবিধা হ'ত না, কিন্তু মানুষের শরীর তথা গ্রন্থিগত জটিলতা বাড়ার সাথে সাথে রোগের জটিলতাও বেড়েছে, রোগের সংখ্যাও বেড়েছে। তাই ত্রিদোষ বা চতুর্দোষগত রোগ নির্ধারণ প্রথা এখন চিকিৎসককে কতটুকু সাহায্য করতে পারে তা' সহজেই অনুমেয়। ঔষধ যেখানে রোগগত হিসাবে প্রযুক্ত হচ্ছে অথচ ব্যাধি নির্ধারিত হচ্ছে ধাতুগত বিচারে সেখানে যে কোন

বিশেষ একটি রোগের বিরুদ্ধে ঔষধ প্রয়োগ করতে যাওয়া কতকটা আন্দাজে ঢিল ছুঁড়তে যাওয়া নয় কি? ঠিক এই কথাটা কোনো 'এ্যালোপ্যাথ', কবিরাজ বা 'হেকিমের' কাছে বলতে গেলে হয়তো তাঁরা 'ষ্টেথিস্কোপ' বা খলনুড়ি আপনার হাতে তুলে দিয়ে বলবেন- "মশাই! চিকিৎসাটা তাহ'লে আপনিই করুন।" এটা অবশ্য রাগের কথা হ'ল। কোন চিকিৎসককে পরামর্শ দেবার ধৃষ্টতা যে কোন সাধারণ লোকের থাকা উচিত নয় একথাটা অবশ্যই স্বীকার করব, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে একথাটাও অবশ্যই বলব যে, যে কোন চিকিৎসা-পদ্ধতির দোষগুণ বিচার করার অধিকার প্রতিটি মানুষেরই আছে।

'হোমিওপ্যাথিক' চিকিৎসা প্রথমোক্ত পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক- নীতিগতভাবে, প্রয়োগে তথা দার্শনিকতায়। 'হ্যোমিওপ্যাথিক' চিকিৎসা রোগের বা রোগ-লক্ষণের চিকিৎসা নয়-রোগী-লক্ষণের চিকিৎসা। তাই এতে রোগ-নির্ধারণ (diognosis) যথাযথভাবে না হ'লেও কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। সূক্ষ্ম বিচার-বুদ্ধি ও তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি এই দুটো জিনিস মজুদ থাকলে চিকিৎসক রোগীর লক্ষণ দেখে তাকে ব্যবস্থাপত্র অনায়াসেই দিতে পারেন। 'হোমিওপ্যাথি'র অপর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে এতে ঔষধ সূক্ষ্মমাত্রায় প্রযুক্ত হয়, স্থূলমাত্রায় নয় ও

তা সহজেই রোগীদেহের অণু-পরমাণুতে তথা মানস- ভূমিতে ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে।

কিন্তু 'হোমিওপ্যাথি' চিকিৎসার সব চাইতে বড় বিপদ হচ্ছে এই যে, যে সূক্ষ্ম মনীষার ওপরে এর প্রতিষ্ঠা সে মনীষা অর্জন করতে একটা রীতিমত সাধনার দরকার। অথচ 'হোমিওপ্যাথি' চিকিৎসার ক্ষেত্রে চিকিৎসকের যোগ্যতার বিচারে সব চাইতে বেশী শৈথিল্য প্রকাশ করা হয়। যে কেউ দু'খানা বই নিয়ে চিকিৎসক সেজে বসে পড়তে পারেন-বলবার কইবার কেউ নেই, অধিকাংশ দেশেই এর নিয়ন্ত্রণেরও কোন সুব্যবস্থা নেই।

'হোমিওপ্যাথিক' দর্শন মতে শল্য-চিকিৎসা বা সূচিকা-প্রয়োগও স্বীকার করা চলে না অথচ অবস্থাবিশেষে সূচিকা প্রয়োগের না হোক শল্যকরণ ও বিশল্যকরণের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। আজকাল অবশ্য "হোমিওপ্যাথি' চিকিৎসায় শল্যকরণের প্রয়োজন ধীরে ধীরে স্বীকৃত হচ্ছে। এটা যে খুবই শুভ লক্ষণ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

প্রাকৃতিক চিকিৎসকেরা ঔষধরূপে কোন কিছুই গ্রহণ করতে নারাজ। তাঁদের মতে প্রকৃতি-প্রদত্ত মৃত্তিকা, জল,

আলোক, উত্তাপ, বায়ু প্রভৃতির সাহায্যে তথা উপযুক্ত পথ্য নির্বাচনের দ্বারাই ব্যাধিমুক্তি সম্ভব। এর সম্ভাব্যতাকে অস্বীকার করছি না। তবে একথাটাও ঠিক যে এইভাবে ধীরে ধীরে দেহযন্ত্রকে সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতি-অনুগ করতে অনেক ক্ষেত্রেই বেশ একটু বেগ পেতে হয়। একথা সর্ববাদীসম্মত যে রোগ ঔষধে সারে না-রোগ সারায় প্রকৃতি, তার স্বাভাবিক রোগ নিরামক-শক্তির সাহায্যে। ঔষধ তার এই ক্রিয়াশীলতাকে সাহায্য করে ও দ্রুতি যোগায়। যেক্ষেত্রে প্রকৃতি-বিরোধী কাজের ফলেই এই রোগের উদ্ভব, সেক্ষেত্রে প্রকৃতিকে সাহায্য করবার জন্যে আবশ্যকতাবোধে যদি ঔষধ ব্যবহার করা হয় তাতে দোষের কি থাকতে পারে বুঝতে পারছি না। মৃত্তিকা, জল, বায়ুর মত ঔষধগুলোও কি প্রাকৃতিক উপকরণে সৃষ্ট নয়? তবে হ্যাঁ, রোগ নিরামক শক্তির সাহায্যকারী হিসাবে ঔষধ ব্যবহারকালে অবশ্যই সতর্কতা নিতে হবে, যাতে করে এই ঔষধ সাহায্যকারীর ভূমিকায় নেমে পরবর্তী কোন দৈহিক বিকলতা বা অস্বস্তির কারণ ফেলে রেখে যেতে না পারে। এমনও অনেক রোগ হ'তে পারে যাতে ব্যষ্টি বিশেষ প্রাকৃতিক শক্তির বিরুদ্ধাচরণ করে নি, রোগ এসেছিল বায়ু, মৃত্তিকা, জলের দোষে-এ ধরণের ক্ষেত্রে রোগীকে প্রকৃতি-অনুগ করার প্রশ্ন ওঠে কি? তাছাড়া প্রাকৃতিক চিকিৎসায় রোগীর জন্যে

যে সকল খাদ্য বা মালিশের ব্যবস্থা দেওয়া হয় অনেক ক্ষেত্রে তা' রীতিমত ব্যয়সাপেক্ষ অর্থাৎ তা' দরিদ্রের জন্যে নয়।

"আপশ্চ বিশ্বভেষজী"–ঋগ্বেদের এই উক্তির সঙ্গে আমার কোন মতভেদ নেই। জল–চিকিৎসা (Hydropathy) ও প্রাকৃতিক চিকিৎসার অন্যান্য প্রতিটি অঙ্গের প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করি। তবে ঔষধ মাত্রেই খারাপ বা শল্যকরণ মাত্রেই ক্ষতিকর এ ধরণের মতবাদের পেছনে আমি কোন যুক্তিই খুঁজে পাইনা। "বিনা চিকিৎসায় যত লোক মরে, তার চাইতে বেশী লোক চিকিৎসায় মরে"–একথাও মানতে আমি প্রস্তুত নই, কারণ রোগের চরম অবস্থাতে অতি দরিদ্র মানুষও কিছুটা চিকিৎসার ব্যবস্থা করে বা করবার চেষ্টা করে। ঔষধ ব্যবহার না করে যত লোকের মৃত্যু হয় তদপেক্ষা ঔষধ ব্যবহার করে অধিক লোক মরে এ ধরণের উক্তি সম্বন্ধে আমি কোন মন্তব্য করা উচিত মনে করি না। তবে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হবার পরেও যাদের মৃত্যু হয় তাদের একটা অতি বৃহৎ অংশ যে রোগ– নির্ধারণের বা ঔষধ–নির্বাচনের ত্রুটির ফলেই মৃত্যুমুখে পতিত হয় এতে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না। রোগ–নির্ধারণের ত্রুটির অপৰাদ সকল 'প্যাথি'কেই সমানভাবে নিতে হবে। তবে ঔষধ–নির্বাচনের ত্রুটির ফলে যে সকল মৃত্যু সংঘটিত হয়

তার জন্যে আমার মনে হয় স্থূলমাত্রায় ঔষধ ব্যবহারকারীদেরই ত্রুটির মাত্রা সমধিক।

কোন 'প্যাথি'-বিশেষের দার্শনিকতায় বা যুক্তির সারবত্তায় বেশী গুরুত্ব আরোপ না করে রোগীর কল্যাণটাই কিৎসাবিদের মুখ্য লক্ষ্য হওয়া উচিত। চিকিৎসক-বিশেষের পক্ষে এই ধরণের নীতি নিয়ে কাজ করতে কিছুটা অসুবিধা হ'তে পারে কারণ সবাই সব বিষয়ে চিকিৎসায় অভিজ্ঞ হবেন-এ ধরণের আশা করা চলে না ও বাস্তবক্ষেত্রে সেটাকে খুব সম্ভবও বলতে পারি না। তবে চিকিৎসক-বিশেষের 'চেম্বারে' যা' সম্ভব নয় হাসপাতালে তা' সম্ভব হ'তে পারে ও পৃথিবীর কোন কোন দেশে এই রোগী- কল্যাণকে প্রধান লক্ষ্য ধরে নিয়ে হাসপাতালগুলোতে কাজও করা হয়ে থাকে। হাসপাতালে রোগী আসার সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বোর্ডের দ্বারা যথোচিতভাবে রোগীকে পরীক্ষা করে নিয়ে তারপর ওই বোর্ডই রোগীবিশেষ সম্বন্ধে উপযুক্ত 'প্যাথি'-র ব্যবস্থা করে দেয় অর্থাৎ কিনা যে রোগ এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসায় অল্পায়াসে দূর করা সম্ভব সে রোগীকে 'এ্যালোপ্যাথিক' চিকিৎসাধীনে রাখা, অনুরূপ ভাবে কাউকে 'হোমিওপ্যাথ', কাউকে বা Naturopath (প্রাকৃতিক চিকিৎসক) এর দ্বারা চিকিৎসা করা যেতে পারে। পাশাপাশি বিভিন্ন ধরণের চিকিৎসার সুযোগ থাকায় কোন বিশেষ

ধরণের রোগী যথোপযুক্ত উপকার না পেলে তার পক্ষে চিকিৎসা পদ্ধতির পরিবর্তন করা অসম্ভব হয় না বা হবে না।

রোগ সারায় প্রাকৃত শক্তি, ঔষধ তাকে সাহায্য করে মাত্র। আর এই প্রাকৃত শক্তিকে তার কর্তব্য সম্পাদনে রোগীর মন বহুলাংশে সাহায্য করে। যে চিকিৎসকের ওপর বিশ্বাস আছে, সে যদি ঔষধ বলে জলের ব্যবস্থাও দেয় তাতে রোগী নির্দোষে সেরে যায়, আর যাকে অর্বাচীন বলে মনে করা হয়, সে যদি চিকিৎসা শাস্ত্রের নির্দেশমত বিশুদ্ধ ঔষধেরও ব্যবস্থা দেয় তাতেও রোগ সারে না। বুঝতে হবে এক্ষেত্রে মনের গুণেই রোগ সারছে, ঔষধ হয়ে দাঁড়াচ্ছে একেবারে গৌণ জিনিষ। যে নকল গোঁড়া মনস্তত্ত্ববিদ্ মনে করেন যে মানসিক চিকিৎসাতেই সব রোগ সারে আমি তাঁদের সমর্থন করতে পারি না, কারণ মানসিক চিকিৎসাক্রম সর্বক্ষেত্রে কাজ দেয় না বা দিতে পারে না। ভাববাদীদের মত যারা মনে করে মনই সর্বস্ব, পঞ্চভূত নেই (যাঁদের সম্বন্ধে লেনিন বলেছেন–এদের মতে মাথা নেই কিন্তু বুদ্ধি আছে) তাঁরা সকল রোগেরই কারণ স্বরূপ মনের কথাই বলে থাকেন, কিন্তু মানুষের অস্তিত্ব কি কেবল মন নিয়েই? পাঞ্চভৌতিক দেহে একটা চিমটি কাটলে যে মন চঞ্চল হয়ে ওঠে সে মন কি

পাঞ্চভৌতিক দেহের ওপর নির্ভরশীল নয়? সিদ্ধি, গাঁজা, আফিং বা মদ্য ব্যবহারের ফলে মনে অদ্ভুত ধরণের পরিবর্তন দেখা দেয়। দেহ তথা স্নায়ুরজ্জুর ওপর মনের নির্ভরশীলতার এটা একটা প্রমাণ। তাই রোগ যেমন মনেরও হ'তে পারে, দেহেরও হ'তে পারে, ঔষধ তেমনিই মানসিকও হ'তে পারে আবার পাঞ্চভৌতিকও হ'তে পারে আর শারীরিক ও মানসিক নির্বিশেষে সকল রোগের পক্ষেই উভয় প্রকার ঔষধেরই একত্র প্রয়োগ অধিকতর বাঞ্ছনীয় ও ফলপ্রসূ। মানসিক রোগে কেবলমাত্র মানসিক চিকিৎসার যারা পক্ষপাতী তারা নিজেদের অভিজ্ঞতায় এটা নিশ্চয়ই বোঝেন যে তাদের ব্যবস্থায় স্থায়ীভাবে রোগ নির্মুক্তি হয় না। অল্পদিন পরেই রোগের পুনরাবির্ভাব ঘটে। কিন্তু যেক্ষেত্রে মানসিক ব্যবস্থার সাথে সাথে ঔষধ পথ্যাদিগত ব্যবস্থা তথা স্নানাহার ও আচরণগত সংযমের ব্যবস্থা দেওয়া হয় ও মানসিক ব্যাধির কারণ স্থূলভাবে যে সকল দেহ-গ্রন্থিতে নিহিত ছিল তাদের মধ্যে স্বাভাবিকতা আনবার জন্যে যথোপযুক্ত পঞ্চভূত সঞ্জাত ঔষধের ব্যবস্থা দেওয়া হয়, কেবল সেই ক্ষেত্রেই রোগের আত্যন্তিকী নিবৃত্তি হয়ে থাকে।

ঠিক তেমনিই শারীরিক ব্যাধিতে রোগীর জন্যে যদি উপযুক্ত ঔষধ-পথ্য ও আলোক-বাতাসের ব্যবস্থা দেওয়া হয়,

কিন্তু তাকে যদি অহরহঃ লাঞ্ছনা–গঞ্জনার মধ্যে বাস করতে হয় সেক্ষেত্রে তার রোগ সেরেও সারে না। চর্ব্য–চোষ্য–লেহ্য–পেয় কোন কিছুরই যার অভাব নেই, সেও মানসিক শান্তিতে কীটদষ্ট ফুলের মত শুকিয়ে যায় অর্থাৎ স্থূল–রোগেও চাই উপযুক্ত মানসিক চিকিৎসা বা মানসিক সুস্থতা–রক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ।**রোগ সারাতে ঔষধ** যতখানি কাজ করে তার চাইতে বেশী কাজ করে রোগীর বিশ্বাস। কিন্তু এই বিশ্বাস রোগীর আসৱে কোত্থেকে? চিকিৎসক তথা নার্সকে তাদের কার্য ও আচরণের দ্বারাই এই বিশ্বাস অর্জন করে নিতে হবে বা রোগীর মনে এই বিশ্বাস জাগিয়ে দিতে হবে। মাটি–কাটা মজুর মাটি–কাটা কাজটাকে তার জীবিকা বলে মনে করে ও মাটির ওপর কোন মমত্ব–ৰোধ না রেখেই কোদাল চালিয়ে যায়, চিকিৎসক–রোগীর সম্পর্ক ঠিক তেমনিই হ'লে চলবে না। চিকিৎসকের পক্ষ হ'তে রোগীকে গ্রহণ করতে হবে মনের সমস্ত মাধুর্যটুকু দু'হাতে করে বাড়িয়ে দিয়ে। চিকিৎসক বা নার্স যদি বলেন, অতিরিক্ত কাজের চাপের জন্য আমাদের মনের সমস্ত সৌকুমার্য, সমস্ত পেলবতা, সমস্ত মাধুর্যই হারিয়ে গেছে, সেটা দেশের তথা সরকারের পক্ষে নিশ্চয়ই খুব গৌরবের জিনিস হবে না।

কাজের চাপে নিষ্ঠুর যন্ত্রে পরিণত হওয়া আর মনুষ্যত্ব খুইয়ে অসাধু ব্যবসায়ীর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে হাসপাতালের

ঔষধ কালোবাজারে ছেড়ে দেওয়া, রোগীর জন্যে বরাদ্দ খাদ্য, ফল, দুধ অবৈধভাবে কাজে লাগানো–এগুলো নিশ্চয়ই এক জিনিস নয়। যে সকল চিকিৎসক বা নার্সের বিরুদ্ধে জনসাধারণ এই ধরণের অভিযোগ এনে থাকেন, তাঁদের আত্মপক্ষ সমর্থনে কিছু থাকে কি? এই সকল অসাধু, সমাজশোষক, পিশাচদের কার্যে বিরক্ত হয়ে জনসাধারণ অনেক সময়ে সরকারের বিরূপ সমালোচনা করে থাকেন, কিন্তু আমার মতে এ সব ব্যাপারে সরকার অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্দোষ। তাঁরা যদি এ ব্যাপারে ব্যয়বরাদ্দে কার্পণ্য করেন–সে কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ব্যাপারটা ঠিক তা' নয়। চিকিৎসা–বিভাগে যেখানেই জনসাধারণ ক্লেশভোগ করে–সেখানেই দেখা যাবে ওপর থেকে নীচে পর্যন্ত (মেডিক্যাল অফিসার থেকে মেথর ও আর্দালী পর্যন্ত) বেশ একটা পাপচক্র চলেছে; চোরে চোরে মুখ শোঁকাশুঁকি চলেছে, পদমর্যাদার বিচার না রেখে। শোষণে সবাই সিদ্ধহস্ত, উৎকোচের ভাগীদার সকলেই। বলা বাহুল্যমাত্র এ পরিবেশে চিকিৎসক বা চিকিৎসালয় রোগীর মনে আস্থা বা বিশ্বাসের ভাব কিছুতেই জাগিয়ে তুলতে পারে না। তাই, আজকার এই বিংশ–শতাব্দীর প্রথমার্জ অতিক্রান্ত হয়ে যাবার পরেও দেখি পৃথিবীর অনেক দেশেই জনসাধারণ এখনও হাসপাতালকে কারাগারের মতই ভয় পায়। বাঘে ছুঁলে আঠার ঘায়ের মতই ডাক্তারের ছোঁয়াচ

থেকে দূরে থাকতে চেষ্টা করে। কারণ যে ডাক্তারেরা 'চেম্বার প্রাক্টিস্' করেন তাঁরা তো তবু পদে আছেন কিন্তু যাঁরা নিজেরা পেটেন্ট ঔষধের ডালা সাজিয়ে বসে আছেন তাঁরা কারণে-অকারণে রোগীকে দশ-বিশ টাকার ঔষধ না কিনিয়ে ছাড়েন না। কথাগুলো শুণতে বড় খারাপ লাগছে, কিন্তু ভুক্ত-ভোগী মাত্রেই আমার এ কথার সমর্থন করবেন।

আমাদের অভিযোগের অন্ত নেই। সমাজের সর্বক্ষেত্রেই দেখছি ষড়যন্ত্রের বিভীষিকা। রোগ সৰ চাইতে অসহায়। তাই যাঁরা রোগীর দুঃখত্রাতা রূপে তাদের সামনে আসেন তাঁদের মধ্যে ত্রুটি দেখলে আমরা দুঃখ পাই সবচাইতে বেশী, অভিযোগও করি সবচাইতে বেশী। আর অভিযোগ করতে বসে ডাক্তার-নার্সের বাস্তব-জীবনে যে সকল অসুবিধা আছে সেগুলো বেমালুম ভুলে যাই। রোগী হিসেবে সমালোচনা না করে যদি মানুষ হিসেবে সমালোচনা করতে বসি তা'হলে হয়তো দেখবো যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের সুদীর্ঘ ফিরিস্তি তৈরী করে যাই-জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আমাদেরই সমাজ তাদের সমাজ-বিরোধী কার্যে লিপ্ত হ'তে প্রেরণা জুগিয়েছে। এই সমাজ-বিরোধী পরিবেশের মধ্যে থেকেও যে সকল চিকিৎসক আজও রোগীর সত্যিকারের বন্ধুরূপে, সমাজের সত্যিকারের সেবকরূপে কাজ করে চলেছেন-তাঁরা সকলেই

নমস্য। কিন্তু যাঁরা তা' পারেন নি, যাঁরা পাপের পঙ্কিল আবর্তে গিয়ে পড়েছেন—আজ যাঁদের সমাজ-বিরোধী পিশাচ ছাড়া আর কিছুই বলতে পারছি না, তাঁদের সম্বন্ধেও কি আমাদের কিছুই করবার নেই? অপরাধ-বিজ্ঞানের মতে এদের মধ্যে অভাবগত, স্বভাবগত দুই প্রকারের অপরাধীই রয়েছে। উপযুক্ত শিক্ষা, আদর্শ ও পরিবেশ-সৃষ্টির দ্বারা এদের সম্বন্ধে সংশোধনী ব্যবস্থা অললম্বন করা যায়। একজন সাধারণ অপরাধী সমাজকে যতখানি ক্ষতিগ্রস্ত করে, একজন অসাধু চিকিৎসক বা নার্স-সমাজের পক্ষে তার চাইতে বেশী ক্ষতিকারক। কারণ তারা প্রত্যক্ষভাবে সমাজের ক্ষতি তো করছেই, অধিকন্তু সমাজ-কল্যাণের বিশেষ যোগ্যতার অধিকারী হওয়ায় সমাজকে নিজেদের যোগ্যতা অনুযায়ী সেবা না করে তারা সমাজের বোঝার ভাগই ৰাড়িয়ে চলেছে। মানুষের দরদী মন নিয়ে এদের কথা গভীরভাবে ভেবে দেখা দরকার ও এদের অসুবিধাগুলি অনতিবিলম্বে দূর করা দরকার।

আমি একজন সত্যিকারের সৎ ও আদর্শ চিকিৎসককে জানতুম, যাঁকে শেষজীবনে অর্থকৃচ্ছ্রতায় রীতিমত কষ্ট পেতে হয়েছিল। সক্ষম অবস্থায় সমাজ-পিতার ন্যায় আদর্শ চিকিৎসক রুপে সমাজ-সেবায় প্রাণ ঢেলে দিয়েছিলেন-কিন্তু

অক্ষম অবস্থায় সমাজ তাঁকে দেখেনি। এই জাতীয় ঘটনা বা ঘটনাগুলি তরুণ চিকিৎসককে যদি অর্থগৃধ্নু হ'তে প্ররোচনা দেয় তা'তে আশ্চর্য বোধ করবার খুব বেশী কিছু থাকছে কি? এমন চিকিৎসক কয়েকজনকেই দেখেছি যাঁরা রোগীকে নিয়ে খেলতে বা খেলাতে পারতেন না, দরিদ্র রোগীর দর্শনী তো মকুব করতেনই, ঔষধের দামও অনেক সময় ছেড়ে দিতেন। "ডাক্তার বিনা পয়সায় ঔষধ দেয়, নিশ্চয়ই তার কোনো মতলব আছে"—এই ভেবে রোগীরা এই শ্রেণীর চিকিৎসকের কাছে যেতে চাইত না। এদের কাউকে কাউকে টিউশনি করে সংসারের ব্যয় নির্বাহ করতে হ'ত। তাই হয়তো অনেককে বলতে শুণি—"ডাক্তারিও একটা ব্যবসা আর ব্যবসার বাজারে একটু এদিক ওদিক না করলে চলে কি? খুব বেশী সৎ হ'লে ব্যবসা চালানো যায় না।"

একটা পুরানো কথা মনে পড়ল—ঊনিশ শ' চল্লিশ সালে গিয়েছিলুম কলকাতার একটি হোমিও-চিকিৎসালয়ে—সঙ্গে ছিল একটি ৰার-তের বছরের ছেলে—জনৈক পরিচিত ব্যক্তির ছোট ভাই। ছেলেটির জন্য ঔষধ নিতে গিয়েছিলুম। চিকিৎসক ৰেশ যত্ন সহকারে পরীক্ষা করলেন ও ঔষধের ব্যবস্থা দিলেন ও আমাকে বলে দিলেন আপনি আগামী শনিবারের বিকেলের দিকে এসে আমাকে রিপোর্ট দেবেন।” আমি বললুম, 'শনিবার

সকালে রিপোর্ট দিলে চলবে না কি? কারণ শনিবার বিকেলে আমি বাইরে যাৰ অর্থাৎ আমার বাড়ী যাব।” ভদ্রলোক শুধালেন-"আপনার বাড়ী কোথায়?” কথাবার্তায় শেষ পর্যন্ত জানা গেল একই জেলায়, একই নদীর দু'পারে দুটি থানায় আমাদের বাড়ী। ভদ্রলোক তখন আমার কাছ থেকে ঔষধগুলো ফেরৎ চাইলেন ও বললেন-"আপনাকে অন্য একটা ঔষধ দিচ্ছি”। ব্যাপারখানা কী-জানতে চাওয়ায় ভদ্রলোক আমাকে জানালেন যে- "দুটো ঔষধই ভালো-তবে আগেকার ঔষধটি আমরা অপরিচিত লোকদের দিই, কারণ ওতে রোগ সারতে একটু সময় বেশী লাগায় আমাদের ঔষধের বিক্রীটাও বেশী হয়, মধ্যে মধ্যে রোগীর বাড়ীতে আমাদের আহ্বানও জানানো হয়। কী করব মশাই-অভাবে স্বভাব নষ্ট।”

ঘটনাটা চিকিৎসকের পক্ষে পৌরুষের নয়, সমাজের পক্ষেও নয়। চিকিৎসক স্বভাব নষ্ট করছে অভাবের তাড়নায় আর এই অভাবটা তৈরী হয়েছে সমাজ-ব্যবস্থারই দোষে তাই নয় কি? মানুষের জীবন-মরণ সমস্যা নিয়ে যাদের কারবার তাদের মধ্যে আর্থিক দীনতা থাকা যে কোনক্রমেই বাঞ্ছনীয় নয় একথা সমাজতত্ত্ববিদ মাত্রেই স্বীকার করবেন। কোন দেশের জনসাধারণ যদি মনে করে যে সে দেশে প্রয়োজনের তুলনায় চিকিৎসকের সংখ্যা অধিক তবে সে দেশে

চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষণে কড়া নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়া উচিত–যাতে করে কেবল বিশেষ যোগ্যতা–সম্পন্ন ও মেধাবী ছাত্রেরাই চিকিৎসক হবার সুযোগ পেতে পারে–এতে অপ্রয়োজনীয় চিকিৎসকের ভীড় কমে যাওয়ায় যাঁরা চিকিৎসা–বৃত্তি গ্রহণ করবেন তাঁরা সমাজ বা রাষ্ট্রের সহযোগিতায় যথোপযুক্ত পরিমাণে অর্থোপার্জনে সক্ষম হবেন। অভাব না থাকায় স্বভাব নষ্ট হ'বার সম্ভাবনাও থাকবে না। কিন্তু আজকের পৃথিবীর কী অবস্থা? প্রয়োজনাতিরিক্ত চিকিৎসক পৃথিবীর ক'টা দেশে আছেন? অধিকাংশ দেশেই তো সুচিকিৎসকের রীতিমত অভাব। যে সব দেশে সুচিকিৎসকের অভাব নেই বা অভাব কম সে সব দেশেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ অর্থকৃচ্ছ্রতার দরুণ চিকিৎসকের সাহায্য নিতে সক্ষম হয় না ও তার ফলে যোগ্যতাসম্পন্ন চিকিৎসককেও অর্থাভাবে কষ্ট পেতে হয় ও এই অর্থাভাবেই তাঁদের সমাজ–বিরোধী কার্যে লিপ্ত হ'তে প্ররোচনা দেয়। চিকিৎসকের আর্থিক দুর্গতি দূর করৰার জন্যে একটা সাময়িক ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে আর সেটা হচ্ছে, যে দেশে চিকিৎসকের সংখ্যা যথেষ্ট, কিন্তু তারা অর্থাভাবে কষ্ট পাচ্ছে সে দেশ থেকে তরুণ চিকিৎসকগণকে যে সব দেশে চিকিৎসকের অভাব রয়েছে সে সব দেশে গিয়ে সমাজসেবার

তথা নিজের জীবিকার সুযোগ দেওয়া। তাদের কূপমণ্ডুকতা দূর করবার জন্য কিছুটা প্রচারকার্যেরও দরকার রয়েছে।

অপরাধী যেমন অনেক রকমের হয় তেমনই এই অপরাধী চিকিৎসকও নানান ধরণের। অভাব-অপরাধীর মত স্বভাব-অপরাধীর সংখ্যাও চিকিৎসক সমাজে অল্প নয়। এই সকল পিশাচ-চিকিৎসকেরা (চলতি ভাষায় চামার ডাক্তার) সমাজের পক্ষে বিভীষিকা-স্বরূপ। এরা অনেক সময়ে এমন কদর্য ধরণের আচরণ অসহায় মানুষের সঙ্গে করে থাকে, কেবলমাত্র টাকার পানে চেয়ে থেকে মুমূর্ষু রোগীর ভাগ্য নিয়ে এমন ছিনিমিনি খেলে থাকে যে, তাদের মানুষ বলে স্বীকার করতে ঘৃণা বোধ হয়। এই ধরণের নরকের কীট ছোটবড় প্রায় প্রতিটি শহরেই অল্প-বিস্তর দেখা যায়। সমাজ, রাষ্ট্র তথা জনহিতকর সমাজহিতৈষী চিকিৎসকমণ্ডলীর সহযোগিতায় এদের বিরুদ্ধে বেশ কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। এমন ডাক্তারের কথাও শুণেছি যিনি দুঃস্থ রোগীর শয্যার পাশে দাঁড়িয়ে থেকে ভারিক্কি চালে বলেছেন "টাকা আমাকে এক্ষুনি দিতে হবে, কোনো ওজর আপত্তি শুণতে আমি রাজী নই।" রোগীর দুঃস্থ আত্মীয় ম্লানমুখে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেছেন ও 'হ্যান্ডনোট' লিখে টাকা কর্জ করে ডাক্তারের পাওনা মিটিয়েছেন। যে দেশ বা যে সকল দেশ এই সমস্ত

নরপিশাচদের বিরুদ্ধে কঠোরতম সংশোধনী ব্যবস্থা নেয় না সে সমস্ত দেশকে সভ্য দেশ বলে স্বীকৃতি দিতে আমি কুন্ঠা বোধ করি।

অন্যের চোখে নয় নিজের চোখে দেখেছি জনৈক সুশিক্ষিত চিকিৎসক ঔষধের মূল্য চৌদ্দ আনার পরিবর্তে বার আনা দিতে চাওয়ায় রোগিনীর হাত থেকে ঔষধের শিশি ছিনিয়ে নিয়েছিলেন ও বলেছিলেন যে "তুমি ৰাড়ী থেকে দু'আনা এনে দেবে আমি কি তার অপেক্ষায় বসে থাকব? মেডিকেল-কলেজে যখন পড়তুম তখন মাইনে বাকী রাখলে তারা কি আমাকে পড়তে দিত?" অশিক্ষিত গ্রাম্য নারী, সে হয়তো এ কথার অর্থ বোঝে নি, কিন্তু তাকে গলাধাক্কা খেয়ে, কাঁদতে কাঁদতে ঔষধের শিশি ফেলে রেখে চলে যেতে হয়েছিল। ঘটনাটি বহুদিনের, তবু আমি এ দৃশ্য ভুলতে পারিনি।

সদসৎ সর্বত্রই আছেন, তবে দুঃখের কথা এই যে অসৎ-এর ভীড়ে সৎ'রা হারিয়ে যেতে বসেছে। চিকিৎসক-গোষ্ঠীকে বৃহত্তর সমাজের একটি ক্ষুদ্র প্রতিফলন হিসেৰে দেখলেও ঠিক এই সত্যটাই প্রকট হয়ে ওঠে। দেখেছি, সুযোগ্য চিকিৎসক অনাহুত রবাহুত হয়ে এসে দুঃস্থ রোগীর জন্য প্রাণ ঢেলে দিয়েছেন আর দেখেছি অজ্ঞ-অর্বাচীন চিকিৎসকের বহ্বাস্ফোট!

এগুলো সমস্তই দুঃখের কথা হ'লেও মানুষের হতাশায় মুষড়ে পড়বার কোনো কারণ আছে বলে আমার মনে হয় না। চিকিৎসক বা চিকিৎসা- ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ-অনুযোগের সংখ্যা অজস্র। তাদের পুরো ফিরিস্তি দিতে গেলে অনেক কালি-কাগজ নষ্ট করতে হবে, সংক্ষেপে বলি যেমন কম্পাউন্ডারকে ঘুষ না দিলে খাঁটি ঔষধের পরিবর্তে অন্য কিছু নিতে হয়, মেথর, ওয়ার্ড-বয় ও নার্সদের কিছু 'টিপ্স' না দিলে প্রয়োজনমত সাহায্য ও সেবা পাওয়া যায় না, বরং যন্ত্রণায় কাতরালে কটূক্তি শুন্তে হয়; ডাক্তারকে একবার অন্ততঃ 'ভিজিট' [ফী] দিয়ে বাড়ীতে না আনলে হাসপাতালে স্থানাভাব ঘটে; "হাসপাতালে যে ঔষধ নেই বলে শোনা যায়- সেই ঔষধ খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে 'পেটেন্ট' ঔষধের দোকানে আশ্রয় নেয়; ডাক্তারকে উৎকোচ না দিলে অসুস্থ ব্যষ্টি অসুস্থ তালিকায় নাম পায় না; চাকরীতে নিযুক্তির পূর্বে স্বাস্থ্য-পরীক্ষার সময় ওপর থেকে নীচে পর্যন্ত প্রত্যেকেই হাত পেতে বসে থাকে। চিকিৎসকের সঙ্গে অশুভ সম্পর্কে সম্পর্কিত ব্যষ্টির দোকানের চশমা বিক্রীর জন্যে চক্ষু পরীক্ষায় অনেককেই 'ফেল' করতে হয়; রোগীর জন্যে যে মূল্যের বা মানের খাদ্য বরাদ্দ করা

হয়, তন্নিম্ন মূল্যের বা মানের খাদ্য সরবরাহ করা হয়; রোগীর জন্যে নির্দিষ্ট দুধ ও ফল রোগীর ভোগে না লেগে হাসপাতালের কর্মচারীদের ভোগে লাগে; ঔষধে ও ইঞ্জেক্সনে ভেজাল–এমনিধারা কত অভিযোগ শুণে থাকি, – কোন কোনটি এত নিম্ন ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচায়ক যে সেগুলো বিশ্বাস করতেই প্রবৃত্তি হয় না। এই দোষ–ত্রুটিগুলির জন্যে সাধারণতঃ জনসাধারণ সরকারের ওপরেই দোষারোপ করে। কিন্তু আমার মনে হয় এজন্যে যদি কারও কোন দোষ থেকে থাকে তো সেটা হচ্ছে জনসাধারণের। সরকার বলে কোন ব্যষ্টি বিশেষ নেই যে সে উৎকোচ গ্রহণ করবে, দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেবে। সরকার ভেজাল ঔষধ প্রস্তুত করতে উৎসাহ দেয় না। ভেজাল ঔষধ যদি কখনও সরকারী স্বীকৃতি পায় সেটা পেয়ে থাকে দুর্নীতি–পরায়ণ সরকারী কর্মচারীদের দোষে। অর্থগৃধ্নুতার জন্যে তারা ধনীর পায়ে নিজেদের মনুষ্যত্বকেই ৰিকিয়ে দেয়। অসাধু ব্যবসায়ীরা তাই নিজেদের অসাধুতার কথা ভেবে সদা শঙ্কিত থাকে, অন্যদিকে তাদের আশার ধ্রুবতারারূপে ধুক্ ধুক্ করতে থাকে 'পুলিশ এনফোর্সমেন্ট বা এ্যান্টিকরাশন্ ডিপার্টমেন্টের' কিছুসংখ্যক কর্মচারীদের দুর্বলচিত্ততা। হাজার টাকা ঘুষ দিয়ে যদি লক্ষ টাকা রোজগার করা যায় তো মন্দ কি! অধিকাংশ অসাধু ব্যবসায়ী এই মনোভাব নিয়েই বসে' থাকে। হ্যাঁ, আগেকার

কথায় ফিরে আসি–এই দুর্নীতির জন্যে আমি সরকারকে তিলমাত্র দোষী করতে পারি না। সমস্যা–সমাধানের চাবিকাঠি রয়েছে জনসাধারণের হাতে–এই কথাটাই সবচেয়ে বড় সত্য। প্রশ্ন উঠতে পারে জনসাধারণ এর প্রতিকারের জন্যে কিছু করে না কেন? কেউ কেউ বলেন যে এ সমস্যাগুলো তো অনগ্রসর দেশের সমস্যা। আর অনগ্রসর দেশগুলিতে জনসাধারণ অধিকার–সচেতন নয় বলে এই অন্যায়গুলো সহ্য করে থাকে। কিন্তু এই কথাটাই কি ঠিক? কেন অনগ্রসর দেশগুলিতেও তো একশ্রেণীর শিক্ষিত–গোষ্ঠী রাজনৈতিক জীবনে বেশ যোগ্যতার সঙ্গেই দালালি করে যাচ্ছেন। তাঁরা তো সর্বসাধারণকে পথনির্দেশনা দিতে পারেন। সামগ্রিক ভাবে না হোক তাঁরা তো জনসাধারণকে এক একটি বিশেষ সমস্যা সমাধানের মিলিত প্রচেষ্টায় উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। তবু তাঁরা তা' করেন না কেন? এর কারণ জলের মত স্পষ্ট। সমাজের ওপর তলাকার যারা মানুষ তাদের একটি বৃহৎ অংশ আজ বিভিন্ন ধরণের পাপাচারে লিপ্ত–তাই তাঁদের পক্ষে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সকল দুর্নীতি রয়েছে সেগুলোর বিরুদ্ধে মিলিতভাবে আওয়াজ তোলৰাৰ, প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ করবার অথবা প্রতিশোধ নেবার সামর্থ্য নেই। এই তথাকথিত শিক্ষিত জনগোষ্ঠী যে কেরাণী, শিক্ষক, ইঞ্জিনীয়র, সরকারী

কর্মচারী ও ব্যবসায়ীকে নিয়ে গঠিত–নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে তাদের এক অতি বৃহৎ অংশ দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে পরোক্ষ সমালোচনা এদের ভীরু মন করতে পারে, কিন্তু প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নামতে এরা পারে না। চোর চোরের নিন্দা চোরের সমাজে করতে পারে কিন্তু সাধু সমাজে কথা বলতে গেলে তার ঠোঁট কাঁপবে, বুক দুরদুর করবে। অনগ্রসর দেশের শিক্ষিত সমাজের তথা ওপরতলাকার মানুষের অবস্থা ঠিক এই রকমেরই, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এদের আরও পঙ্কিলতার আবর্তে ফেলে দিয়েছে। এদের স্বভাব সংশোধন করতে হবে, এদের মনুষ্যত্বের স্তরে তুলতে হবে, অন্যথায় সমাজের কোনো গ্লানিই দূর হবে না, কোনো সমস্যারই সমাধান হবে না; সুতরাং একভাবে কেবল চিকিৎসাক্ষেত্রেই দুর্নীতিগুলো রাষ্ট্রিক প্রচেষ্টায় 'আলাদীনের প্রদীপে'র জাদুকরী শক্তিতে দোষমুক্ত হয়ে যাবে–এ'ধরণের আশা করা বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই নয়। মানুষকে মানুষের স্তরে তোলা–এইটাই আজকের দিনে সৰচেয়ে বড় কথা, সব চেয়ে বড় সাধনা। এই কাজে, এই মহাযজ্ঞে–পুরোভাগে এসে দাঁড়াতে পারে–এমন মানুষের আজ বড়ো অভাব। নিপীড়িত মানবাত্মা আজ সেই সমাজ–পুরোধাদেরই আসা–পথ পানে চেয়ে বসে আছে। জনীতিকগণ একাজে কিছুমাত্র সাহায্য করতে পারবেন না। মানবেতিহাসের গত ছ' হাজার বৎসরের প্রতিটি পদবিক্ষেপেই

তাঁরা ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। তাই সমাজের সকল স্তরে নেতৃত্ব করবার লোভ এখন তাঁদের সম্বরণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

ব্যবসায়ী

পাপের পঙ্কিলতা কি শুধু চিকিৎসা ব্যবসায়ে? না, যে কোনো ব্যবসায়ীর মনের কোণে একটু উঁকি মেরে দেখুন–সর্বক্ষেত্রে না হোক প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই দেখবেন পাপের আবর্জনা সেখানে রীতিমত পচে গলে এক পূতিগন্ধময় পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। অবস্থাটা আজ এমনিই হয়ে দাঁড়িয়েছে যে পৃথিবীর একটি বৃহৎ অংশে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হওয়া মার্জিতভাবে সমাজবিরোধী কার্যে লিপ্ত হওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। মার্জিতভাবে এই কারণে বললুম যে ব্যবসায়ী যেমনই হোক না কেন ব্যবসায়ে খানদানী চালটাই হচ্ছে ভাষার বাঁধুনী ঠিক রেখে চলা।

সৎপথে থেকে কি ব্যবসায় করা যায় না? কেন যাবে না? যায় ঠিকই, তবে–সৎপথে ব্যবসায় করতে গেলে রাতারাতি ধনী হওয়া যায় না। আগেকার দিনের বর্ণাশ্রম

সমাজ–ব্যবস্থায় সৎপথে থেকে ব্যবসায় করাটাই বৈশ্যের সমাজধর্ম বলে গণ্য হোত। তবে আজ অবস্থাটা এমনিই দাঁড়িয়েছে- যে যারা ব্যবসায়ের খাতিরে নিজের সাধুতা নষ্ট করতে রাজী নন, তাদের পক্ষে ব্যবসায় চালানো একেবারে অসম্ভব না হলেও দুষ্কর।

বৈশ্যের জীবিকাটাই এমনি যে এতে যে কোনো মুহূর্তে অতিলোভের বশবর্তী হয়ে মানুষ যে কোনও ঘৃণিত কাজে প্রবৃত্ত হতে পারে। যাতে নিজের চোখের সামনে সর্বদাই একটা সাধুতার আদর্শ বা সাধুতার ভাব রাখা যায় সেইজন্যে প্রাচীনকালের বৈশ্যেরা "সাধু" পদবী ব্যবহার করত ও সমাজে সাধু ("সাহু"–প্রাকৃতে; বর্তমানে "সাউ" বা "সাও") নামেই অভিহিত হ'ত। ইতিহাস–পাঠে জানা যায় যে ব্যবসায় পরিচালনার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা হাতে থাকায় সুপ্রাচীন কাল থেকে এদের বারে বারে মানবতার মান থেকে পদস্খলন হয়েছিল ও বৌদ্ধযুগ থেকে সমাজের ধনসম্পদের অধিকাংশ এদেরই কুক্ষিগত হয়ে পড়েছিল। তবু সেকালের সমাজ–শাস্ত্রে দেখি যে এদের এই অতিলোভের তথা অতি সঞ্চয়ের হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করবার, জন্যে সমাজবিদ তথা কূটনীতিবিদেরা একের পর এক উপায় উদ্ভাবন করে চলেছেন।

রাজশক্তি ক্ষত্রিয়ের করায়ত্ত থাকায় মধ্যযুগের প্রথমাংশে বৈশ্যের অতি সঞ্চয়ী মনোভাবের বিরুদ্ধে তারা সম্ভবক্ষেত্রে সর্বপ্রকার অভিযানও চলিয়ে গেছেন। চাণক্য বলেছেন–কোন ব্যবসায়ীর অতি ধনী হওয়া রাষ্ট্রের পক্ষে সর্বনাশকর। কাউকে অতি ধনী হতে দেখলে রাজা যেন তার ওপরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে অজস্র রকমের কর ধার্য করে তার ধনসম্পদের পরিমাণ হ্রাস করে দেন। অন্যথায় রাষ্ট্রকে তার শোষণযন্ত্রের অঙ্গ হিসেবে না পেলে বৈশ্য রাষ্ট্র–ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে দিতে পারে। চাণক্য আরও বলেছেন যে অতি ধনী বৈশ্যকে করধার্যের দ্বারা সংযত বা সংহত করতে না পারলে রাজার উচিত বিষপ্রয়োগে গুপ্তঘাতকের দ্বারা তাকে হত্যা করা। কথাগুলি খুবই শ্রুতি–কটু বটে, কিন্তু সেদিনের সেই গণ–অন্ধকারের যুগে এছাড়া দ্বিতীয় কোন পন্থা ছিল না। বৈশ্যকে সদুপদেশও দেওয়া হ'ত–বলা হ'ত– অর্থোপার্জন ও দান– এ দুটোই তার প্রধান ধর্ম, সঞ্চয় তার ধর্ম নয়; কিন্তু পৃথিবীর কোনও দেশে কোনও কালে বৈশ্য তার স্বধর্মোচিত কর্তব্য প্রতিপালন করতে পারে নি। প্রাচীনকালে অজ্ঞ মানুষের ধর্মভাব বেশী ছিল বলে বৈশ্য পরকালের পানে চেয়েও কিছু দানধ্যান করত। কিন্তু আজকের এই জড়বাদের যুগে ইহকাল–সর্বস্ব বৈশ্য দানধ্যান করে পরকালের খাতায় কিছু জমিয়ে রাখতে মোটেই আগ্রহশীল নয়। ভারতের

সমাজশাস্ত্র বলে-"ইহলোকে যারা দাতা তারাই কৃপণ। আসলে যারা কৃপণ তারাই দাতা"-কথাটি বলা হয়েছিল অসৎ-বৈশ্যের প্রতি ব্যাঙ্গোক্তি করে। যারা দাতা তারাই কৃপণ-অর্থাৎ ইহলোকে যা দান করল-পরলোকের খাতায় তাই জমা হয়ে রইল-অর্থাৎ তারা নিজেদের সঞ্চয়ের ব্যবস্থা পাকা করে রাখলো। আর ইহলোকে যারা কৃপণ তারা সত্যিকারের দাতা-কারণ ইহলোক থেকে মৃত্যুর সাথে সাথে তাদের কষ্টার্জিত সমস্ত সম্পদের সঙ্গেই সম্পর্ক চুকে গেল। পরলোকের খাতায় সে কিছুই জমায় নি, তাই কিছু রইল না। কিন্তু আজকের বৈশ্য এ সকল ব্যঙ্গোক্তিতে ভোলে না-অর্থোপার্জন তথা সঞ্চয়ের ব্যাপারে এদের অধিকাংশই একেবারে পিশাচবৎ। সংস্কৃত ভাষায় 'পিশাচ' তাদেরই বলা হয় যারা জীবের ঘাড় মটকে সব রক্তটুকু শুষে পান করে, ফেলে রেখে দেয় শুধু হাড়-মাংসগুলো। ভারতবর্ষে একটা কথা আছে-এই রক্তমোক্ষক পিশাচ বৈশ্যদের স্বভাব বোঝা ভার-এরা কখনও বিশুদ্ধ জলও ছেঁকে পান করে আবার কখনও দূষিত রক্তও না ছেঁকে পান করে এরা কখনও ক্রেতার মস্তকে পদাঘাত করে আর কখনও তার পদতলে তৈলমর্দন করে।

এ প্রসঙ্গে এ কথাটাও বলে রাখা ভাল যে প্রকৃতপক্ষে 'বৈশ্য' বলতে বিভিন্ন প্রকারের বৃত্তিজীবী উৎপাদনশীল

সূচীপত্র

মানুষকেই বোঝায়, কিন্তু এর ব্যবহারিক অর্থ দাঁড়িয়েছে অন্য রকমের। বৈশ্য ৰলতে আজ কেবল তাদেরই বোঝায় যারা নিজেরা প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদনের কাজে রত না থেকে কেবল ক্রয়-বিক্রয় ও দালালির মাধ্যমে মুনাফা লোটাকেই একমাত্র বৃত্তিরূপে গ্রহণ করেছে। মুনাফাই যেখানে একমাত্র সাধন ও সাধ্য সেখানে যে কোনো প্রকারের নীচতা ও সমাজ-বিরোধী মনোভাব প্রশ্রিত হবার ষোল আনা সম্ভাবনা থেকে যায়। প্রাগ্রসর দেশগুলির বৈশ্যেরা একদিক দিয়ে তবু পদে আছে কারণ জনসাধারণের অধিকার-সচেতনতার জন্যেই হোক বা নিজেদের বিবেকদংশনের জন্যেই হোক তারা মার্জিতভাবে জনস্বার্থ বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হলেও জনস্বাস্থ্য-বিরোধী কার্যে প্রবৃত্ত হ'তে চায় না বা হয় না। সমাজের সামগ্রিক আর্থিক কাঠামোর দিক দিয়ে বিচার করে দেখতে গেলে তাই প্রাগ্রসর দেশগুলির বৈশ্যদের যদি বলি পিশাচ বা মার্জিত পিশাচ তাহলে অনগ্রসর দেশের বৈশ্যদের উদ্দেশ্যে ব্যবহার যোগ্য বিশেষণ খুঁজে পাওয়া মুস্কিল; এরা শুধু রক্ত পান করেই ক্ষান্ত হয় না হাড়-মাংসও খায় আর চামড়া নিয়ে ডুগি বাজাতে বাজাতে ধর্মকথা, তত্ত্বকথা শোনায়, শাস্ত্রপ্রচার করে, মন্দির-ধর্মশালা গড়ে দেয়, আরও কত কী করে! এরা জড়বাদের নিন্দা করে থাকে, জড়বাদের কঠোর চাপে তাদের

ঘুঘুর বাসা ভেঙ্গে গুঁড়ো হয়ে যাবার সম্ভাবনা বেশী থাকাতেই তারা জড়বাদের প্রসার রোধ করতে চেষ্টা
করে। তারা অধ্যাত্মবাদকে সমর্থন করে কোনও ধর্মীয় ভাবধারাকে সামনে রেখে নয়, তারা অধ্যাত্মবাদের যে মেকী জিনিসটা সমাজে চালাবার চেষ্টা করে তাতে আসলে ক্লীবতারই বীজ নিহিত থাকে। এই ক্লৈব্য ভাবধারায় পোষকতায় তারা তাদের সহকর্মীরূপে পায় তাদেরই সমগোত্রীয় একশ্রেণীর ধর্মব্যবসায়ীকে।

বৈশ্য ও ধর্মব্যবসায়ীর এই মিলিত পাপচক্র, এই যোগসাজস মানুষকে দৃপ্তকণ্ঠে নিজের অধিকার ঘোষণার পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায়, আর তাদের বুঝিয়ে দিতে চায় যে বৈশ্যের এই রক্তমোক্ষণ এটা আসলে কোনো অনাচার নয়, প্রাকৃতিক বিধান। আর এই অত্যাচারিত মানুষের পক্ষে পার্থিব জগতে অধিকার প্রতিষ্ঠা করে স্বাচ্ছন্দ্য আনবার প্রয়াস বাতুলতা মাত্র। তার উচিত এ জগৎকে বিস্মৃত হয়ে কল্পলোকের স্বর্গে অনন্ত সুখভোগের নিমিত্ত ধর্মব্যবসায়ীকেও পোষণ করা।

হ্যাঁ, আগেকার কথায় ফিরে যাই–লোভবৃত্তিকে আজকের বৈশ্যের দল লাগাম ছেড়ে ছুটিয়ে দিয়েছে, হয়তো বা আসন্ন

মৃত্যুর ঘন্টাধ্বনি তাদের কানে পৌঁছেছে; ত্যাগের সাধনা, তপস্যার সম্বোধি না থাকায় কর্তব্যের পথ বা জীবনের পথ তাদের একটি অতিবৃহৎ অংশ খুঁজে পাচ্ছে না। দিগ্বিদিক্‌-জ্ঞানশূন্য হয়ে আজ তারা ভাবছে, আমাদের ওই আবুহোসেনী মেয়াদ যখন এতই বাঁধামাপা তখন এরই মধ্যে যা পারি লুঠে নিই, যেমনভাবে পারি নিজের উদর স্ফীত করি, ধর্মাধর্ম, পাপ-পুণ্য, সুপরিণাম-কুপরিণামের কথা না ভেবে। এই অসৎ বৈশ্যদের মধ্যে কিছু সংখ্যক কুম্ভীর-স্বভাবের মানুষ আজকের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে রীতিমত দরদীর ভূমিকায় অভিনয় করে চলেছেন। মানুষকে ভক্ষণ এঁরাও করছেন তবে লোক দেখানো কিছুটা অশ্রু- বিসর্জন করে। জীবনের পথ এঁরাও পাননি, এঁদের প্রচেষ্টা শুধু অভিনয়ের সাহায্যে মন ভুলিয়ে যদি বা এই মেয়াদটাকে কিছুটা দীর্ঘায়িত করা যায়! অহিংস বকটি সেজে কেবল তত্ত্বতথা শুণিয়ে এঁরা শ্রেণীসংগ্রাম রোধ করতে চান, যদিও আসলে এঁরা ভালভাবেই জানেন যে বিশ্বৈকভাবের সাধনা প্রতিটি ব্যষ্টিজীবনে থাক বা না থাক অন্ততঃ সমষ্টি-জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশে যেখানে নেই সেখানে সংঘর্ষ ব্যতিরেকে আর্থিক অসাম্য 'তথা বৈশ্য-শোষণ দূর করা একেবারেই অসম্ভব।

অল্পসংখ্যক বৈশ্য যাঁদের মধ্যে সত্যিকারের মানুষভাবের উন্মেষ হ'তে আরম্ভ হয়েছে-যাঁরা জীবনের পথের সন্ধান

পেয়েছেন কেবলমাত্র সেই সৎ বৈশ্যই সমাজ-জীবনের বৈষয়িক বাপারের পরামর্শদাতা তথা পরিচালক হবার যোগ্যতার দাবী করতে পারেন। এই শ্রেণীর বৈশ্যদের মধ্যেই শুনতে পাৰ, "What I save, I lose......it is sin to die rich."

বৈশ্যের এই যে পৈশাচিক ক্ষুধা, এই যে উদ্দাম বীভৎসতা, এর থেকে পরিত্রাণের কি কোনো পথ নেই? কেউ বলবেন, সমস্ত ব্যবসায়ই রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে আসা উচিত, সে ক্ষেত্রে জনসাধারণ শোষণের হাত থেকে মুক্তি পাৰে। কেউ বা বলবেন সবকিছুই সামবায়িক ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়া উচিত, এতে জনসাধারণ নিজেদের আর্থিক ভাগ্য নিজেরাই নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। আবার কিছু সংখ্যক লোক এমন মতও পোষণ করেন যে ব্যবসায় পরিচালনা ব্যষ্টিগত মালিকানাতেই হোক, রাষ্ট্র কেবল পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করুক ও শোষণকারীদের অতিলোভে শাসনদণ্ডের সাহায্যে সংযত করে রাখুক বা যেক্ষেত্রে রাষ্ট্রের পক্ষে পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণও অসুবিধাজনক, সেক্ষেত্রে অতিরিক্ত কর ধার্য করে ব্যবসায়ীদের অতি ধনী হওয়ার পথ রোধ করে রাখুক। যারা সোজাসুজি পুঁজিবাদেরই সমর্থক তাদের মত এখানে উল্লেখই করলুম না। কারণ তাদের মতের কোন মূল্য আছে বলে আমি মনে করি না। সমাজ-জীবনে ত্রুটি-বিচ্যুতি তথা ফাঁকগুলো বজায়

থাকুক এটাই তাদের কাম্য– সেই রন্ধ্র পথ দিয়েই তারা সমাজের প্রাণরস শোষণ করে থাকে।

শিল্প–ব্যবসায়ের ব্যাপকভাবে রাষ্ট্রীকরণ নানান কারণে সমর্থন করা যায় না, তবে তার মধ্যে প্রধান দুটো কারণ হচ্ছে এই যে প্রথমতঃ আমলা– নির্ভরশীল (মনে রাখতে হবে মুখে যে যাই বলুক, রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় আমলা– তন্ত্রের একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে যাকে বাদ দিয়ে সেবা চলতে পারে কিন্তু শাসন চলতে পারে না) রাষ্ট্রের পক্ষে দেশের সর্বাংশে পরিব্যাপ্ত ক্ষুদ্র–বৃহৎ প্রতিটি ব্যবসায় ও শিল্প–প্রতিষ্ঠান যথাযথভাবে পরিচালনা করা একেবারেই অসম্ভব, শুধু হিসেব নিকেশেই নয়, কর্মী–পরিচালনার ব্যাপারেও তা'তে বেশ একটা শৈথিল্য থেকে যায়; দ্বিতীয়তঃ ব্যষ্টিগত অধিকারে পরিচালিত প্রতিষ্ঠান যেরূপ শিল্পগত বা ব্যবসায়গত দক্ষতা দেখাতে পারে, রাষ্ট্র পরিচালিত প্রতিষ্ঠান তা' পারে না বা পারা সম্ভবও নয়। যে কোনো বস্তু প্রস্তুত করতে রাষ্ট্রীয় সংস্থার যে পরিমাণ ব্যয় হয়, ব্যষ্টিগত প্রতিষ্ঠান তদপেক্ষা অনেক অল্পব্যয়ে অধিকতর দক্ষতার সঙ্গে সেই কার্য সমাধা করে। রাষ্ট্রীয় সংস্থার প্রতি রাষ্ট্রের বিশেষ সমর্থন বা একদেশদর্শিতা না থাকলে কোনো বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বেঁচে থাকা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্ভব হয় না।

সকল শিল্প–ব্যবসায় সামবায়িক ভিত্তিতে পরিচালনা করার প্রস্তাবও বাস্তবতা–বিরোধী, কারণ সমবায়–প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে সেই জনমণ্ডলীর মিলিত শ্রমে ও বুদ্ধিতে, যে জনমণ্ডলী একই আর্থিক কাঠামোয়, একই প্রয়োজনের তাগিদ নিয়ে বাস করছে ও সামবায়িক ভিত্তিতে উৎপন্ন (বা ক্রীত) বস্তুর তৈরী বাজার মোটামুটি বিচারে হাতের কাছে পাচ্ছে, উল্লিখিত এই তিনটি তত্ত্বের একত্র সমাবেশ না হ'লে সংস্থাকে আর সামবায়িক সংস্থা বলা চলে না তখন সেটা হয়ে দাঁড়ায় সদস্যদের সীমিত–ক্ষমতায় পরিচালিত ব্যবসায়িক সংস্থা–বিশেষ। সমবায়ের মূলধর্মের তাতে অভাব ঘটে।

বে–সরকারী মালিকানায়, সরকারী নিয়ন্ত্রণে ব্যবসায়–প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয়করণের চেয়েও খারাপ জিনিস কারণ তাতে রাষ্ট্রীকরণের ক্রুটিগুলি তো থাকৰেই অধিকন্তু রাষ্ট্রে একটি ধনী অথচ বিক্ষুব্ধ বৈশ্য– সমাজও রাষ্ট্র–বিরোধিতার সকল সম্ভাবনা নিয়েই জনসাধারণের মধ্যে থাকবে। প্রতিষ্ঠা পুনঃপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে কোনও হীন পন্থাই তারা বাদ দেবে না।

শিল্প–ব্যবসায়ের ওপর রাষ্ট্রের পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ অথবা তাদের অতি– লোভ সংযত করার প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হওয়াই

স্বাভাবিক কারণ অসাধু কর্মচারীদের যোগ-সাজসে নকল খাতায় মিথ্যা হিসেব দেখিয়ে রাষ্ট্রের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করা ব্যবসায়ীদের পক্ষে মোটেই কষ্টকর কাজ হবে না। অধিকন্তু সম্পূর্ণ বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে থাকলে এরা যে মূল্যের বিনিময়ে জনসাধারণের সেবা করত, এতে এরা তা-ও করবে না। নিজেদের ব্যয়াধিক্য দেখাবার জন্যে উৎপাদিত দ্রব্যেরও মূল্য বাড়িয়ে দেবে।

ব্যবসায় ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা দিয়ে কেবল কর ধার্যের ক্ষেত্রে কঠোরতা করা যে সাফল্যজনক হয় না তা' অধিকাংশ রাষ্ট্রেরই জানা আছে। আজকের পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রেই বিক্রয়কর, ক্রয়কর, আয়কর, অতিলাভকর প্রভৃতি ৰাৰদ সরকারের যা' আয় হয়ে থাকে তা' ন্যায্য-প্রাপ্যের একটি অতিক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র। কর আদায়কারী কর্মচারীদের চাইতে কর যারা ফাঁকি দেয় তারা অনেক বেশী বুদ্ধিমান, অনেক বেশী অভিজ্ঞ। সমস্বার্থের ভিত্তিতে তারা বেশ একতাৰদ্ধও বটে, কিন্তু কর আদায়কারীরা একতাবদ্ধ নয়, তাদের মধ্যে বখরা নিয়ে সংঘর্ষ থাকে, তাদের মধ্যে নীতিগত ভেদ থাকে, তাদের মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতা থাকে, তাই অতিরিক্ত কর ধার্য করে বৈশ্য-প্রভাব খর্ব করা অসম্ভব না হ'লেও রীতিমত কষ্টসাধ্য আর কষ্ট করে যদি তাকে

সম্ভবও করা যায় তবু তার থেকে জনসাধারণ তেমন বেশী উপকৃত হয় না।

আমার মতে এই বৈশ্য-লোলুপতার হাত থেকে সমাজকে বাঁচাতে হ'লে একটি মধ্যপন্থাই নিতে হবে। মধ্যপন্থা বলতে আমি এমন কথা বলছি না যে বৈশ্যের লোভবৃত্তিকে কিছুদূর পর্যন্ত সহ্য করে নিয়ে তাদের সাথে কোনও রকমের আপোষরফা করতে হবে। আমার বক্তব্য এই যে, যা' কিছুই আমরা করি না কেন তা' যেন সমাজের ভারসাম্য যথাযথভাবে রক্ষা করে চলে। ঝোঁকের বশে বা বিদ্বেষের বশে এমন কিছু করে বসা উচিত হবে না যার ফলে সমাজ-জীবনের কোনও কোনও ক্ষেত্রে বিপর্যয় দেখা দিতে পারে; অথবা সৎনীতির ভিত্তিতে যে ব্যবস্থাগুলো গড়ে উঠেছে সেগুলোয় ফাটল ধরে যেতে পারে।

অস্তিত্ব-রক্ষার পক্ষে সর্বাধিক প্রয়োজনীয় জিনিস হচ্ছে অন্ন ও তার পরে বস্ত্র। তাই প্রথমে ধরা যাক, এই অন্ন-বস্ত্রের সমস্যার দিকটা। পৃথিবীর অনেক দেশেই অন্নের বন্টন-ব্যবস্থা ব্যবসায়ীদের কুক্ষিগত। এমন দেশের সংখ্যাও কম নয় যেখানে শুধু বন্টন নয় উৎপাদনও ব্যবসায়ীদের হাতে অর্থাৎ কি না এক একজন ব্যবসায়ী বা তথাকথিত বড় কৃষক নিজ

নামে অথবা বেনামায় প্রচুর জমির মালিকানা স্বত্ব ভোগ করছে। আর তারই কর্মচারী অথবা প্রজা অথবা বর্গাদার হিসেবে সত্যিকারের কর্ষকেরা নিজেদের কায়ক্লেশে জমিতে সোণার ফসল উৎপন্ন করে তার একটা বৃহৎ অংশ শ্রম–বিমুখ মালিকের ঘরে পৌঁছিয়ে দিচ্ছে। নীতিগতভাবে একথা আজ পৃথিবীর প্রায় সমস্ত মানুষই মেনে নিয়েছে যে শস্যক্ষেত্রের মালিকানা কর্ষকদেরই থাকা উচিত, আর এই কর্ষক ও কর আদায়কারী সরকারের মধ্যে তৃতীয় কোন সত্তার উপস্থিতি একেবারেই অবাঞ্ছনীয়। সুতরাং অন্নোৎপাদনের প্রশ্ন যেখানে রয়েছে সেখানে মানতেই হবে যে এ ব্যাপারে অনুৎপাদক ব্যবসায়ীর মালিকানার কোনোও প্রশ্নই উঠতে পারে না। কিন্তু যারা নিজেরা কর্ষক অর্থাৎ যারা নীতিগতভাবে বৈশ্যপদবাচ্য তাদেরও কি জমির ওপর ব্যষ্টিগত মালিকানা থাকা উচিত? না, কিছুতেই নয়। কারণ এক ব্যষ্টির কর্ষণযোগ্য জমির পরিমাণ নিশ্চয়ই বেশী হতে পারে না আর সেই ততটুকু জমির মালিকানা নিয়ে তার পক্ষে উন্নত বীজ, উন্নত সার, জলসেচন প্রভৃতির সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা অসম্ভব ব্যাপার। তাছাড়া ব্যষ্টিগত সুবিধা–অসুবিধার প্রশ্নও অনেক সময় দেখা দেয় যার ফলে শস্য–রোপণ, শস্য–কর্তন প্রভৃতি ব্যাপারেও যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া কর্ষকের পক্ষে সম্ভব না–ও হ'তে পারে ও জমি অনাবাদী থেকে যেতে পারে। এই

ধরণের অনাবাদী জমি মানুষজাতের বোঝা ছাড়া আর কিছুই নয়। আরও অনেক অসুবিধা রয়েছে, ব্যষ্টিগত–মালিকানায় জমি চিহ্নিত–করণের জন্যে আল দিতে গিয়ে বহু জমিকে অযথা নষ্ট করা হয় (বস্তুতঃ জমির লেবেলের বিভিন্নতা না থাকলে আল দেওয়ার অর্থ জমি নষ্ট করা ছাড়া আর কিছুই নয়)। নিজের নির্দিষ্ট বা সীমিত জমিতে উন্নততর কর্ষণ ব্যবস্থা প্রবর্তনও অসুবিধাজনক। এই অসুবিধার জন্যে অনেক দেশ বিদ্যায়–বুদ্ধিতে উন্নত হওয়া সত্ত্বেও কৃষিক্ষেত্রে 'ট্রাক্টর' ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও বিধিব্যবস্থার প্রবর্তনে এখনও সক্ষম হয়ে ওঠে নি। যদি কেউ মনে করেন অকৃষিজীবীর ব্যষ্টিগত মালিকানায় জমি থাকা উচিত নয় কিন্তু কৃষিজীবীর তা' থাকা উচিত, কারণ কর্ষকদের নিজের নিজের জমির প্রতি একটা বিশেষ মমতা থাকে। তার জবাবে এ কথাও তো বলা যেতে পারে যে অকৃষিজীবীরও নিজের জমির প্রতি বিশেষ একটা আকর্ষণ ছিল ও আছে। আসলে এ ব্যাপারে ব্যষ্টিগত 'সেন্টিমেন্টকে' বড় করে না দেখে সামূহিক স্বার্থের কথাই ভেবে দেখতে হবে।

আমি যা বুঝি বিশ্বের সমস্ত জমি সমস্ত মানুষের সাধারণ সম্পত্তি। ব্যষ্টিবিশেষ, রাষ্ট্র বিশেষের ওপর থাকে বিশেষ একটা ভূখণ্ডের যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও সদুপযোগের ভার

তত্রত্য সরম রর ও সরকার তার কর্তব্য সম্পাদন করবে সত্যিকারের কৃষিজীবীদের নিয়ে তৈরী উৎপাদক সমবায়ের মাধ্যমে। এই সামুহিক অধিকারে ও সামবায়িক পরিচালনায় ব্যষ্টিগত অধিকারের দোষত্রুটিগুলি থাকবে না, আর যথোপযুক্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে ফসল উৎপাদন বাড়িয়ে দেওয়াও অল্পায়াসেই সম্ভব হবে।

খাদ্যশস্য বন্টনের ব্যাপারেও ব্যবসায়ীদের অধিকার না থাকাই বাঞ্ছনীয়। এ অধিকারটি থাকা উচিত সম্পূর্ণভাবে উপভোক্তা-সমবায়ের। খাদ্যশস্যের উৎপাদন ও বন্টন বৈশ্যের হাত থেকে সমবায় প্রতিষ্ঠানের হাতে না আসা পর্যন্ত খাদ্যের বাজারে মজুতদারী, ফাট্কাবাজি, চোরাবাজারি ও ভেজাল রোধ করা কিছুতেই সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে সামান্যতম দুর্বলতা দেখানোর পরিণামও অত্যন্ত ভয়াবহ। যাঁরা মানুষকে ভালবাসেন ও রাজনীতির চর্চা করেন, তাঁদের মধ্যে এ দুর্বলতা কিছুতেই বাঞ্ছনীয় নয়। চোরাবাজারি বা ফাটকাবাজারির গুদামে খাদ্য পচৰে, ইঁদুরে খাবে আর মানুষ ক্ষুধার জ্বালায় তিলে তিলে মরবে-এ ব্যবস্থা মনুষ্যনীতির বিরোধী।

তারপরে আসে বস্ত্র ও খাদ্যের আনুষঙ্গিক হিসাবে জ্বালানীর কথা। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে খাদ্য-বন্টন ব্যবস্থায় যে

ত্রুটিগুলো থাকা স্বাভাবিক এতেও সেগুলো থাকে ও আছে, তাই অত্যাবশ্যক শ্রেণীর বস্ত্রগুলি (সকল শ্রেণীর বস্ত্র নাই বা হ'ল), ও যে যুগে বা যে দেশে যেগুলো অত্যাবশ্যক জ্বালানী (কোথাও কাঠ, কোথাও কয়লা, কোথাও বা তেল) সেগুলির বন্টনের অধিকার স্থানীয় উপভোক্তা সমিতিরই হাতে থাকা দরকার। অত্যাবশ্যক বস্ত্রগুলির উৎপাদন ও সম্ভবক্ষেত্রে অত্যাবশ্যক জ্বালানীগুলিরও উৎপাদন ব্যবস্থা যতদূর সম্ভব উৎপাদক সমবায়ের অধিকারে থাকা উচিত ও যে ক্ষেত্রে তা' সম্ভব নয় (যেমন প্রতিকূল আবহাওয়ায় সূতা তৈরী) সে ক্ষেত্রে সেই শিল্প বা তার আনুষঙ্গিক কাঁচা বা আধা তৈরী মাল উৎপন্ন করবার ও তা' উৎপাদক সমবায়কে সরবরাহ করবার অধিকার স্থানীয় রাজ্য সরকারের বা স্থানীয় স্বয়াত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের এক্তিয়ারের মধ্যে রাখতে হবে; ব্যবসায়ীর হাতে নয়। ব্যবসায়ীর হাতে বড় জোর অনত্যাবশ্যক খাদ্য ও জ্বালানী উৎপাদন ও বন্টনের ভার দেওয়া যেতে পারে। কারণ এ ব্যবস্থায় অবস্থার চাপে ফেলে জনসাধারণকে শোষণ করবার বিশেষ সুযোগ নেই।

লেখাপড়ার উপকরণ ও যে সকল মনোহারী দ্রব্য বিলাসোপকরণের পর্যায়ভুক্ত নয় (যেমন 'ব্লেড়', কাপড় কাচা সাৰান) সেগুলোর উৎপাদন অধিকার ব্যবসায়ীর হাতে না

থাকাই উচিত। এ অধিকার থাকা উচিত উৎপাদক-সমবায়ের অথবা রাজ্য সরকারের হাতে। বণ্টন অবশ্যই উপভোক্তা-সমবায়ের মাধ্যমে হওয়া দরকার। যে সকল মনোহারী দ্রব্য বিলাসোপকরণের পর্যায়ভুক্ত সেগুলোর উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবসায়ীদের হাতে রাখা যেতে পারে। গৃহনির্মাণের যে সকল উপকরণ সর্বত্র যথেচ্ছ ভাবে উৎপাদন করা সম্ভব নয় (যেমন সিমেন্ট ও ধাতু নির্মিত সরঞ্জাম) সেগুলির উৎপাদন ব্যবসায়ীদের হাতে থাকা নিরাপদ নয়। এগুলি প্রত্যক্ষভাবে রাজ্য সরকারের দ্বারা অথবা রাজ্য সরকারের প্রত্যক্ষ সমর্থনে বৃহৎ বৃহৎ সমবায় প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় উৎপাদন করা উচিত।

বণ্টন ব্যবস্থাও প্রত্যক্ষভাবে রাজ্য সরকারের কর্তৃত্বে অথবা রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণে স্বায়ত্ত শাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা হওয়া উচিত। এ সকল ব্যাপারে ব্যবসায়ীগণকে মোটেই নাক গলাৰার সুযোগ দেওয়া উচিত নয়। কারণ, যে জিনিসটিরই সরবরাহ সীমিত অথচ চাহিদা যথেষ্ট সেখানেই তারা কৃত্রিম উপায়ে অভাবের পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে চাইৰে। গৃহ নির্মাণের উপকরণের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে যে এই অসাধু ব্যবসায়ীর দল অসৎ সরকারী কর্মচারীর যোগ সাজসে অর্দ্ধসমাপ্ত গৃহের মালিকগণকে অবস্থার চাপে ফেলে

চোরাবাজার থেকে সিমেন্ট, করোগেটেড় টিন প্রভৃতি কিনতে বাধ্য করেছে। যে ব্যাপারে মানুষের তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে, সমাজ সচেতন মানুষের উচিত, সেই ব্যাপারের আনুষঙ্গিক কারণগুলোকে সযত্নে পরিহার করে চলা।

তাই গৃহনির্মাণের উপকরণগুলির মত ঔষধেরও উৎপাদন ব্যবস্থা ব্যবসায়ীদের হাতে ফেলে রাখা মোটেই নিরাপদ নয়। লোভের বশে যারা দুগ্ধে ময়দা বা গুড়ের বাতাসা বা অন্যান্য ভেজাল মিশিয়ে 'ল্যাক্টোমিটারে' দুগ্ধের ঘনত্ব ঠিক রাখবার চেষ্টা করে–চেয়ে দেখে না তাদের এই কার্যের ফলে নিরীহ ক্রেতা, শিশু, রোগী কি ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে; ঔষধে ভেজাল মিশিয়ে যারা সমাজের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে, রোগীকে তিলে তিলে মরণের মুখে ঠেলে দেয় সেই হত্যাপরাধীদের হাতে সমাজের অতি প্রয়োজনীয় কোন দ্রব্যেরই উৎপাদন বা বন্টনের ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। ঔষধ প্রস্তুতের অধিকার স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির হাতে থাকাই দরকার, বন্টনের ব্যবস্থাও ওই প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেরাই করতে পারে বা তারা এই কাজ, উপভোক্তা সমবায়ের মাধ্যমেও করে নিতে পারে। বিশেষ বিশেষ কয়েকটি ঔষধ প্রয়োজন বোধে রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগেও করা

যেতে পারে। বন্টন কিন্তু স্বায়ত্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান বা সমবায়-সংস্থার হাতে থাকাই ভাল।

অনতিপ্রয়োজনীয় খাদ্য (যেমন মিষ্টান্ন, পান ইত্যাদি), গৃহ-নির্মাণের উপকরণ প্রভৃতির উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থা ব্যবসায়ীদের হাতে রেখে দেওয়া যেতে পারে। ব্যাঙ্ক-পরিচালনাতেও ব্যবসায়ীদের অধিকার অস্বীকৃত হওয়া দরকার কারণ অতীতের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে অসাধু পরিচালকবর্গ দরিদ্র আমানতকারীর কষ্টার্জিত অর্থের নিরাপত্তার দিকে অনেক ক্ষেত্রেই যত্ন নেন নি ও বেপরোয়া ও বে-আইনীভাবে অর্থ-বিনিয়োগ করে নিজের লাভের পথ প্রশস্ত করে থাকুন বা না থাকুন (অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা' করেছিলেন), অনেক মধ্যবিত্তকেই পথে বসিয়েছেন ও এই মধ্যবিত্তদের মধ্যে যারা বার্দ্ধক্যের শেষ পুঁজিটুকুও হারিয়েছেন তাদের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নয়।

ব্যষ্টিগত মালিকানায় ব্যবসায়ের সুযোগ যত কমিয়ে দেওয়া যায় ও তারই সাথে সাথে সমবায় ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে উৎপাদন ও বন্টনের ব্যবস্থা যত বেশী বাড়িয়ে দেওয়া যায় ততই মঙ্গল। এই উৎপাদন ও বন্টনের ব্যাপারে রাজ্য সরকার যত কম জড়িয়ে পড়বেন জনতার

সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক ততই ভাল থাকবে। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতেও যত কম ক্ষমতা থাকে ততই ভাল।

ব্যবসায়ক্ষেত্রে চোরাবাজারি, ফাঙ্কাবাজি, ভেজাল, বে-আইনী পাচার তথা কৃত্রিম অভাবসৃষ্টির অপরাধে যারা অপরাধী তাদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেবার অধিকার সংশ্লিষ্ট রাজ্যসরকারের থাকা উচিতই-বরং ব্যাপকতর ভিত্তিতে সংঘটিত স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির (যেমন জেলা বোর্ড বা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন) হাতেও যথেষ্ট ক্ষমতা থাকা দরকার কারণ স্থানীয় কোন অপরাধীর বিরুদ্ধে যদি জনসাধারণ কোন ব্যবস্থা নিতে চায়, সেক্ষেত্রে তাদের যদি পুলিশ, থানা, মহকুমা সদর, জেলা সদর ঘুরে ছ'মাস ন'মাস বাদে রাজ্যের রাজধানীতে পৌঁছে শুনতে হয় যে এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেবার অধিকার রাজ্য সরকারের নেই, কেন্দ্রীয় সরকারের-সেটা নিশ্চয়ই খুব প্রশংসনীয় ব্যাপার হবে না। অসাধুতা নিরোধক ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্যে উপযুক্ত আইন প্রণয়নের নির্বাধ অধিকার রাজ্য-সরকারের হাতেই থাকতে হবে। ব্যবসায়-ক্ষেত্রের অসাধুতা দূর করতে হ'লে বিশ্বের সর্বত্রই যতদূর সম্ভব অবাধ বাণিজ্য প্রথা প্রচলিত হওয়া উচিত ও সকল দেশেরই ফাটকাবাজারগুলি অবিলম্বে বন্ধ করে দেওয়া দরকার।

অভিনেতা

সূক্ষ্মতর মানসকোষে সংবেদন জাগিয়ে সমাজে যাঁরা কলা রস পরিবেশন করেন, সেই গায়ক, শিল্পী বা অভিনেতারা সবাই যে ব্যবসায়ী এমন কথা বলছি না। এ ক্ষেত্রে আমি 'ব্যবসায়ী' শব্দটা মানসিকতার বিচারে ব্যবহার করছি অর্থাৎ কিনা যে সকল শিল্পী গ্রাসাচ্ছাদনের বা পরিবার প্রতিপালনের প্রয়োজনে অর্থগ্রহণ করেন তাঁদের ব্যবসায়ী বা ব্যবসায়ী মানসিকতাগ্রস্ত বলা ঠিক হবে না, তবু এ কথা ঠিক যে এই শিল্পী বা আর্টিষ্টদের (এঁদের মধ্যে অভিনেতাদেরই নাম–ডাক বেশী) একটি অতি–বৃহৎ অংশ ষোল আনার ওপর আঠারো আনা ব্যবসায়ীর মনোভাব নিয়ে চলে থাকেন। আমার বক্তব্য প্রধানতঃ এঁদের সম্বন্ধেই।

কলা রস পরিবেশনার উদ্দেশ্যই হচ্ছে মনের নিভৃত তথা অন্ধকারময় কোষগুলিতে আলোকের ঝর্ণাধারা বইয়ে দেওয়া। জীবনকে অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যে একঘেঁয়েমির পরিবেশ থেকে মুক্ত করে আনন্দোচ্ছল করে তোলা। কিন্তু উপভোক্তার এই যে আনন্দের তৃপ্তি–সমাজজীবনে এ তখনই সার্থকতা লাভ করে যখন তা কল্যাণমধুর ভাব নিয়ে সমাজের সর্বস্তরে নিজেকে উৎসারিত করে দেয় অর্থাৎ কিনা কলারস–গ্রহণের

চরম পরিণতিটাই হচ্ছে জীবের প্রতি কল্যাণমধুর ভাবসৃষ্টিতে তথা প্রসুপ্ত ভাবগুলির পুনরুজ্জীবনে। সবাই মানবেন এ জিনিসটা তখনই সম্ভব হয় যখন কলা-পরিবেশক ও কলা-গ্রহীতাদের মধ্যে থাকে একটি মাধুর্যময় সম্পর্ক। ব্যবসায়িক সম্পর্কের মাধ্যমে তা' সম্ভব নয়। তাই দেশের কলা-শিল্পকে কলা-ব্যবসায়ীর হাতে ফেলে রাখা যায় না।

যাঁরা কলা-ব্যবসায়ী নন, সত্যিকারের কলা-শিল্পী বা কলারসিক, পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে আজও তাঁদের আর্টের খাতিরে অর্থকৃচ্ছ্রতা তথা অন্যান্য বহুপ্রকারের অসুবিধা ও নির্যাতন বরণ করতে হচ্ছে। আর কলা-ব্যবসায়ীরা দু'হাতে লুঠে চলেছে নাম, যশ, অর্থ; সমাজ জীবনে তাদেরই প্রতিপত্তি। যুবক-সমাজে তারাই 'হিরো' অথবা ৰাতিকগ্রস্ত, অভিনয়-পাগলের আরাধ্য দেব-দেবী। ড্রইং-রুমে সাজানো হচ্ছে এদেরই ছবি, এ্যালবামে রক্ষিত হচ্ছে এদেরই অটোগ্রাফ। আমি বলি কলা-সরস্বতীকে লক্ষ্মীর দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে হবে; সত্যিকারের খানদানী আর্টিস্টকে দিতে হৰে অফুরন্ত সুযোগ, কলা ব্যবসায়ীদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, অভিনয় জগতের ফাক্কাবাজি বন্ধ করতে হবে।

কেউ কেউ বলে থাকেন সিনেমা, থিয়েটার ও অন্যান্য সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ বা প্রেক্ষাব্যবস্থা কেবলমাত্র শিল্পীদের দ্বারা সমবায় ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়া উচিত। প্রস্তাবটা শুণতে ভাল হ'লেও ষোল আনা সমর্থনযোগ্য নয়, কারণ যাঁরা জাত শিল্পী তাঁরা মাটির মানুষের কল্যাণ চিন্তায় বিভোর থাকলেও মন তাঁদের বাস্তবের কঠোরতা থেকে একটু দূরে দূরেই ঘোরা ফেরা করতে চায়। তাই সমবায় পরিচালনায় যে বাস্তব বুদ্ধির প্রয়োজন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁদের মধ্যে তার অভাব থাকে। আমার মনে হয় প্রেক্ষাগৃহ বা প্রেক্ষাব্যবস্থাগুলির অধিকার তথা আর্থিক-নিয়ন্ত্রণের ভার রাজ্য-সরকারের সহযোগিতায় স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির হাতেই থাকা উচিত। তবে প্রেক্ষণীয় বিষয় নির্বাচন তথা আর্ট-সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারে শিল্পীদের হাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত নিরঙ্কুশ ক্ষমতা। যোগ্যতা অনুযায়ী তথা সংসার- যাত্রার মান ও প্রয়োজন বুঝে শিল্পীদের বেতন নির্ধারিত হওয়া দরকার ও নীট্ লাভের একটি বৃহৎ অংশ 'বোনাস'-রূপে তাঁদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়াও দরকার। অবসর গ্রহণের পর তাদের জন্যে পেন্সনের ব্যবস্থাও করতে হবে।

যে কারণেই হোক দেশের তরুণ দল যাঁর বা যাঁদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকে, সমাজ তথা রাষ্ট্রের কর্তব্য ওই সকল

ব্যষ্টির আদর্শ তথা চরিত্রধারার দিকে সজাগ ও সতর্ক-দৃষ্টি রাখা, অন্যথায় তাদের প্রভাবে পড়ে সমাজের যারা আশা-ভরসা-সেই তরুণ-তরুণীদের দিক্-ভ্রান্ত হ'বার সমূহ সম্ভাবনা থেকে যায়। তাই আর্টিষ্টদের আচরণ, জীবনযাত্রা-প্রণালী তথা ব্যষ্টিগত চরিত্রের দৃঢ়তা থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। একশ্রেণীর যুবকদের কাছে যাঁরা আদর্শ-চরিত্রের অধিকারী হন তাহলে তাঁদের দ্বারা যারা প্রভাবিত-তাদেরও চারিত্রিক উন্নতি হ'তে বাধ্য, আর তাছাড়া এই দৃঢ়-চরিত্র আদর্শবাদী শিল্পী বা অভিনেতারা আরও মধুরভাবে, আরও নিখুঁতভাবে নিজেদের শৈল্পিক বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হবেন। অন্যথায় দুশ্চরিত্র, মদ্যপ, অর্থগৃধ্নু-এই দ্যাবাদেবীর দল সমাজের কলঙ্করূপেই ভক্তদের ললাটে শোভা পাবেন।

আর্ট বা শিল্পকলা জিনিসটার স্বভাবই হচ্ছে এই যে এর চর্চা করতে হ'লে একটা বিশেষ সূক্ষ্ম মনীষা তথা মানসিকতা ও তৎসহ হৃদয়াবেগের প্রয়োজন অত্যাবশ্যক। তাই শিল্পীমাত্রেই, যে সময় শিল্পগত প্রচেষ্টায় রত থাকে না, সে সময় তার সূক্ষ্ম মনীষা বা মানসিকতা ও হৃদয়াবেগকে হীন থেকে হীনতর বৃত্তির মাধ্যমে কতকটা যেন ৰাধ্য হয়েই ছুটিয়ে দিয়ে থাকে। এই মনস্তাত্ত্বিক কারণের জন্যেই আমরা সাধারণতঃ দেখে থাকি প্রেক্ষাগৃহে যার নৃত্য, গীত, অভিনয়

বা অন্যান্য কলা–নৈপুণ্য অজস্র দর্শকের অকুন্ঠ সাধুবাদ অর্জন করলো সে–ও প্রেক্ষাগৃহের বাইরে ব্যষ্টিগত জীবনে নিজের সেই অতি–সূক্ষ্ম কলাশক্তি ঠিক তদ্বিপরীত ভাবে অর্থাৎ অতিস্থূল জড়– ভোগের পানে ছুটিয়ে দেয়। অতি–সুন্দর কীর্তনীয়ার মুখে তাই শুণি হীন গালিগালাজ, অতি বৈরাগ্য–সাধকের মধ্যে দেখি অত্যধিক ভোগলিন্দা; প্রথম যৌবনে যে ছিল কঠোর নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, প্রৌঢ়ত্বে তাকেই দেখতে পাই হীন, কদাচারী লম্পট রূপে। অভিনেতারাও এর ব্যতিক্রম নয়। এই জাতীয় মনস্তাত্বিক পরিণতি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার একমাত্র পথ হচ্ছে সর্বদা বৃহতের ভাবনা নিয়ে থাকা, সর্বদা কল্যাণমধুর ভাব নিয়ে জগৎকে দেখা– শিল্পী তথা অভিনেতাকে অল্পের জন্যেও এ কথাটি ভুলে থাকা চলবে না, কারণ সমাজের ওপর তার দায়িত্ব সমধিক, তার প্রভাব অপরিমাপ্য।

আগেকার পৃথিবীর মত আজকের পৃথিবী দুরাচারিতার অভিযোগে শিল্পীদের নিয়ে স্বতন্ত্র কোনো নটসমাজ তৈরী করে রাখতে রাজী নয়, নটেরাও আজ অবশিষ্ট সমাজের অঙ্গীভূত হয়ে যাচ্ছে, আরও যাবে। আর সমাজের বৃহত্তর স্বার্থের কথা ভেবে দেখতে গেলে এই যাওয়াই উচিত। আজকের ভারতবর্ষে নটেরা কাগজে কলমে সমাজ–অন্তর্ভুক্ত না হ'লেও বাস্তব–ক্ষেত্রে

সামাজিক স্বীকৃতি পাচ্ছে বা পেতে চলেছে। তাই এ অবস্থায় নট-নটীদের ব্যষ্টিগত জীবনের শুচিতার দিকে অতি কঠোর দৃষ্টি রাখতে হবে। তারা যেন সমাজের দুষ্ট ক্ষত রূপে সর্ব-দৈহিক ব্যাধির কারণ হয়ে না দাঁড়ায়। নট-নটীরা যেখানে সামাজিক শুচিতার এই প্রাথমিক যোগ্যতা অর্জন করতে পারে নি বা অর্জন করতে অনিচ্ছুক, সেখানে সমাজ বা রাষ্ট্রের কর্তব্য অবস্থার চাপে ফেলে তাদের সদ্ভাবে জীবন-যাপন করতে বাধ্য করা। দুরাচারী নট বা নটী-সে যত উচ্চ-স্তরের প্রতিভার অধিকারী বা অধিকারিণী হোক না কেন, তাকে তার কলা-নৈপুণ্য প্রদর্শনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে স্বভাব-সংশোধন-বিদ্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

(মানুষের সমাজ, ১ম খণ্ড)

তৃতীয় খণ্ড

“আজকের সমস্যা”

এই নামে আলাদা একটা

ই-বই আছে,

তাই এখানে সেটা দেওয়া হলো না ।

বিভিন্ন মতবাদ

বর্তমানে পৃথিবীতে বেশ কয়েকটিই গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ প্রচলিত হয়েছে। সেগুলি হল–বৌদ্ধ মতবাদ, শাঙ্কর মতবাদ, পাতঞ্জল দর্শন, সাংখ্য দর্শন, আর্য সমাজ, মার্ক্সবাদ, ইহুদী মতবাদ, খ্রিষ্টীয় মতবাদ ও ইসলাম মতবাদ।

এই সব মতবাদগুলিকে পারস্পরিক সাদৃশ্য মৌলিক নীতি ও বিশ্বাসের দিক থেকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করে আলোচনা করা যায়:

(১) বৌদ্ধ ও শাঙ্কর মতবাদ

(২) পাতঞ্জল ও সাংখ্য মতবাদ

(৩) আর্য সমাজ

(৪) মার্ক্সবাদ

ইহুদী মতবাদ, খ্রিষ্টীয় ও ইসলাম মতবাদ–এ তিনটি সেমিতিয় মতবাদ।

বৌদ্ধ ও শাঙ্কর মতবাদ

আস্তিক্যবাদী সমস্ত ভারতীয় দর্শনগুলি একথা বিনা বিতর্কে স্বীকার করে নেয় যে, আত্মা হল এক অবিচ্ছিন্ন জ্ঞান–প্রবাহ। পালি ধর্মশাস্ত্রে একে বলা হয়েছে বিজ্ঞান। বলা হচ্ছে, জ্ঞান হল এক অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ; জাগতিক প্রতিটি বস্তুর নিজস্ব প্রবাহ, তরঙ্গ বা একপ্রকার গতিশীল শক্তি রয়েছে। ভারতীয় যোগ দর্শনের মতে পরমাত্মা অনন্ত জ্ঞান প্রবাহ।

"একম্ জ্ঞানম্ নিত্যমাদ্যন্ত শূন্যম্
নান্যৎ কিঞ্চিৎ বর্ত্ততে বস্তুসত্যম্।
তয়ো ভেদোহস্মিন্ ইন্দ্রিয়োপাধিনা বৈ
জ্ঞানস্যায়ম্ ভাসতে নান্যথৈব"।

(শিব সংহিতা)

ভগবান বুদ্ধ 'আত্মা' শব্দটি ব্যবহার করেননি। এ কারণেই তাঁর মৃত্যুর পর বৌদ্ধ ভিক্ষুকদের মধ্যে দার্শনিক মতভেদ দেখা দেয়। বুদ্ধের অন্তর্ধানের পর বৈশালী, পুষ্পপুর ও পাটলিপুত্রে পর পর তিনটি ধর্মসভা আয়োজিত হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল বৌদ্ধশাস্ত্র-ত্রিপিটক সংকলিত করা। এই ধর্ম-সভাগুলিতে পালি ভাষায় ত্রিপিটককে নিম্নলিখিত তিনটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে সঙ্কলন করা হয়। এই তিনটি হল:

(১) বিনয়পিটক (বৌদ্ধ ধর্মের বৈবহারিক দিক)
(২) সুত্তপিটক (সৈদ্ধান্তিক দিক)
(৩) অভিধম্মপিটক (দার্শনিক দিক)

এই তিনটি পিটক মিলে হল বৌদ্ধধর্ম-শাস্ত্র। যে সমস্ত বৌদ্ধ ভিক্ষু গোঁড়া সন্ন্যাস-মার্গকে মেনে নিয়েছিলেন, তাঁরা ত্রিপিটক বহির্ভূত কোন কিছুকেই মানতে রাজী হলেন না। এঁদের বলা হল স্থবিরবাদী বা থেরবাদী (Southern school of Buddhistic cult). আর যাঁরা ন্যায় দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হলেন তাঁদের বলা হল মহাসাঙ্ঘিক।

পালি শব্দটি এসেছে 'পল্লী' শব্দ থেকে যার অর্থ গ্রাম্য, অশিষ্ট বা স্থূল। ভগবান বুদ্ধ ধর্মদেশনা দিতেন গ্রামের

প্রচলিত কথ্য ভাষাতেই। কিন্তু হিন্দু পণ্ডিতেরা স্বাভাবিক উন্নাসিকতা বশতঃ একে ভাষা না বলে 'ভাখা' বলে অভিহিত করতেন। সাধারণ প্রাকৃতজনেরা সংস্কৃত বুঝতেন না। কেননা সংস্কৃত কেবলমাত্র পণ্ডিতেরা জানতেন।

পরবর্তীকালে মহাসাংঙিঘকেরা নিজেদের মহাযানী নামে পরিচয় দিতে লাগলেন ও স্থবিরবাদীদের হীনযানী নামে চিহ্নিত করেন। অবশ্য হীনযানীরা নিজেদের থেরবাদী বলতেন। কনিষ্ক, হবিষ্ক ও বসিষ্কের সময় ছাড়া হীনযানীরা ভারতবর্ষে কখনোই রাজানুকূল্য পাননি। তাই ভারতবর্ষে হীনযানীরা তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। পক্ষান্তরে রাজানুকূল্যের কারণে মহাযানী মতাবলম্বীদের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। হীনযানীদের মতবাদ প্রচারিত হয় কেবলমাত্র সিংহল, ব্রহ্মদেশ, শ্যামদেশ, জাবা, বোর্ণিও প্রভৃতি

ভগবান বুদ্ধ 'আত্মা' শব্দটি ব্যবহার করেননি। এ কারণেই তাঁর মৃত্যুর পর বৌদ্ধ ভিক্ষুকদের মধ্যে দার্শনিক মতভেদ দেখা দেয়। বুদ্ধের অন্তর্ধানের পর বৈশালী, পুষ্পপুর ও পাটলিপুত্রে পর পর তিনটি ধর্মসভা আয়োজিত হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল ৰৌদ্ধশাস্ত্র-ত্রিপিটক সংকলিত করা। এই ধর্ম-সভাগুলিতে পালি ভাষায় ত্রিপিটককে নিম্নলিখিত তিনটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে সঙ্কলন করা হয়। এই তিনটি হল:

(১) বিনয়পিটক (বৌদ্ধ ধর্মের বৈবহারিক দিক)
(২) সুত্তপিটক (সৈদ্ধান্তিক দিক)
(৩) অভিধম্মপিটক (দার্শনিক দিক)

এই তিনটি পিটক মিলে হল বৌদ্ধধর্ম-শাস্ত্র। যে সমস্ত বৌদ্ধ ভিক্ষু গোঁড়া সন্ন্যাস-মার্গকে মেনে নিয়েছিলেন, তাঁরা ত্রিপিটক বহির্ভূত কোন কিছুকেই মানতে রাজী হলেন না। এঁদের বলা হল স্থবিরবাদী বা থেরবাদী (Southern school of Buddhistic cult). আর যাঁরা ন্যায় দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হলেন তাঁদের বলা হল মহাসাঙ্ঘিক।

পালি শব্দটি এসেছে 'পল্লী' শব্দ থেকে যার অর্থ গ্রাম্য, অশিষ্ট বা স্থূল। ভগবান বুদ্ধ ধর্মদেশনা দিতেন গ্রামের প্রচলিত কথ্য ভাষাতেই। কিন্তু হিন্দু পণ্ডিতেরা স্বাভাবিক উন্নাসিকতা বশতঃ একে ভাষা না বলে 'ভাখা' বলে অভিহিত করতেন। সাধারণ প্রাকৃতজনেরা সংস্কৃত বুঝতেন না। কেননা সংস্কৃত কেবলমাত্র পণ্ডিতেরা জানতেন।

পরবর্তীকালে মহাসাংঙিঘকেরা নিজেদের মহাযানী নামে পরিচয় দিতে লাগলেন ও স্থবিরবাদীদের হীনযানী নামে

চিহ্নিত করেন। অবশ্য হীনযানীরা নিজেদের থেরবাদী বলতেন। কনিষ্ক, হবিষ্ক ও বসিষ্কের সময় ছাড়া হীনযানীরা ভারতবর্ষে কখনোই রাজানুকূল্য পাননি। তাই ভারতবর্ষে হীনযানীরা তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। পক্ষান্তরে রাজানুকূল্যের কারণে মহাযানী মতাবলম্বীদের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। হীনযানীদের মতবাদ প্রচারিত হয় কেবলমাত্র সিংহল, ব্রহ্মদেশ, শ্যামদেশ, জাবা, বোর্ণিও প্রভৃতি দেশে। অপরপক্ষে মহাযানী মতবাদ প্রচারিত হয় ভারত, সাইবেরিয়া, জাপান তিব্বত প্রভৃতি দেশে।

মহাযানীদের মধ্যে চতুর্বিধ দার্শনিক মতবাদ প্রচলিত রয়েছে। এই মত- পার্থক্যের কারণ হল আত্মা ও তার বিষয় সম্পর্কিত বিভিন্ন মতবাদ। ভগবান বুদ্ধ 'আত্মা' বোঝাতে পালিতে 'অত্তা' শব্দটি ব্যবহার করতেন। আবার এই 'অত্তা' শব্দটি 'নিজ' অর্থেও প্রযুক্ত হয়েছে। আসলে ভগবান বুদ্ধ ঠিক কী অর্থে শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন তা ৰৌদ্ধ ভিক্ষুরা সম্যকভাৱে অনুধাবন করতে পারেন নি।

চার্বাক

বুদ্ধের সময়ে নাস্তিক্য মতবাদ প্রবল হয়ে উঠেছিল। নাস্তিকদের মধ্যে অন্যতম পণ্ডিত ছিলেন অজিতকেশকাম্বলী।

নাস্তিক মতবাদের বেশীর ভাগ গ্রন্থ দুর্বোধ্য ভাষায় লিখিত হয়েছিল। তাই এগুলি বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেনি। অজিতকেশকাম্বলী চার্বাকের জড়দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন। বৌদ্ধ দর্শনকে কিন্তু ঠিক জড়দর্শনের পর্যায়ে ফেলা যাবে না।

চার্বাক দর্শন কেবলমাত্র চতুর্ভূতকে স্বীকার করে ও এই দর্শন দেহাত্মবাদ নামে পরিচিত। চার্বাক–স্বীকৃত চতুর্ভূত হল ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ। তাঁর মতে, চতুর্ভূতের মিশ্রণের ফলেই চৈতন্যের সৃষ্টি হয়। যেমন চুন ও খদিরের মিশ্রণে তৈরী হয় লাল রঙ। চার্বাকের মতে, একইভাবে প্রকৃত অস্তিত্ব না থাকা সত্ত্বেও চৈতন্যের সৃষ্টি হয়েছে। চার্বাক আত্মা, পরমাত্মা ও বেদকে স্বীকার করেননি ও একারণেই তিনি নাস্তিক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিলেন। ভারতীয় দর্শনে যাঁরা আত্মা, পরমাত্মা ও বেদ–তিনটের কোনটাকেই বিশ্বাস করেন না–তাঁদের নাস্তিক বলা হয়।

পূর্ব মীমাংসা দর্শন পরমাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেনি। অন্যদিকে সাংখ্য– প্রণেতা কপিল আত্মা ও বেদকে স্বীকার করলেও পরমাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন নি। ষড়দর্শন বেদকে স্বীকার করে। ষড়দর্শনগুলি হ'ল:

(ক) সাংখ্য

১। কপিল–সাংখ্য পুরুষ প্রকৃতি ও বেদকে স্বীকার করে। কিন্তু পরমাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে না।

২। পাতঞ্জল ও সাংখ্য বহু পুরুষ ও এক প্রকৃতির অস্তিত্বে বিশ্বাসী! এই দুই দর্শনের মতে জগৎস্রষ্টাও মুক্ত পুরুষ নন।

(খ) ন্যায়

৩। গৌতমীয় ন্যায়।
৪। কণাদীয় ন্যায় (বৈশেষিক)।

(গ) মীমাংসা

৫। জৈমিনীর পূর্ব মীমাংসা ক্রিয়াকাণ্ডে বিশ্বাসী ও যাঁরা এ মতাবলম্বী তাঁরা স্বর্গ–নরকের তত্ত্বে বিশ্বাস করেন।

৬। বাদ্রায়ণ ব্যাসের উত্তর মীমাংসা ব্রহ্ম ও বেদে বিশ্বাসী হলেও আত্মা ও জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। এই দর্শন সাধারণতঃ বেদান্ত দর্শন হিসেবে পরিচিত।

(ঘ) বৌদ্ধ দর্শন

এই দর্শন পঞ্চভূতে বিশ্বাসী।

(ঙ) চার্বাক

চতুর্ভূত স্বীকার করে।

ৰৌদ্ধ ও চার্বাক দর্শন ষড়্দর্শনের আওতায় আসে না। এই দুই দর্শন বেদে বিশ্বাস করে না।

প্রমাণ তিন ধরণের। এগুলি হল প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম।

চার্বাক প্রত্যক্ষকে একমাত্র প্রমাণ ৰলে স্বীকার করেন।

"প্রত্যক্ষৈক প্রমাণবাদিতয়া অনুমানাদে
অনঙ্গিকারেণ প্রমাণ্যাভাবাৎ।"

বুদ্ধ কর্মফলকে স্বীকার করেন কিন্তু চার্বাক করেন না। চার্বাকের মতে–

"যাবজ্জীবং সুখং জীবং নাস্তি মৃত্যুরগোচরঃ
যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতম্ পীবেৎ॥
ন স্বর্গো নাপবর্গো বা নৈবাত্মা পারলৌকিকম্
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ।

'দেহপরিণামবাদ' নামে আর একটি চার্বাকীয় দর্শন আছে।

"চতুর্ভ্যঃ খলুভূতেভ্যঃ
চৈতন্যমুপজায়তে
কিম্বাদিভ্যঃ সমতেভ্যঃ
দ্রব্যেভ্যঃ মদশক্তিবৎ।

এই দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় ৰৌদ্ধদর্শন চার্বাকীয় দর্শনের চেয়ে উন্নততর। ভগবান বুদ্ধ ৰলেন–
"অত্তা হি অত্তানাম্ নাথঃ"

ৰৌদ্ধধর্মমত

ভারতের ৰৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠার পেছনে বেশ কয়েকটি কারণ ছিল। তার মধ্যে প্রধান প্রধান কারণগুলি হল:

(১) পণ্ডিতগণ সাধারণ মানুষের মধ্যে দর্শন প্রচার করেন নি। তাঁরা প্রাকৃত ভাষাকে ঘৃণা করেছেন ও তাকে অৰজ্ঞাবশতঃ 'ভাখা' বলে অভিহিত করেছেন।

(২) সেই সময় কোন প্রসিদ্ধ দার্শনিক বা তত্ত্বদর্শী ছিলেন না।

(৩) সাধারণ জনগণ পণ্ডিতদের মেনে নেননি।

(৪) ওই সময়ের দুই দিপাল আচার্য শ্রীসঞ্জয় ও শ্রীগয়া-কশ্যপ বুদ্ধকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হননি।

এই সমস্ত কারণেই বৌদ্ধ ধর্মমত ভারতে ব্যাপকভাবে প্রচারিত ও গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছিল।

বৌদ্ধ ধর্মমতে আত্মার পুনর্জন্ম স্বীকার করে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এমন একটি প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই উত্থিত হয়েছিল যে, আত্মার অস্তিত্ব যখন স্বীকার করা হচ্ছে না, তবে পুনর্জন্ম হয় কার? বৌদ্ধভিক্ষু ও পরবর্তীকালে মহাযানী পণ্ডিতদের মধ্যে এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে বিতর্ক ও মতভেদের সূচনা হয়েছিল।

আবার বুদ্ধদেব কর্মফল স্বীকার করেছেন। সংগত কারণেই প্রশ্ন উঠেছিল, কে কর্ম সম্পাদন করে ও কর্মফল কার দ্বারা

প্রাপ্ত হয়? কাজেই এক্ষেত্রে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া সম্ভব নয়।

বুদ্ধদেবের শেষ জীবনে তাঁর শিষ্যরা তাঁর কাছ থেকে দুটি প্রশ্নের উত্তর চেয়েছিলেন। প্রশ্ন দুটি হল "ঈশ্বর কী আছেন?” ও "এটা কি সত্য যে ঈশ্বর নেই?” দুটি প্রশ্নের উত্তরেই বুদ্ধদেব নীরব থাকেন। তাঁর এই নীরবতার অর্থ করতে গিয়ে একদল শিষ্য ধরে নেন, ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই। কিন্তু দ্বিতীয় দল ধরে নেন, ঈশ্বর আছেন। অন্যদিকে তৃতীয় একপক্ষ এই ব্যাখ্যা উপস্থিত করেন ঈশ্বর আছেন কিন্তু তাঁর এই অস্তিত্ব অস্তি ও নাস্তির ঊর্ধ্বে। অর্থাৎ পরমচৈতন্য অনির্বচনীয় ও মানসাতীত।

"যতো বাচা নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মনো বিদ্বান্ মা বিভেতি কুতশ্চনঃ ।।"

বৌদ্ধ মায়াবাদ

বৌদ্ধ মায়াবাদ চারটি শাখায় বিভক্ত।
(১) প্রত্যক্ষ বাহ্যবস্তুবাদ বা সৌতান্ত্রিক দর্শন।
(২) অনুমেয় বাহ্যবস্তুবাদ বা বৈভাষিক দর্শন।

(৩) সর্বশূন্যবাদ বা মাধ্যমিক দর্শন।
(৪) ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ বা ৰৌদ্ধ যোগাচার।

(১) প্রত্যক্ষ বাহ্য বস্তুবাদ

এই দর্শনে অনাদি ও অনন্তরূপী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে। বলা হয়েছে, যখন চৈতন্য আলয়ীভূত হয় তখন তা জ্ঞানে রূপান্তরিত হয় (যার বস্তুরূপ ধারণের যোগ্যতা আছে তা হল 'আলয়')।– বাহ্যজগৎ ক্ষণস্থায়ী কিন্তু তীব্র গতিশীলতার দরুণ (সঞ্চর ও প্রতিসঞ্চর) এর ধারাবাহিক অস্তিত্ব অনুভূত হয়। (হিন্দু দর্শনে সঞ্চর বলতে বোঝায় ব্রহ্ম থেকে বহির্মুখী গতি ও প্রতিসঞ্চর বলতে বোঝায় ব্রহ্মাভিমুখী গতি। অর্থাৎ সঞ্চর হোল ব্রহ্মের বিকর্ষণী শক্তি ও প্রতিসঞ্চর হল ব্রহ্মের আকর্ষণী শক্তি)।

(২) অনুমেয় বাহ্য বস্তুবাদ

এই মতবাদ জ্ঞানপ্রবাহকে স্থায়ী 'সত্তা' হিসেৰে মেনে নেয়। বাহ্য জগৎ রয়েছে কিন্তু তাকে কখনই উপলব্ধি করা যায় না। যখন চৈতন্য বা জ্ঞান তরঙ্গ আসে, তখন মন চিত্তের সংস্কারানুসারে রূপগ্রহণ করে।

মনের গৃহীত রূপকে সত্য বলে মেনে নেওয়া হয়। জ্ঞান যখন আলম্বনের সংস্পর্শে আসে তদাকার প্রাপ্ত হয়। তারা বাহ্যিক আলম্বনকে অনুভূত বিষয় হিসেবে গ্রহণ করে।

(৩) সর্বশূন্যবাদ

একে মাধ্যমিক দর্শন নামেও অভিহিত করা হয়। এই দর্শনের প্রণেতা হলেন শ্রীনাগার্জুন। তিনি পাঞ্চভৌতিক জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করেননি। তাঁর মতে আমরা যে বাহ্য জগৎকে প্রত্যক্ষ করি তা হল মায়া। এই দর্শনের সঙ্গে শঙ্করাচার্যের মায়াবাদের (ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা) সাদৃশ্য লক্ষণীয়। শ্রীনাগার্জুনের মতে 'কিছু-না' থেকে বিশ্বের উদ্ভূতি... অভাব থেকেই ভাবের সৃষ্টি। এ বিশ্ব স্বপ্ন ছাড়া কিছু নয়। এই দর্শন কেবলমাত্র বর্তমানকে স্বীকার করে-অতীত ও ভবিষ্যৎকে নয়। এই দর্শনে এ কথাও বলা হয়েছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড 'কিছু-না'তে বিলীন হয়ে যাবে।

(৪) ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ

এ দর্শন ভৌতিক জগৎকে স্বীকার করে না। এখানে সব কিছুই চিরন্তন। এমনকি আলম্বনও চিরন্তন। বহির্বিশ্বে যা কিছু প্রত্যক্ষগোচর সে সবই হল অভ্যন্তর আলম্বনের প্রতিক্রিয়া

মাত্র। আত্মা হল আমিত্ববোধের সম্মিলিত রূপ। এটি অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ না হওয়া সত্ত্বেও এর দ্রুত সৃষ্টি ও বিলোপ একে দৃশ্যতঃ অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ হিসেবেই উপস্থিত করছে। ভগবান শঙ্করাচার্যের সময়ে বৌদ্ধদের মধ্যে কোন ভাল দার্শনিক বা তত্ত্বদষ্টা ছিলেন না। এছাড়া (ঠিক ওই সময়েই বৌদ্ধ ধর্মমতের বিভিন্ন শাখাপ্রশাখার মধ্যে পারস্পরিক মতবিরোধ চূড়ান্ত আকার ধারণ করে। এই সময়ে শ্রীমণ্ডন মিশ্র ছিলেন একমাত্র পণ্ডিত যিনি সর্বশূন্যবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি একজন ক্রিয়াকাণ্ডীও ছিলেন। কিন্তু শঙ্করাচার্যের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে তিনি পরাস্ত হন। বৌদ্ধদর্শন চারটি সত্যের কথা বলেছে। এগুলিকে 'চতুরার্য সত্য' বলা হয়। এগুলি হল:

(১) দুঃখ
(২) দুঃখের কারণ
(৩) দুঃখের নিবৃত্তি
(৪) দুঃখ নিবৃত্তির উপায়

দুঃখবাদের বিকৃতি থেকেই পরবর্তীকালে অতিসুখবাদ নামক একটি দর্শনের উদ্ভব হয়েছিল। এটি বাঙলা, অসম ও তিব্বতে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল।

দুঃখ হল আর্যসত্য। কিন্তু এটি এক ভুল ব্যাখ্যা। কেননা একমাত্র মনই দুঃখকে উবলব্ধি করতে সক্ষম। কাজেই এটি কেবল আপেক্ষিক সত্য হিসেৰে পরিগণিত হতে পারে–পরম সত্য নয়।

শাঙ্কর দর্শন

শঙ্করাচার্য ছিলেন একজন শৈব তান্ত্রিক। আর এইজন্যে তিনি তন্ত্রবাদের বিরোধিতা করেননি। তিনি নির্গুণ ব্রহ্মে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর মতবাদের সঙ্গে ৰৌদ্ধ শূন্যবাদের কিছু ক্ষেত্রে সাদৃশ্য দেখা যায়। শঙ্করাচার্য বাহ্য জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করেননি। তিনি গুণান্বিত মায়াবাদকে মেনে নিয়েছিলেন। তারই প্রভাবের দরুণ ৰৌদ্ধ তন্ত্র তিরোহিত হয়। কিন্তু হিন্দুতন্ত্রের দেব-দেবীরা রয়ে গেলেন। আজও সাধারণ মানুষ ভীতম্মন্যতার দরুণ ৰৌদ্ধতান্ত্রিক দেবী তারা, মনসা (সর্প দেবী), শীতলা, বারাহী প্রভৃতি দেবীদের পূজা করে থাকেন।

শঙ্করাচার্য যখন তাঁর মতবাদ প্রচার করেন তখন শূন্যবাদীদের বিশেষ আধিপত্য ছিল। শ্রীশঙ্করাচার্য শ্রীবাদ্রায়ণ ব্যাসের উত্তর মীমাংসাকে স্বীকার করেছেন।

বৌদ্ধ দার্শনিকদের সঙ্গে শ্রীশঙ্করাচার্যের আলোচনা কৌতূহলোদ্দীপক। যেমন–শূন্যবাদীরা বলেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড শূন্য থেকে উদ্ভূত ও তা শূন্যেই বিলীন হবে–জগৎ স্বপ্নমাত্র। শূন্যবাদীদের এই বক্তব্যকে খণ্ডন করতে গিয়ে শঙ্করাচার্য বললেন যদি জগৎ শূন্য বা স্বপ্নরাজ্য হয় তবে এই স্বপ্নকে প্রত্যক্ষ করার জন্যে কোন একটি সাক্ষী সত্তার অস্তিত্ব প্রয়োজনীয়। উত্তরে শূন্যবাদীরা বললেন, সাক্ষীসত্তা বলে কিছু নেই। ভ্রমবশতঃ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিদৃশ্যমান বলে মনে হচ্ছে। যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম। শঙ্করাচার্যের উত্তর: এ কখনও সম্ভবপর নয়। শঙ্করাচার্য পুনরায় পূর্বযুক্তির অবতারণা করে বললেন, যদি স্বপ্ন দেখার লোকই না রইল স্বপ্ন দেখবে কে? জগৎ যদি রজ্জুতে সর্পভ্রমের মত মিথ্যা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে এটাও মেনে নিতে হয় যে, রজ্জবৎ জগতের কিছু একটা রয়েছে যাকে মানুষ ভ্রমবশতঃ বিশ্ব বলে মনে করছে। যেমন রজ্জু আছে বলেই তো তাকে সর্প বলে ভ্রম হওয়া সম্ভব। এছাড়া একজন মানুষও থাকবে যে এই ভুলটা করবে। অনুরূপভাবে এই জগৎটাকে মায়ারূপে দেখবার জন্যেও তো একটা লোকের দরকার। এর নির্গলিতার্থ হল, জগৎ ব্যতীত অপর সত্তার অস্তিত্বও স্বীকার্য। তাই মাধ্যমিক দার্শনিকদের বক্তব্য হল:

এখানে শূন্য বলতে 'কিছু-না'-কে বোঝাচ্ছে না। তোমরা যাকে ব্রহ্ম বল, আমরা তাকেই শূন্য ৰলি।

"যথা শূন্য বাদিনাং শূন্যম্
ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদাংস্তথা ॥"

শঙ্করাচার্য উত্তরে বললেন, এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, যে দেখে অর্থাৎ দ্রষ্টা ও যাকে দেখা হয় অর্থাৎ বিষয় উভয়ই ভ্রম। কেননা যেখানে দ্রষ্টা ৰলে কিছু নেই সেখানে রজ্জুতে সর্পভ্রমের প্রশ্ন ওঠে না। শূন্যবাদীরা শঙ্করাচার্যের এই অকাট্য যুক্তির কোন জবাৰ দিতে পারেন নি। তবে ক্ষণিকবাদীরা যুক্তি দিয়ে বলেছেন, এই ভ্রম সর্বদা ক্ষণিক। উত্তরে শঙ্করাচার্য ৰলেন, তাঁর মতে ব্রহ্ম অনাদি ও অনন্ত। কিন্তু আপনাদের ক্ষণ একমুহূর্তের জন্যে সক্রিয় ও পরমুহূর্তে অন্তর্হিত। অতএব প্রশ্ন এই, ক্ষণিক সত্তা কোথা থেকে এলো? এই সৃষ্টি ও বিলোপের সময়টুকুর মধ্যে তাহলে অবশ্যই কোন এক সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করতে হবে। ক্ষণিকবাদীদের উত্তর, সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তা বিলুপ্ত হচ্ছে। শঙ্করাচার্য ৰললেন, এতে কোনো সত্তার অস্তিত্ব প্রমাণিত হচ্ছে না। ক্ষণিকবাদীরা এর সদুত্তর জানেন না। তথাপি তাঁরা ৰলে চলেন, এই অস্তিত্ব অতি নগণ্য। কিন্তু শঙ্করাচার্যের প্রশ্নের যথার্থ উত্তর এটা হতে পারে না।

শঙ্করাচার্যের অকাট্য যৌক্তিকতা ও প্রবল তার্কিকতার কাছে কেবল শূন্যবাদী বা ক্ষণিকবাদীরা নন প্রত্যক্ষ বাহ্যবস্তুবাদী ও অনুমেয় বাহ্যবস্তুবাদী ৰৌদ্ধ পণ্ডিতেরাও পরাস্ত হন। শেষাবধি এই সৰ বিজিত দার্শনিকেরা শঙ্করাচার্যের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করেন ও কুলকুণ্ডলিনী তত্ত্বকে নিঃশর্তে স্বীকার করে নেন। এরই ফলশ্রুতি স্বরূপ বৌদ্ধ যোগের উত্থান সূচিত হয়।

শাঙ্কর দর্শনের ক্রটি

শঙ্করাচার্যের মতে জগৎ মায়ার প্রভাবে এক স্থির বিষয়ের ওপর আধারিত। একে তিনি ব্রহ্ম বলে অভিহিত করেছেন। তিনি রজ্জুতে সর্পভ্রমের তুলনাটি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, সর্প বলে ভ্রম কার পক্ষে করা সম্ভব? তার পক্ষেই সম্ভব যে সর্প কী জিনিস সে সম্পর্কে ইতোমধ্যে জ্ঞাত। ব্রহ্মকে বিশ্ব ৰলে মনে হচ্ছে। এর অর্থ দাঁড়ায় প্রকৃত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব আছে ও কোন না কোন স্থানে তা অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। অর্থাৎ শঙ্করাচার্যের 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা'–এই মূল বক্তব্যটি ভিত্তিহীন হয়ে পড়েছে। আশ্চর্যের বিষয়, শঙ্করাচর্যের দর্শনের এই অংশটি সম্পর্কে ৰৌদ্ধরা কোন

প্রশ্ন করেন নি। আর সে কারণেই শাঙ্কর মত অনায়াস প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল।

শঙ্করাচার্য জীব ও জগতের অস্তিত্ব মানেননি। অথচ কীভাবে জগৎ সম্পর্কে ভ্রমোৎপাদন সম্ভব হচ্ছে তার কোন ব্যাখ্যা দেননি।

"অষ্ট কুলাচলাঃ সপ্ত সমুদ্রাঃ
ব্রহ্ম পুরন্দর দিনকর রুদ্র;
ন ত্বং নাহং নায়ং লোকঃ
ব্যর্থ কিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ।"

অর্থাৎ জগৎ আদৌ সৃষ্টি হয়নি; সুতরাং সগুণ ব্রহ্ম ৰলে কিছু নেই। শঙ্করাচার্য কেবল নির্গুণ ব্রহ্মকে স্বীকার করেছেন। তাঁর বক্তব্য হল, জগৎ স্বপ্নমাত্র ও এই স্বপ্নের যিনি দ্রষ্টা তিনিও ব্রহ্ম। কেননা জীব ৰলে কিছু নেই। শঙ্করাচার্যের বক্তব্যের অসারত্ব এখানে অত্যন্ত স্পষ্ট। কেননা ব্রহ্ম নির্গুণ হলে দেখা ক্রিয়াটা তার দ্বারা সম্ভব হয় কী করে। দেখা ক্রিয়াটা যে একটি গুণ বিশেষ তা শঙ্করাচার্যের দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল।

আবার শঙ্করাচার্য ৰলেন, যা কিছু দেখা হয় বা অভিজ্ঞতা লাভ করা হয় তা সৰই হয়ে থাকে মায়ার প্রভাবে! অর্থাৎ প্রকারান্তরে স্বীকার করে নেওয়া হল মায়াও একটি সত্তা। যা শাঙ্কর অদ্বৈতবাদে কোনক্রমে স্বীকার করা হয় না।

শঙ্করাচার্য সাধনার প্রয়োজনীয়তাও স্বীকার করেন অথচ জীবের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। সঙ্গত কারণে প্রশ্ন ওঠে জীবের অস্তিত্ব যখন অসিদ্ধ তখন সাধনা করৰে কে?

শঙ্করাচার্যের মতবাদের আর একটি ত্রুটি হল, তিনি ব্রহ্মকে একাধারে অনাদি ও অনন্ত ৰলে স্বীকার করেও মায়ার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। দ্বিতীয়তঃ তাঁর মতে মায়ার প্রভাবে বিশ্বজগৎ সৃষ্টি হয়ে থাকলে ব্রহ্ম কীভাবে নির্গুণ থাকে? এছাড়া মায়ার প্রভাবের কথা যখন বলা হচ্ছে তখন এটা প্রমাণিত হয় যে, যা ব্রহ্মকে প্রভাবিত করতে সক্ষম তা ব্রহ্মের চেয়ে বৃহত্তর শক্তি। অথচ শঙ্করাচার্যই বলেন, মায়া বলতে প্রকৃত কোন সত্তা নেই। এটি ভ্রমমাত্র। মরুভূমিতে যেমন মানুষ দৃষ্টিবিভ্রম বশতঃ অনেক দূর থেকে জল, ঘরবাড়ী ও গাছপালার ছবি দেখতে পায়, যদিও আসলে সেখানে কিছুই নেই। জ্ঞানের অনুপপত্তিই মানুষকে ভ্রমাৰদ্ধ

করে। অতএব প্রশ্ন ওঠে, ব্রহ্মেই (দ্রষ্টাও ব্রহ্ম) যখন বিকার উপস্থিত হয় তাহলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে কীভাবে ভ্রম বলে মেনে নেওয়া যায়?

শঙ্করাচার্য আরও বলেছেন, ব্রহ্ম যেখানে মায়াও সেখানে। প্রশ্ন ওঠে, তাহলে মায়াকে অস্তিত্বহীন বলা যায় কী করে? যদি মায়া না থাকে তাহলে ব্রহ্মের ওপর প্রভাব বিস্তারের কথা ওঠে কী করে? যৌক্তিকতার এই ত্রুটি সংশোধন করতে গিয়ে শঙ্করাচার্য বলেছেন, মায়া বাস্তবিক অস্তিত্বহীন নয়। একে অনির্বচনীয় এমন বলা চলে। এখানেও প্রশ্ন এসে পড়ে, ব্রহ্ম যখন মায়াকে সৃষ্টি করেন নি তাহলে মায়ার স্রষ্টা কে? আর সগুণ ব্রহ্মই বা ৰলা হবে না কেন?

প্রকৃতপক্ষে তার্কিকতার শক্তি ও বাগাড়ম্বর দিয়েই শঙ্করাচার্য ৰৌদ্ধ দার্শনিকদের পরাস্ত করেছিলেন। কূট তার্কিকতার ধূম্রজালে তিনি সহজেই প্রতিপক্ষের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করেছিলেন একথা স্বীকার না করে উপায় নেই।

যাই হোক, শঙ্করের 'মায়া' ও আনন্দমার্গের 'প্রকৃতি' এক জিনিস নয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, ন্যায়-মঞ্জরীর প্রণেতা জয়ন্ত ভট্ট শঙ্কর মতের একজন তীব্র সমালোচক।

পাতঞ্জল ও সাংখ্য

১) উভয় দর্শনে বহু পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে।

২) উভয় দর্শনে এই মত ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এই পুরুষদের সন্তুষ্টিবিধানের অভিপ্রায়ে প্রকৃতি এই জগৎকে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু এই মত গ্রহণযোগ্য নয় কেননা ভোগ বা সন্তুষ্টি মনের অস্তিত্ব ব্যতীত সম্ভব নয়। পুরুষদের মনই নেই, অতএব তার সন্তুষ্টি বিধানের জন্যে প্রকৃতি. কর্তৃক বিশ্বজগৎ রচনার তত্ত্বটি স্বীকার করা যায় না।

৩) প্রকৃতিকে পুরুষ থেকে পৃথক সত্তা হিসেৰে দুই দর্শনে মত প্রকাশ করা হয়েছে। এই মতও গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা প্রকৃতি হল পুরুষের একমাত্র শক্তি। যেমন অগ্নির দাহিকাশক্তি অগ্নি থেকে কোন পৃথক সত্তা নয়। এই দুই দর্শনে পুরুষ ও প্রকৃতি পৃথকভাবে কল্পিত হওয়ায় এই দার্শনিকদের দ্বৈতবাদী নামেও অভিহিত করা হয়।

৪) সাংখ্য দর্শন ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয়। এই দর্শনকে নিরীশ্বরবাদ বলে চিহ্নিত করা হয়। অন্যদিকে পাতঞ্জল মত ব্রহ্মকে স্বীকার করে না, কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী। তাই পাতঞ্জল দর্শনকে সেশ্বরবাদ বলা হয়।

৫) উভয়দর্শনে মূর্তিপূজার স্বীকৃতি আছে।

আর্যসমাজ

১) আর্য সমাজ বিশ্বাস করে জীব, জগৎ ও ব্রহ্ম–তিনই অনাদি। এই বিশ্বাসকে গুরুত্ব দেওয়ার অর্থ এটা মেনে নেওয়া যে, ব্রহ্মস্বভাবে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্যে জীবের প্রয়াসের কোন প্রয়োজন নেই। জীব, জগৎ ও ব্রহ্ম স্বভাবগত ভাবেই এক। এই বিশ্বাস গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা জীবের পক্ষে সাধনা অর্থাৎ ধর্মচর্চা ছাড়া গত্যন্তর নেই। এছাড়া এই ধর্মবিশ্বাস দিয়ে বিশ্বজগতের ক্রিয়া ও প্রগতির কারণও ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর নয়।

২) যজ্ঞকে কর্ম হিসেবে নয়, সাধনা হিসেবে সম্পাদন করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যজ্ঞ তো কর্মই। অথচ আর্য সমাজে বিশেষ এক রীতিতে অগ্নিতে আহুতি প্রদানকে

যজ্ঞ বোঝানো হয়। এ ধরণের যজ্ঞকার্যের কোন যৌক্তিকতা থাকতে পারে না।

৩) প্রলয় তত্ত্বেও এঁরা বিশ্বাসী। কিন্তু জীব, জগৎ ও ব্রহ্ম সৰই যখন অনাদি তখন এর মধ্যে প্রলয়ের স্থান কী করে থাকা সম্ভব?

মার্ক্সবাদ

১) মার্ক্সবাদীরা মানুষের মধ্যে সমতা বিধানের যে বিশ্বাস পোষণ করেন তার সবটাই সৈদ্ধান্তিক ও বাস্তব যুক্তিতেই বর্জনীয়। কেননা জগতে প্রতিটি মানুষের সঙ্গে প্রতিটি মানুষের প্রভেদ আছে। সুতরাং তাদের মধ্যে সমতাবিধানের প্রয়াস ভিত্তিহীন।

২) মানুষের দারিদ্র্যের ভিত্তিতে এই মতবাদের স্বীকৃতি ও প্রসার। তাই দেখা যায় দারিদ্র্য জর্জরিত অঞ্চলে এর যা কিছু প্রভাব প্রতিপত্তি।

৩) অন্যান্য উপধম ৰা সংঘটনের প্রতি ঘোরতর অসহিষ্ণুতা।

৪) কাল্পনিক সাম্য-এর লক্ষ্য।

৫) হিংসাকে আশ্রয় করে এই মতৰাদ অস্তিত্ব বজায় রাখে।

এ ছাড়া ইহুদী মতবাদ, খ্রিষ্টীয় মতবাদ ও ইসলাম মতবাদও রয়েছে- এগুলি সেমিতিয় মতৰাদ বা মজ।....

(তাত্ত্বিক প্রবেশিকা)

সামাজিক মনস্তত্ব

সমাজে মানুষের অস্তিত্ব রক্ষা করতে নিম্নোক্ত মৌল উপাদানগুলি একান্ত আবশ্যক। এগুলি হল: (১) একতা, (২) সামাজিক নিরাপত্তা, (৩) শান্তি।

এই মৌল উপাদানগুলির জন্যে প্রকৃতপক্ষে যা দরকার নিম্নে তা আলোচনা করা হচ্ছে।

(১) একতা:

যে কোন সমাজে বা সমাজ সংরচনায় সদস্যদের মধ্যে একতা একান্ত অপরিহার্য। তা না হলে সামাজিক সংরচনা বিপর্যস্ত হতে বাধ্য। সমাজ- সদস্যদের অত্যধিক বৈয়স্টিক স্বার্থ কেন্দ্রিকতার ফলে একতার অভাব, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিধাভিত্তিক দলসৃষ্টি, অন্যের কার্যধারা বোঝার মত মানসিক উদারতার অভাব-এগুলো শুধু কোন সমাজের অধঃপতনেরই সূচনা করে না, এগুলো ওই সমাজকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে একেবারে নিশ্চিহ্নও করে দেয়। এই পৃথিবীর ক্ষুদ্র পরিচিত ইতিহাসে বহু দল ও সাম্রাজ্যের অবলুপ্তির দৃষ্টান্ত বিরল নয়। অতএব সমস্যা হল, সমাজের একতা রক্ষা করা। সমাজের সভ্যদের নিম্নোক্ত ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করতে পারলে সামাজিক ঐক্যের প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব-(ক) সাধারণ আদর্শ, (খ) জাতিভেদ বিহীন সমাজ, (গ) সামূহিক সামাজিক অনুষ্ঠান উৎসব, (ঘ) চরম দণ্ডপ্রথা রাহিত্য।

(ক) সাধারণ আদর্শ: একথা প্রায়ই শোণা যায় যে যুদ্ধের সময় কোন দেশের মানুষের মধ্যে যেভাবে একতা দেখতে পাওয়া যায় তেমনটি অন্য সময় দেখতে পাওয়া যায় না।

এটা সম্পূর্ণভাবেই মাতৃভূমির প্রতি ভালবাসার জন্যেই সম্ভব হয়। কারণ তখন সবার একটাই আদর্শ বা লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় যুদ্ধের বিভীষিকার মোকাবিলা করা। এই যে সাধারণ আদর্শ এটা নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী।যুদ্ধের বিপদ কেটে গেলে সাধারণ আদর্শও লুপ্ত হয়ে যায়। আমাদের আনন্দমার্গে শিশুকাল থেকেই সাধারণ আদর্শের বীজ বপন করা হয়। পাঁচ বছর বয়সে শিশু যখন তার পারিপার্শ্বিকতা সম্বন্ধে কিছুটা জ্ঞান অর্জন করে তখনই তাকে ব্রহ্ম ভাবনা দেওয়া হয়। তাই আনন্দমার্গের সমাজ এক সাধারণ আদর্শের ওপর–ব্রহ্মত্ব লাভের লক্ষ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই ভিত্তি যুদ্ধের বিপদের মত কখনও হারিয়ে যাবে না। সুতরাং ব্রাহ্মী আদর্শকে ভিত্তি করেই চিরন্তন ঐক্যের প্রতিষ্ঠা সম্ভব। আমাদের আনন্দমার্গে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও "পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ সকলের সাধারণ সম্পদ ও সমাজের সকলেই এর ন্যায্য অংশীদার”– এই সাধারণ আদর্শকেই গ্রহণ করা হয়েছে।

এই আদর্শকে আনন্দমার্গের প্রতিটি সদস্যের মনে ৰদ্ধমূল করতে সঙ্ঘের যাবতীয় উৎসব অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে আবৃত্তি করা হয়–

সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাম্ ।

দেবা ভাগং যথা পূর্বে সঞ্জানানা উপাসতে ।।

সমানী ব আকুতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ ।

সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি ” ।

সকলের প্রতি ভালবাসা, গোটা মানবজাতিকে এক পরিবার হিসেবে গ্রহণ করা, বিশ্বের যাবতীয় সম্পদকে সকলের সাধারণ সম্পদ মনে করে তার যথাযথ ব্যবহার করা, শিশুর নামকরণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী ব্যষ্টিদের সমবেতভাবে শিশুর সামাজিক, মানসিক তথা আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধানের দায়িত্ব গ্রহণ ইত্যাদি নিঃসন্দেহে এক অমর সাধারণ আদর্শের সূচনা করে।

(খ) জাতিভেদহীন সমাজ ব্যবস্থা: আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান আছে যা সমাজে বিপর্যয় আনে। জাতিভেদ ব্যবস্থার অভিশাপ ভারতের মতো পৃথিবীর আর কোনো দেশে দেখা যায় না। সামাজিক একতা রক্ষার জন্যে সমাজের অর্থনৈতিক ও বিবিধ সামাজিক সুবিধান্বেষী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠী সৃষ্টি হতে দেওয়া উচিত নয়। আমাদের আনন্দমার্গে গোটা মানবজাতির একই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত মনে করে অকৃত্রিম ভালবাসার সূত্রে

আবদ্ধ করা হয়। এখানে ব্যষ্টি বিশেষ নিজেকে জীব মাত্র ৰলে পরিচয় দেয়। তাই একমাত্র জাতিভেদবিহীন সমাজ ব্যবস্থাই কেবল নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে। আনন্দমার্গের যাবতীয় সামাজিক অনুষ্ঠানের বিশিষ্ট পরিচালক ও কর্মিগণ পরস্পর গুরুভাই রূপে পরিচিত–জাতভাই রূপে নয়। একটি শিশুর নামকরণ অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান পর্যন্ত সমস্ত অনুষ্ঠানে কর্মী বা পরিচালক হিসেবে যারা অংশগ্রহণ করেন তারা সমাজের তথাকথিত যে কোন জাতি বা বর্ণের হতে পারে–তাদের একমাত্র পরিচয় তারা 'গুরুভাই'।

সেই সঙ্গে সাধারণ লক্ষ্য হিসেৰে ব্রহ্মকে গ্রহণ করার ফলে এমন একটা সমাজের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় যেখানে প্রতিটি ব্যষ্টি নিজেকে 'জীবমাত্র' বলে পরিচয় দেয়–তার আর কোনো বিশেষ জাতি–বর্ণ বা সম্প্রদায় থাকে না। এখানে ব্যষ্টি বিশেষের দোষের জন্যে কোন সম্পূর্ণ পরিবারকে সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদানের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয় না। এতে সমাজচ্যুত পরিবার সমূহের একটি পৃথক সমাজ গড়ার আশঙ্কাও থাকে না। যে সমাজে বিবাহ, ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন বা যে কোন প্রকার উন্নতির জন্যে কোন বিশেষ দল বা গোষ্ঠীগত বিচার নেই, যেখানে জাতিভেদের সৃষ্টি হওয়াও

সম্ভব নয়। আমাদের আনন্দমার্গের যেহেতু প্রতিটি শিশুর লালন–পালনকে সামাজিক দায়িত্ব বলে মনে করা হয়, বিশ্বের যাবতীয় সম্পদকে সকলের সাধারণ সম্পদরূপে গণ্য করা হয় ও ধর্মীয় অনুশীলনের জন্যে কোন জাতিবর্ণগত প্রতিবন্ধকতা নেই। সেহেতু এখানে সামাজিক, অর্থনৈতিক বা আধ্যাত্মিক কোনো কারণেই জাতিভেদের সৃষ্টি হতে পারে না।

(গ) সামূহিক সামাজিক অনুষ্ঠান: একে অন্যের সম্বন্ধে উদাসীন থাকার জন্যে সমাজে নানান ত্রুটি–বিচ্যুতি দেখা দেয়। এর ফলে সমাজের সভ্যরা কেবল একে অপরের ব্যাপারে অজ্ঞই থেকে যায় না, পরস্পর পরস্পরের প্রতি নিস্পৃহ ও অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। সামাজিক অনুষ্ঠানে সমাজের সভ্যরা একত্রে মিলিত হয়। তাই এইসব উৎসব অনুষ্ঠান হল একতার একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বাহন। মিলিতভাবে যখন অনেকে একটা বিশেষ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে তখন তারা কিছুক্ষণের জন্যে একই ক্রিয়ায় রত থাকে বলে সকলের মনে একটা একতাভাবের সৃষ্টি হয় ও পরস্পর পরস্পরের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে ওঠে। আনন্দমার্গে তাই এইরূপ সাধারণ সামাজিক অনুষ্ঠানকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হয়। মিলিত স্নান ও ধর্মচক্র দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক দিক থেকে সাধারণ সামাজিক অনুষ্ঠানেরই ভূমিকা গ্রহণ করে। এই সমস্ত অনুষ্ঠানে

সকলের অংশগ্রহণ ঐক্যের পক্ষে বিশেষ সহায়ক। এইরূপ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে পারস্পরিক অসহিষ্ণু ভাব থাকে না বরং তার পরিবর্তে একতার ভাব আসে। এই অনুষ্ঠানগুলি তাই সামাজিক একতার অতি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

(ঘ) চরম দণ্ডরাহিত্য: চরম দণ্ড ব্যবস্থা সমাজের অবক্ষয় ডেকে আনে ও এরফলে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যষ্টির অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে যায়। এই সকল দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যষ্টিরা সমাজের অপরাধীদের নিয়ে একটা গোষ্ঠী বা দল গড়ে তোলে। ফলে সমাজে বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পায়। আমাদের আনন্দমার্গে কোথাও দৈহিক বা সামাজিক চরম দণ্ড অনুমোদিত নয়। একমাত্র যে দণ্ড ব্যবস্থা আনন্দমার্গে অনুমোদিত তা হল অপরাধকারীকে নির্দিষ্ট সময় অবধি কোন রকমের সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা। সেই দণ্ডকাল অতিক্রান্ত হয়ে গেলে দণ্ডিত ব্যষ্টি আবার স্বাভাবিক ভাবেই সামূহিক অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে শুরু করে। এই দণ্ডব্যবস্থায় তার পরিবার পরিজনবর্গকে কোনো প্রকার ক্লেশই ভোগ করতে হয় না। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় সমাজচ্যুত বা কারামুক্ত ব্যষ্টির ন্যায় আনন্দমার্গে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যষ্টির নৈতিক মানের ওপর কোনো বিশেষ কলঙ্ক আরোপ করা হয় না। আনন্দমার্গের দণ্ড ব্যবস্থায় অপর এক দণ্ড হল দণ্ডপ্রাপ্ত

ব্যষ্টিকে বলা হয় তাকে অন্ততঃ দশজনকে শুভবুদ্ধির পথে আনতে হবে, তবেই সে সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদানের অনুমতি পাৰে। এই ধরণের শাস্তি হল একটি সংশোধন মূলক ব্যবস্থা, এই ব্যবস্থা অপরাধীর অগ্রগতিকে রুদ্ধ করে না দিয়ে তাকে শোধরাবার সুযোগ দেয় ও তাকে সৎপথে পরিচালিত করে। এই সকল শাস্তিকে অপরাধী তথা তার পরিবারের ওপর কোনো স্থায়ী কলঙ্ক আরোপ করা হয় না বলে তারা সমাজে কোনো বিশৃঙ্খলা ও অনৈক্য সৃষ্টি করে না। পক্ষান্তরে অপরাধী শাস্তি–কালে দশজন ব্যষ্টিকে সৎপথে দেখানোর কাজে চেষ্টিত থাকায় তার সাধারণ জীবনযাত্রা অপেক্ষা সে ভাল কাজেই জীবন অতিবাহিত করে। কাজেই সে শুধু তার নিজের উন্নতিই করে না সৎ আদর্শের প্রচার করে সমাজেরও উন্নতি করে।

(২) সামাজিক নিরাপত্তা

সামাজিক নিরাপত্তার অভাবেও সমাজে ভাঙ্গন দেখা দেয়। যে সমাজে অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে সদস্যদের নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থা নেই সেই সমাজ বেশীদিন স্থায়ী হতে পারে না। শৃঙ্খলার অভাবেও সামাজিক নিরাপত্তা বিপর্যস্ত হয়। সকলে

সমাজের বিধান ঠিকভাবে না পালন করলে সামাজিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। সুতরাং সামাজিক নিরাপত্তার জন্যে যা বিশেষভাবে প্রয়োজন তা হল–(ক) সুবিচার ও (খ) কঠোর শৃঙ্খলা।

(ক) সুবিচার: সামাজিক নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ থাকতে হলে অর্থনৈতিক, জাতিগত তথ্য স্ত্রী পুরুষগত কারণে কোন অবিচার থাকতে দেওয়া উচিত নয়। অর্থনৈতিক অবিচার মুখ্যতঃ শ্রমের মর্যাদা না দেওয়ারই ফলশ্রুতি। সমাজে বৃত্তিগত ভেদাভেদ থেকেই অর্থনৈতিক অবিচারের সৃষ্টি হয়। আনন্দমার্গে পরপিণ্ড–ভোজীর চেয়ে মলাকর্ষীর জীবনকে শ্রেয় মনে করা হয়। জীবিকা অর্জনকে যে সমাজে এতটা বড় করে দেখা হয় সেই সমাজ থেকে বিভিন্ন প্রকারের অর্থনৈতিক অবিচার দূর হয়ে যেতে বাধ্য। অর্থনৈতিক অবিচার ব্যষ্টি–বিশেষের স্বাভাবিক সঞ্চয়বৃত্তি থেকেও এসে যেতে পারে। মানুষ যাবতীয় সম্পদ নিজেই ভোগ করতে চায়, কিন্তু যদি তারা একথা বুঝতে শেখে যে জগতের সম্পদের ওপর সকলেরই যৌথ অধিকার আছে তাহলে অর্থনৈতিক অবিচার বহুলাংশে হ্রাস পাবে। আমাদের মার্গে মনে করা হয়, বিশ্বের যাবতীয় সম্পদ সকলের সাধারণ সম্পদ ও এই সম্পদকে সকলে মিলেমিশে ব্যবহার করতে হবে, এইরকম ভাবধারায়

উদ্বুদ্ধ সমাজে অর্থনৈতিক অবিচারের বিশেষ অবকাশ থাকে না।

স্ত্রী–পুরুষগত ভেদ–বুদ্ধি থেকে আর এক ধরণের সামাজিক অবিচার দেখা দেয়। মানুষের সমাজে অনেক ক্ষেত্রেই স্ত্রী–পুরুষের এককে অপরের চেয়ে হীন মনে করা হয়। এই পৃথিবীর বহু অঞ্চলে স্ত্রীজাতিকে পুরুষের ভোগোপাদান বলে মনে করা হয়। বিশ্বের অনেক তথাকথিত উন্নত দেশে মেয়েদের সাধারণ নির্বাচনে বোটাধিকার নেই। কোন কোন দেশে নারী জাতিকে আধ্যাত্মিক সাধানায় অনুপযুক্ত বিবেচনা করা হয়। আমাদের আনন্দমার্গে স্ত্রী–পুরুষ উভয়েরই সমান অধিকার ও দায়িত্ব স্বীকৃত। আনন্দমার্গের বিবাহ পদ্ধতিতে পুরুষ ও নারী উভয়কেই সমান দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। এখানে নারী জাতিকে আধ্যাত্মিক অনুশীলনে অনুপযুক্ত বিবেচনা করা হয় না। পুরুষ বা নারীকে আনন্দমার্গে একই দৃষ্টিতে দেখা হয়। এখানে তাই পুরুষের নিজেকে নারীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

তথাকথিত এক বিশেষ জাতির লোকেরা যারা অন্যান্যদের চেয়ে নিজেদের শ্রেষ্ঠ মনে করে তারা প্রায়ই অন্যান্যদের প্রতি অবিচার করে বসে। হিটলারের তথাকথিত শ্রেষ্ঠ আর্য জাতি

কর্তৃক জার্মানি থেকে ইহুদি বিতাড়ন সমাজের জাতিগত অবিচারের একটি জ্বলন্ত নজির। ভারতবর্ষে হরিজনদের ওপর তথাকথিত উচ্চবর্ণের মানুষদের অবিচারের ফলে সমাজে দারুণ ভাঙ্গন ধরেছে। এই সকল সামাজিক অবিচার নির্মূল করতে হলে প্রথমেই জাতিভেদের মূলোৎপাটন করতে হবে। আমাদের আনন্দমার্গে প্রথম পর্যায়েই যে কোনো মানুষকে তার জাতি–বর্ণ বা সম্প্রদায়ের কথা ভুলে যেতে হয়। সে আর নিজেকে অমুক জাতি বা অমুক সম্প্রদায়ের বলে পরিচয় দেয় না। জাতিভেদ যুক্ত সামাজিক অনুষ্ঠানে জাতিগত সংস্কারের প্রভাব খুবই প্রৰল। আনন্দমার্গের সামূহিক অনুষ্ঠানে সব জাতি–বর্ণ বা সম্প্রদায়ের লোকই সমানভাবে অংশ গ্রহণ করে। বর্তমান সমাজে বিবাহাদির ক্ষেত্রে জাত–পাত–সম্প্রদায়–জাতীয়তা প্রভৃতির ওপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু আমাদের মার্গে এই ধরণের সংকীর্ণতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় না। আমাদের মার্গে জীবনের শুরুতেই মানবতাবাদের বীজ বপন করা হয় ও সমগ্র মানবতাকে একটি বৃহৎ পরিবার হিসেবে দেখা হয়। এইরূপ সমাজে তাই অর্থনীতিগত, স্ত্রী–পুরুষগত বা জাতিগত ভেদভাবনা ভিত্তিক অবিচার ৰলে কিছু থাকৰে না।

(খ) শৃঙ্খলা: ইতিহাসে প্রায়ই দেখা যায় যে, শৃঙ্খলা ৰোধের অভাবে বহু সমাজ ধরাপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে

গেছে। সমাজের কিছু সংখ্যক সদস্যের বিশৃঙ্খল আচরণ বাকীদের শান্তিপূর্ণ জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করতে পারে। সমাজকে রক্ষা করার জন্যে শৃঙ্খলা তাই অত্যাবশ্যক। সামাজিক বিধানকে কিছু সংখ্যক সদস্য ত্রুটি-যুক্ত মনে করে। এই থেকে সমাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। তাদের সেই মনে করাটা যদি সামাজিক আইন ভঙ্গ করার কারণ না হয়, শুধু মনে করা বা তর্ক বিতর্কের স্তরেই সীমাৰদ্ধ থাকে তাহলে অবশ্য কোন বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় না। শৃঙ্খলা রক্ষার খাতিরে সামাজিক নিয়ম কানুন যুক্তিপূর্ণ হওয়া উচিত ও সমাজের প্রগতির সঙ্গে তাল রেখে এই নিয়ম-কানুনও পরিবর্তনশীল হওয়া দরকার। আর তখনই সমাজে শৃঙ্খলা রক্ষিত হবে। আমাদের মার্গে অযৌক্তিক কোন কিছুর স্থান নেই। যেখানে যুক্তিকে এতখানি গুরুত্ব দেওয়া হয় ও যুক্তির খাতিরে পরিবর্তনকেও মেনে নেওয়া হয়, সেখানে অসন্তোষ তথা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকে না। সেই সঙ্গে, আনন্দমার্গে আনুগত্যের পরেই যুক্তি-তর্ককে স্থান দেওয়া হয়েছে। এটাই সমাজের শৃঙ্খলা নিশ্চিত করে। সমাজের আইন-কানুনের প্রতি প্রথমে আনুগত্য জানিয়ে তার পরে যদি সে মনে করে ওই আইন- কানুনগুলি ত্রুটিপূর্ণ, তাহলে তাঁর সপক্ষে যুক্তি দেখানো ও তার সংশোধন করার অধিকার তার অবশ্যই আছে। কিন্তু আনুগত্যের আগেই তর্ক করলে তাতে

বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। আমাদের মার্গের মত যে সমাজব্যবস্থা যৌক্তিকতার ওপর প্রতিষ্ঠিত–অন্ধ কুসংস্কারের ওপর নয়–এ ধরণের সমাজ ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা প্রবেশ করে মানুষের সামাজিক নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করতে পারে না।

(৩) শান্তি

মানসিক সাম্যাবস্থাকেই শান্তি বলে। সুতরাং দেখতে হবে কী কী কারণে মানসিক সাম্য আসে, কী কী কারণে তা বিদূরিত হয়। আর আধ্যাত্মিক সাধনা মানসিক সাম্যাবস্থা আনে ও কুসংস্কারে বিশ্বাস এই সাম্যাবস্থাকে নষ্ট করে দেয়। তাই মানসিক শান্তি আনয়নের জন্যে প্রয়োজন একাধারে আধ্যাত্মিক সাধনার অনুশীলন ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

আধ্যাত্মিক সাধনা

মানুষের সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা হল দুঃখের হাত থেকে অব্যাহতি লাভ। এই আকাঙ্ক্ষা পূরণ না হওয়া পর্যন্ত মনে শান্তি আসে না। দুঃখের হাত থেকে এই অব্যাহতিই নিবৃত্তি। নিবৃত্তি দু'ধরণের–একটিকে বলে 'নিবৃত্তি', অপরটিকে

'আত্যন্তিকী নিবৃত্তি'। যে বস্তু এই নিবৃত্তি লাভে সাহায্য করে তাই হল 'অর্থ'। কিন্তু এই অর্থ পুরোপুরি একটা স্থূল জিনিস, আর তাই এ থেকে কেবল স্থূল তথা সাময়িক তৃপ্তিই হতে পারে। দুঃখের হাত থেকে চিরন্তন অব্যাহতি পাবার জন্যে পরমার্থই একমাত্র উপায়। পরমার্থ দুঃখ থেকে কেবল সাময়িক অব্যাহতি দেয় না, স্থায়ী অব্যাহতি দেয়। কেবল আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক সমস্ত প্রকার দুঃখ থেকেই আত্যন্তিকী নিবৃত্তি এনে দেয় পরমার্থ। এই পরমার্থ প্রাপ্তি কেবল আধ্যাত্মিক সাধনার দ্বারাই সম্ভব। তাই শান্তির জন্যে চাই মানসিক সাম্য, আর মানসিক সাম্যাবস্থা লাভের জন্যে চাই সর্বপ্রকার দুঃখ থেকে আত্যন্তিকী নিবৃত্তি। এই আত্যন্তিকী নিবৃত্তি আসে একমাত্র পরমার্থ থেকে; আর পরমার্থ কেৰল আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমেই লাভ করা সম্ভব। আনন্দমার্গে তাই পাঁচ বছর বয়স থেকেই আধ্যাত্মিক সাধনায় দীক্ষা দেওয়া হয়। বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক সাধনাও এগিয়ে চলে ও এতে তার কেবল মানসিক বিকাশই হয় না, শরীরেও বিকাশ ঘটে। আনন্দমার্গের আধ্যাত্মিক সাধনা মানুষকে সংসার ত্যাগের শিক্ষা দেয় না, স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ–যাবতীয় সম্পদের যথাযথ ব্যবহারেরই শিক্ষা দেয়। আনন্দমার্গের সাধনক্রম হল একটা সুশৃঙ্খল ও বিজ্ঞানসম্মত

পদ্ধতি যার সাহায্যে দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক প্রগতি ঘটিয়ে মনের স্থায়ী সাম্য তথা শাশ্বতী শান্তি লাভ করা যায়।

কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

বিষয়ের স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়া মনের স্বভাব। সামাজিক, মানসিক বা ধর্মীয় ক্ষেত্রের কুসংস্কারগুলো মনকে এমন ভাবে প্রভাবিত করে ফেলে যে মনে নানাপ্রকার দুশ্চিন্তা প্রবেশ করিয়ে দেয়। ফলে মানুষকে ক্লেশে পতিত হতে হয়। কুসংস্কার-বিশ্বাসী মানুষের মানসিক সাম্য বিনষ্ট হয়। ফলে মানুষ কেবল মনের শান্তিই হারায় না, সে এমন কিছু করে ফেলে যা তার নিজের পক্ষেও ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। আর এতে তার কুসংস্কার আরও বৃদ্ধি পায়। সামান্য ঘটনার মধ্যে সে অনেক কিছু দুর্লক্ষণ দেখতে পায়। 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী'। এই ভাবেই মানুষ ভূত-প্রেত দেখে-যা তার নিজেরই মানস-সৃষ্ট ছাড়া অন্য কিছুই নয়। যদি এই সৰ মানুষ সাহস ও মনঃশক্তি নিয়ে ভূতকে ধরার চেষ্টা করত, তাহলে তারা অচিরেই 'কিছু-না' থেকে কিছু বিশ্বাস করার ভুলটা ধরে ফেলত। এ ধরণের কুসংস্কার সর্বক্ষেত্রেই পরিব্যাপ্ত। সামাজিকক্ষেত্রে কুসংস্কারের অভাব নেই। ডাকিনীতন্ত্র, বৈধব্য প্রভৃতি কেবল কুসংস্কারের জন্যেই

সমাজের অভিশাপ ৰলে বিবেচিত হয়। মানসিক ক্ষেত্রে ভূত-প্রেতের মত নানান ধরণের কুসংস্কার রয়েছে। এছাড়া শ্রাদ্ধ সম্পর্কিত কুসংস্কার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ওপরও বর্তায়। ধর্মীয় ক্ষেত্রে স্বর্গ-নরকের কুসংস্কার অজ্ঞ মানুষকে নানান কিছু করতে বাধ্য করে। এসব কুসংস্কার মানুষের মানসিক সাম্য নষ্ট করে দেয় ও সমাজজীবনে বিরোধ ও দুর্ভাবনার সৃষ্টি করে। সমাজে শান্তি রক্ষার জন্যে তাই কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করা একান্ত জরুরী।

আনন্দমার্গ এ ধরণের সমস্ত প্রকার কুসংস্কার থেকে মুক্ত। সামাজিক ক্ষেত্রে ডাকিনীতন্ত্র কিছু কুসংস্কারী মানুষের মানসিক সৃষ্টি। আনন্দমার্গে বিধবাদের অবিবাহিতা মেয়েদের মতই সমাজে স্থান দেওয়া হয়। তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার বা জীবনযাত্রার ওপর কোনপ্রকার কুসংস্কার ভিত্তিক ৰাধ্যৰাধকতা, আরোপ করা হয় না বা কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে তাদের নিষেধ করা হয় না। ভূতপ্রেত-শ্রাদ্ধাদি সম্পর্কিত কোন ধরণের কুসংস্কারেরও স্থান আমাদের মার্গে নেই। ভূত-প্রেতে বিশ্বাস সম্পূর্ণ একটা কাল্পনিক ব্যাপার। মৃত্যুর পর প্রয়াত ব্যষ্টির আত্মাকে বৈতরণী পার করানোর জন্যে ব্রাহ্মণকে দান-দক্ষিণা প্রদান করতে হবে-

এটাও কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়। আনন্দমার্গে এইসৰ অযৌক্তিক অন্ধবিশ্বাসের স্থান নেই।

ধর্মীয় ক্ষেত্রে স্বর্গ–নরকের বিশ্বাস, দেবদেবীর প্রতি ভীতি মানুষের মনকে অবদমিত করে রাখে ও মনের শান্তি নষ্ট করে। প্রায়ই এইসৰ কুসংস্কার জনিত ভীতি মানুষের মনে অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে ও তার মানসিক শান্তি নষ্ট করে। আনন্দমার্গের আধ্যাত্মিক সাধনা সম্পূর্ণতঃ যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। আনন্দমার্গের সুশৃঙ্খল ও বিজ্ঞান–ভিত্তিক সাধনা পদ্ধতিতে কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের কোন স্থান নেই।

এইভাবে দেখা যাচ্ছে, আদর্শ সমাজ তখনই গড়ে ওঠে যখন সমাজে একতা, সামাজিক নিরাপত্তা ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এইরূপ সমাজ গড়ার উদ্দেশ্যেই আনন্দমার্গ সাধারণ আদর্শ হিসেবে ব্রহ্মকে গ্রহণ করেছে। সামাজিক একতা আনবার জন্যে আমাদের মার্গে জাতিভেদহীন সমাজ–ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে, চরমদণ্ডও এখানে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। জাতি–বর্ণ সম্প্রদায় নির্বিশেষে এখানে সবাই সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। বৃত্তিগত ভেদ, স্ত্রী–পুরুষগত ভেদ বা জাতিগত ভেদকে কেন্দ্র করে কোন সামাজিক অবিচারকে

এখানে প্রশ্রয় দেওয়া হয়নি। এ ছাড়াও সমস্ত প্রকার সামাজিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক কুসংস্কার বর্জন করে, সুশৃঙ্খল বিজ্ঞানসম্মত আধ্যাত্মিক সাধনাপদ্ধতির প্রবর্তন করে ও শারীরিক–মানসিক ও আধ্যাত্মিক প্রগতি ও শাশ্বতী শান্তি–প্রতিষ্ঠার উপযোগী সমাজবিধি রচনা করে আনন্দমার্গ আদর্শ

সমাজ গড়ার বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

(তাত্ত্বিক প্রবেশিকা)

(এই পুস্তকে প্রকাশিত 'তাত্ত্বিক প্রবেশিকা'র দুটি প্রবন্ধই মূল ইংরেজী থেকে অনূদিত)

সমাজ চক্রে সদ্বিপ্রের স্থান

আদিম মানুষেরা ছিল ব্যষ্টিকেন্দ্রিক। তাদের ছিল না কোন সমাজ। এমনকি পরিবার সম্বন্ধে কোন ধারণাও ছিল না। জীবন ছিল বুদ্ধি–বিবেক– বর্জিত পশুর মত। মানুষ

প্রকৃতির মুক্ত ক্রোড়ে বাস করতে ভালবাসতো। দৈহিক শক্তি ছিল তাদের একমাত্র অবলম্বন। দৈহিক ৰলে ৰলীয়ানদের দুর্বলদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হত। দুর্বলের ওপর প্রৰলের চলত একচ্ছত্র আধিপত্য। যাই হোক সেই সময় সকলে দৈহিক পরিশ্রম করত। সঞ্চয় মনোবৃত্তি বা ৰৌদ্ধিক শোষণ সে যুগে দেখা দেয়নি। জীবন যাপনে পশুভাবের আধিক্য থাকলেও পাশবিকতার অভিপ্রকাশ ছিল না।

কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ যারা করে তাদের যদি 'শূদ্র' সংজ্ঞা দেওয়া হয়, তাহলে আদিম যুগের সেই স্তরকে বলতে পারি শূদ্র যুগ–কারণ সৰাইকেই তখন কায়িক পরিশ্রম করতে হত। দৈহিক শক্তির ওপর এই নির্ভরশীলতার ফলে ক্রমশঃ কিছু মানুষ পেশীর জোরে অন্যান্যদের নেতৃত্ব দিতে শুরু করল। এরাই হয়ে দাঁড়াল শূদ্র–নেতা।

সেই সঙ্গে এল পরিবার প্রথা। আর একটু আগে যে নেতৃত্বের কথা বলা হয়েছে যা এককালে পেশী–বলের ওপর নির্ভরশীল ছিল, তা পিতা থেকে পুত্রে অথবা মাতা থেকে কন্যায় বর্তাল। এটা ঘটল অংশতঃ ভয় ও অর্জিত ক্ষমতা থেকে, অংশতঃ বংশধারাগত কৌলিন্যের জন্যে।

শক্তিমানের শক্তি বজায় রাখতে দরকার হয় পার্শ্ববর্তী শক্তির সাহায্য। সাধারণতঃ পার্শ্ববর্তী শক্তি ছিল–হয় একই বংশধারার অন্তর্গত অথবা বৈবাহিক সূত্রে আৰদ্ধ। ক্রমে ওই নেতারা দৈহিক শক্তির সাহায্যে এক সুসংবদ্ধ গোষ্ঠী তৈরী করল। এইভাবে তৈরী হল ক্ষত্রিয় শ্রেণী। যে যুগে শাসনের ক্ষমতা ও অস্ত্রের প্রাধান্যটাই অগ্রগণ্য হয়ে উঠল সেই যুগকে বলতে পারি ক্ষাত্র যুগ। সে যুগের নেতারা ছিলে দারুণ শক্তিশালী। ব্যষ্টিগত শৌর্যবীর্য ছিল তাদের অবলম্বন। বুদ্ধির ব্যবহার তারা খুব কমই করত বা করত না বললেও চলে।

বুদ্ধি ও নৈপুণ্যের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক–মানসিক সংঘর্ষের ফলে বুদ্ধির বিকাশ শুরু হলো আর দৈহিক শক্তি হারালো তার পূর্ব গৌরব– কারণ বুদ্ধির চাহিদা গেল ক্রমশঃই বেড়ে। অস্ত্রের প্রয়োগ কৌশল উন্নত করবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। আর এই কারণেই দৈহিক শক্তিতে বলীয়ান একজন বীরকেও অস্ত্রের ব্যবহার ও যুদ্ধ–কৌশল শেখবার জন্যে এমন একজনের চরণতলে বসতে হলো যে মোটেই দৈহিকশক্তিতে বলীয়ান নয়। যেকোন প্রাচীন সভ্যতার পুরাণগুলোর দিকে তাকালেই এমন অনেক উদাহরণই মিলৰে যেখানে সে যুগের বীরকে বিশেষ অস্ত্র শিক্ষার জন্যে কোন না কোন গুরুর শরণাপন্ন হতে হয়েছিল। পরবর্তীকালে শুধুমাত্র অস্ত্র শিক্ষার মধ্যেই তা আৰদ্ধ না থেকে শাসনব্যবস্থার

আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় দিকগুলিও যেমন সমর-কৌশল, চিকিৎসা বিজ্ঞান, সাংঘটনিক বিভিন্ন ধারা ও প্রশাসন ব্যবস্থা-এইসব শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হলো। এইভাবে দিনে দিনে, উষ্চতর ৰৌদ্ধিকতার ওপর নির্ভরশীলতা গেল বেড়ে। ধীরে ধীরে প্রকৃত ক্ষমতা চলে গেল বুদ্ধিজীবীদের কাছে। বুদ্ধিজীবী-এই শব্দটাই বুঝিয়ে দিচ্ছে যে বুদ্ধিই ছিল তাদের অস্তিত্ব রক্ষার একমাত্র অবলম্বন। এই বুদ্ধিজীবীরা নিজেরা কোনরকম কায়িক পরিশ্রম করতো না, তাই তারা সমাজের অন্যান্যদের কর্মশক্তিকে শোষণ করে পরগাছার মত জীবনযাপন করতে লাগলো। সমাজে এই ৰৌদ্ধিক পরগাছাদের প্রাধান্যের যুগকেই বলা যেতে পারে 'বিপ্রযুগ'।

যদিও বিপ্ররা তাদের বিশেষ বুদ্ধি কাটিয়ে সমাজের পুরোভাগে এসে গেল, তবুও ক্ষত্রিয়দের মত বংশগত একাধিপত্য ৰজায় রাখা বেশ কষ্টসাধ্য হ'ল। মুষ্টিমেয় মানুষের এই একাধিপত্য বজায় রাখতে তারা উঠে পড়ে লাগলো। নানা ধরণের কুসংস্কার, আচার-অনুষ্ঠান, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, এমনকি অযৌক্তিক ভাবধারা (যেমন হিন্দু সমাজের জাত-পাত প্রথা) আরোপ করে তারা বেশীর ভাগ মানুষেরই ৰৌদ্ধিকশক্তি অর্জনের পথ ৰন্ধ করে দিয়েছিল। মধ্য যুগে বিশ্বের বৃহত্তর অংশে মানবসমাজের এই ছিল অবস্থা।

বিশেষ এক শ্রেণীর অব্যাহত শোষণের ফলে ভোগ্যপণ্যের সংগ্রহ ও হস্তান্তরের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। এছাড়াও উদ্বৃত্ত অঞ্চল থেকে ঘাটতি অঞ্চলে খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসের সরবরাহের প্রয়োজনীয়তাও ভীষণ ভাবে অনুভূত হলো। এমনকি গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ক্ষেত্রেও এক গোষ্ঠী অপেক্ষা অন্যগোষ্ঠীর সম্পদের তারতম্য প্রাধান্য পেতে থাকল। সম্পদের এই গুরুত্ব শুধুমাত্র উৎপাদকরাই যে বুঝেছিল তা নয়, সম্পদ ব্যবহারের বিভিন্ন পর্যায়ে যারা এই সম্পদের লেনদেন করত, তারাও উপলব্ধি করেছিল। এরাই হলো বৈশ্য। এদের উদ্ভাবনী ক্ষমতা ও সামগ্রিক উৎপাদন অধিকতর প্রাধান্য পেতে থাকলো আর এমন একটা যুগ এলো যখন এই ব্যাপারগুলোই জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিল। এইভাবে বৈশ্যরাই যখন অধিকতর অগ্রণী ভূমিকায় এসে গেলো, বৈশ্য শ্রেণীর সেই আধিপত্যের যুগকেই বলা যায় 'বৈশ্য-যুগ'। ব্যষ্টিতান্ত্রিকতা ও অৰাধ সঞ্চয়ের প্রবণতায় পুঁজিবাদের উদ্ভব হলো। যারা ব্যষ্টিগত ভাবে শোষণে উৎসাহী ছিল সেই কতিপয় পুঁজিপতিরা উৎপাদনের উপায়সমূহের দখল নিল। বলা যেতে পারে, এই অবস্থাতেই মজুতদারী মনোবৃত্তি প্রবল হয়ে উঠলো।

সঞ্চয়ের এই লালসা মানবজাতিকে সামগ্রিকভাবে শোষণ করতে পুঁজিপতিদের প্ররোচিত করলো। আরো যারা এইভাবে শোষণ করতে লাগলো তারা নিজেরা একটা শ্রেণী বিশেষে চিহ্নিত হয়ে গেল। শোষণের লালসা ও মজুতদারীর প্রতিযোগিতায় সবাই কিন্তু টিকতে পারলো না। শেষ পর্যন্ত পুঁজি চলে গেল কতিপয় লোকের হাতে আর সেই পুঁজির জোরেই তারা সাধারণভাবে সমাজের ওপর বিশেষভাবে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ওপর আধিপত্য বিস্তার করে ফেললো। তারা সমাজের কিছু অংশকে এই বলে প্রতারিত করল যে তারাও সম্পদের অংশীদার হবে। শক্তির অভাবে বেশীর ভাগই অবহেলিতের ও বঞ্চিতের জীবন যাপন করতে বাধ্য হলো। পুঁজিবাদীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তারা গেল হেরে। সমাজের এই অবহেলিত, বঞ্চিত ও শোষিতরা শেষ পর্যন্ত পুঁজিবাদীদের ক্রীতদাসে পরিণত হলো। ক্রীতদাস বলা হচ্ছে এই কারণে যে জীবনধারণের জন্যে পুঁজিবাদীদের সেবাদাস হওয়া ছাড়া তাদের সামনে অন্য কোন উপায় ছিল না।

আগেই বলা হয়েছে যে, যারা কায়িক পরিশ্রম করে অথবা জীবনধারণের জন্যে যাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হয় তাদের 'শূদ্র' বলা হয়ে থাকে। বৈশ্যযুগটাও এমনই একটা যুগ যখন সমাজের বৃহত্তর অংশ এই ধরণের শূদ্রে পরিণত হয়ে

যায়। কিন্তু তাদের মনের মধ্যে চলতে থাকে এক অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ আর যেহেতু সামাজিক মনস্তত্ত্ব স্বাভাবিক গতিধারায় এগিয়ে যেতে চায়, সেইহেতু অসন্তোষ ও বিক্ষোভ ক্রমশঃ পাহাড় প্রমাণ হয়ে ওঠে। আর শোষণের যাঁতাকলের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার জন্যে তথা রুখে দাঁড়াবার জন্যে এই অসন্তোষ ও বিক্ষোভের অবস্থাটা অত্যন্ত জরুরী হয়ে ওঠে। একেই বলা যেতে পারে 'শূদ্র বিপ্লব'। এই শূদ্র বিপ্লবের নেতৃত্ব কিন্তু তাদের হাতে থাকে যারা দৈহিক মানসিক শক্তিতে এমন বলীয়ান যে তারা তাদের সেই ক্ষমতার জোরে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থাকে গুঁড়িয়ে ফেলতে সমর্থ। প্রকৃত পক্ষে এরাও ক্ষত্রিয়। অর্থাৎ এক বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয়কর পরিস্থিতির পরে আবার সেই শূদ্রযুগ থেকে ক্ষাত্রযুগ তারপরে বিপ্রযুগ–এইভাবে সমাজচক্র ঘুরে চলতে থাকে।

সভ্যতার এই বিবর্তনে একটা যুগ ক্রমশঃ রূপান্তরিত হয়ে যায় দেখা দেয় নতুন যুগ। এই ক্রমবিবর্তনকে বলা যেতে পারে 'ক্রান্তি' (evolution)। একটা যুগের শেষ ও আর একটা যুগের শুরু–এই মধ্যবর্তী অবস্থাটাকে বলা যেতে পারে যুগসংক্রান্তি (transitional age)। শূদ্রযুগ থেকে শুরু করে পরপর চারটে যুগ যখন অতিক্রান্ত হয়ে যায় অর্থাৎ সমাজচক্র যখন সম্পূর্ণভাবে একবার ঘুরে যায়, সেই

অবস্থাটাকে বলা হয় 'পরিক্রান্তি'। কখনো কখনো বিশেষ কোন গোষ্ঠী বিপরীত ভাবাত্মক ভাবধারার প্রভাবে দৈহিক ও মানসিক শক্তি সম্পাতের দ্বারা সমাজচক্রকে পেছনের দিকে ঘুরিয়ে দেয়। এটা সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের বিরোধী, তাকে বলা হয়ে 'বিক্রান্তি' (counter-evolution)। কিন্তু খুব অল্প সময়ের মধ্যে প্রচণ্ড শক্তি সম্পাতের সাহায্যে অথবা প্রচণ্ড রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে যদি এই সমাজচক্রকে পেছনের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়, তবে তাকে বলাহয় 'প্রতি- বিপ্লব (counter-revolution)! এটা ঠিক ব্রহ্মচক্রে ঋণাত্মক প্রতিসঞ্চরের মত।

আর প্রগতি সভ্যতার ও সামনের দিকে এগিয়ে চলাকে বলতে পারি ব্রহ্মচক্রে সামুহিকভাবে পুরুষোত্তমের দিকে এগিয়ে চলার পথে যথাক্রমে অবস্থানবিন্দু ও সম্মুখগতি।

ভূমা মনের কল্পনা প্রবাহে জগৎ একটি পরিবর্তনশীল সত্তা। এই গতি অনন্তের দিকে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। এটাই প্রকৃতির বিধান-জীবনের নিয়ম। স্থবিরতার অর্থই মৃত্যু। অতএব কোন শক্তিই সমাজচক্রের এই পরিঘূর্ণনকে সমাজের বিবর্তনের এই গতিকে রুদ্ধ করতে পারে না। বাহ্যিক অথবা অভ্যন্তরীণ যে কোন শক্তিই হোক না কেন, তা শুধু সমাজচক্রকে সামনে অথবা পেছনের দিকেই ঘোরাতে পারে,

সমাজের গতিধারা স্তব্ধ করতে পারে না। অতএব প্রগতিশীল মানবজাতিকে পুরাতনের জীর্ণ কঙ্কালকে পরিত্যাগ করতেই হবে। সমগ্র মানবতার মঙ্গলার্থে প্রগতির গতিতে আনতে হবে দ্রুতি।

যম নিয়মে প্রতিষ্ঠিত হয়ে, সুসংবদ্ধ চিন্তাধারা ও সুপরিকল্পিত কার্যপ্রণালীর ভিত্তিতে মানবজাতির দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উত্তরণের জন্যে যাঁরা সর্বদা সচেষ্ট, সেই সব আধ্যাত্মিক বিপ্লবীরাই হচ্ছেন "সদ্বিপ্র"।

অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, অপরিগ্রহ ও ব্রহ্মচর্যই হচ্ছে 'যম সাধনা'। মন, বাক্য ও কার্যের দ্বারা নিরীহ কোন জীবকে আঘাত না করার নামই 'অহিংসা'। অপরকে প্রকৃত সাহায্যের উদ্দেশ্যে মন ও বাক্যের যথাযথ ব্যবহারের নামই 'সত্য'। চুরি না করার নামই 'অস্তেয়'। তবে শুধুমাত্র বাহ্যিক চুরিই যে এর আওতায় আসবে তাই নয় মানসিকভাবে চুরি অর্থাৎ চৌর্য মনোবৃত্তিও এর মধ্যে পড়বে। মনই সমস্ত কাজের উৎস। অতএব যা নিজের নয় তা নেবার মনোভাব ত্যাগ করাই প্রকৃতপক্ষে অস্তেয়। দেহরক্ষার অতিরিক্ত কোন ভোগ্যবস্তু গ্রহণ না করার প্রবণতাই 'অপরিগ্রহ'। অনুমন যখন ভূমামনের ইচ্ছায় অনুরণিত হয়ে পার্থিব ও মানসিক সর্বসত্তায়

তাঁর উপস্থিতি তথা কর্তৃত্বের ভাবনায় ভাবিত হয়, অণুমনের সেই অবস্থাকেই বলে ব্রহ্মচর্য।

নিয়মের পাঁচটি অঙ্গ–শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধান। শরীর ও মন উভয়ের পবিত্রতা রক্ষাই 'শৌচ'। অপরের মঙ্গলের জন্যে কাজ করা, সেবা পরায়ণতাও কর্তব্যকর্মে নিয়োজিত থাকা–এতেই মানসিক পবিত্রতা আসে। 'সন্তোষ' বলতে পরিতৃপ্তিকে বুঝায়। নিজের দৈহিক ও মানসিক শ্রমের ফলশ্রুতিকে বিদ্বেষহীন মনোভাব নিয়ে ও প্রতিবাদ না করে গ্রহণ করার ইচ্ছাই 'সন্তোষ'। লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্যে শারীরিক সমস্ত রকম অসুবিধাকে বরণ করে নেওয়াই 'তপঃ'। প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গমকরে শাস্ত্রপাঠ করা তথা জ্ঞান ৰাড়াৰার প্রচেষ্টাই 'স্বাধ্যায়'। সমগ্র বিশ্বই পরম পুরুষের দ্বারা পরিচালিত হয়। তাঁর বিশেষ ইচ্ছা ব্যতিরেকে কেউই কিছু করে না বা করতে পারে না। প্রতিটি সত্তাই যে সর্বশক্তিমানের হাতের পুতুল তথা সেই দিব্যজ্যোতির স্ফুলিঙ্গ মাত্র–এইভাবের স্বগত ভাবনাই 'ঈশ্বর প্রণিধান"। সম্পদে অথবা বিপদে, সুখের ক্ষণিক ঝলকানিতে অথবা দুঃখের মধ্যে যে কোন অবস্থাতেই থাকি না কেন তাঁর প্রতি গভীর আস্থাই 'ঈশ্বর– প্রণিধান'।

স্বাভাবিক জীবন যাপনের ক্ষেত্রেও আধ্যাত্মিক আচরণে স্বভাবগত ভাবে যাঁরা উপরি–উক্ত দশটি অনুশাসনে প্রতিষ্ঠিত তাঁরাই 'সদ্বিপ্র'।

নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী এই সদ্বিপ্রদের সমাজের প্রতি মৌলিক ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য সম্পাদন করতে হবে। সমাজ–চক্রের এই পরিঘূর্ণনে, একটা বিশেষ যুগে তার পরবর্তী যুগ আসার আগে একটা বিশেষ শ্রেণীর আধিপত্য থাকে, গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। এই বিশেষ শ্রেণী যখন রাজনৈতিক ক্ষমতায় থাকে, তাদের দ্বারা সমাজে শোষণ চলার সমূহ সম্ভাবনা থেকে যায়। ইতিহাসের শিক্ষা এই যে, শোষণের সম্ভাবনাই শুধু নয়, যুগে যুগে এই শোষণের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। এখন সদ্বিপ্রদের কর্তব্য হবে, সমাজে যে শ্রেণীর আধিপত্য থাকৰে সেই শ্রেণী যেন শোষণ করার সুযোগ না পায় তা দেখা। সভ্যতার বিবর্তনের পরিঘূর্ণনে চারটি শ্রেণীর ('শূদ্র' অর্থাৎ যাদের কেবল কায়িক পরিশ্রমই করতে হয়; ক্ষত্রিয় অর্থাৎ যারা বীর মনোভাবাপন্ন; বিপ্র অর্থাৎ যারা বুদ্ধিজীবী আর বৈশ্য তথা পুঁজিপতি শ্রেণী) অবস্থিতি সুনির্দ্দিষ্ট। এক একটি শ্রেণী এক এক যুগে আধিপত্য বিস্তার করে আর সমাজচক্রের ঘূর্ণনের কারণে ক্রমশঃ সেই শ্রেণীর আধিপত্য কমে গিয়ে পরবর্তী শ্রেণীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এইভাবেই সমাজচক্র ঘুরে চলেছে।

জীবন গতিশীল আর সমাজচক্রও বিরামহীন ভাবে ঘুরে চলেছে। সমাজচক্রের এই ঘোরাকে কিছুতেই স্তব্ধ করা যাবে না। কারণ স্থবিরতার অপর নামই মৃত্যু। এইজন্যে সদ্বিপ্র সব সময়ে খেয়াল রাখবে যে, যে শ্রেণী আধিপত্যে রয়েছে তারা যেন শোষণের কোন সুযোগ না পায়। যে মুহূর্তে একটি শ্রেণী শোষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, সেই মুহূর্ত থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠের জীবন হয়ে ওঠে দুর্বিষহ। সংখ্যাগরিষ্ঠের দুর্ভোগের বিনিময়ে কতিপয় মানুষ সুখের স্বর্গে বিচরণ করতে থাকে। শুধু তাই নয়, সমাজে যখন এই ধরণের শোষণ চলতে থাকে, তখন কতিপয় শোষক আর সংখ্যাগরিষ্ঠ শোষিত–উভয়েরই অধঃপতন ঘটে। কতিপয় শোষকের অধঃপতন ঘটে–কারণ তারা অত্যধিক জাগতিক ভোগ সুখে নিমজ্জিত হয়। আর যেহেতু জাগতিক সমস্যা সমাধানের জন্যেই সংখ্যাগরিষ্ঠের সমস্ত কর্মশক্তি ব্যয়িত হয়ে যায়, সেহেতু তারা নিজেদের উত্তরণ ঘটাতে পারে না। মানস–ভৌতিক (psycho–physical) সামন্তরালতা রক্ষায় সদা নিয়োজিত থাকায় তাদের মানসিক তরঙ্গ দিনে দিনে স্থূলতর হয়ে যায়। এই কারণেই শাসক ও শাসিত উভয় পক্ষেরই জাগতিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিবিধান করতে হলে

কাউকেই সমাজের অন্যদের ওপর শোষণ করার কোন রকম সুযোগ দেওয়া চলবে না।

সদ্বিপ্র নিষ্ক্রিয় সাক্ষীগোপাল নয়। কোন ব্যষ্টি অথবা শ্রেণী যাতে অন্যদের ওপর শোষণ করতে না পারে সেজন্য সদ্বিপ্ররা থাকবে সদা কর্মতৎপর। এই কারণে সদ্বিপ্রদের হয়তো স্থূলশক্তি সম্প্রয়োগও করতে হতে পারে, কারণ তাদের লড়তে হবে সেই শক্তি–কেন্দ্রের বিরুদ্ধে যারা শোষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে চলেছে। যেক্ষেত্রে ক্ষত্রিয় শ্রেণী শোষক হয়ে উঠছে, সেক্ষেত্রে সদ্বিপ্রদের স্থূল শক্তির সাহায্য নিতে হতে পারে, পুঁজিপতি শ্রেণী) অবস্থিতি সুনিদ্দিষ্ট। এক একটি শ্রেণী এক এক যুগে আধিপত্য বিস্তার করে আর সমাজচক্রের ঘূর্ণনের কারণে ক্রমশঃ সেই শ্রেণীর আধিপত্য কমে গিয়ে পরবর্তী শ্রেণীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এইভাবেই সমাজচক্র ঘুরে চলেছে।

জীবন গতিশীল আর সমাজচক্রও বিরামহীন ভাবে ঘুরে চলেছে। সমাজচক্রের এই ঘোরাকে কিছুতেই স্তব্ধ করা যাবে না। কারণ স্থবিরতার অপর নামই মৃত্যু। এইজন্যে সদ্বিপ্র সৰ সময়ে খেয়াল রাখবে যে, যে শ্রেণী আধিপত্যে রয়েছে তারা যেন শোষণের কোন সুযোগ না পায়। যে মুহূর্তে একটি শ্রেণী

শোষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, সেই মুহূর্ত থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠের জীবন হয়ে ওঠে দুর্বিষহ। সংখ্যাগরিষ্ঠের দুর্ভোগের বিনিময়ে কতিপয় মানুষ সুখের স্বর্গে বিচরণ করতে থাকে। শুধু তাই নয়, সমাজে যখন এই ধরণের শোষণ চলতে থাকে, তখন কতিপয় শোষক আর সংখ্যাগরিষ্ঠ শোষিত–উভয়েরই অধঃপতন ঘটে। কতিপয় শোষকের অধঃপতন ঘটে–কারণ তারা অত্যধিক জাগতিক ভোগ সুখে নিমজ্জিত হয়। আর যেহেতু জাগতিক সমস্যা সমাধানের জন্যেই সংখ্যাগরিষ্ঠের সমস্ত কর্মশক্তি ব্যয়িত হয়ে যায়, সেহেতু তারা নিজেদের উত্তরণ ঘটাতে পারে না। মানস–ভৌতিক (psycho–physical) সামন্তরালতা রক্ষায় সদা নিয়োজিত থাকায় তাদের মানসিক তরঙ্গ দিনে দিনে স্থূলতর হয়ে যায়। এই কারণেই শাসক ও শাসিত উভয় পক্ষেরই জাগতিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিবিধান করতে হলে কাউকেই সমাজের অন্যদের ওপর শোষণ করার কোন রকম সুযোগ দেওয়া চলবে না।

সদ্বিপ্র নিষ্ক্রিয় সাক্ষীগোপাল নয়। কোন ব্যষ্টি অথবা শ্রেণী যাতে অন্যদের ওপর শোষণ করতে না পারে সেজন্য সদ্বিপ্ররা থাকবে সদা কর্মতৎপর। এই কারণে সদ্বিপ্রদের হয়তো স্থূলশক্তি সম্প্রয়োগও করতে হতে পারে, কারণ তাদের লড়তে

হবে সেই শক্তি–কেন্দ্রের বিরুদ্ধে যারা শোষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে চলেছে। যেক্ষেত্রে ক্ষত্রিয় শ্রেণী শোষক হয়ে উঠছে, সেক্ষেত্রে সদ্বিপ্রদের স্থূল শক্তির সাহায্য নিতে হতে পারে,

বিপ্রযুগে যখন বিপ্ররা শোষণের মাধ্যমে তাদের আধিপত্য বিস্তার করতে চলেছে তখন বিপ্লব আনতে হবে বৌদ্ধিক জগতে। আর যেহেতু গণতন্ত্রিক সংরচনা বৈশ্যদের পুঁজির পাহাড় সৃষ্টি করতে সাহায্য করে সেজন্যে গণতন্ত্রের সাহায্যেই বৈশ্য শ্রেণীর শাসন চলতে থাকে। আর তাই এই বৈশ্য শোষণের যুগে সদ্বিপ্রদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে বিজয়ী হওয়ার কৌশল অর্জন করার প্রয়োজনীয়তাও দেখা দিতে পারে।

(আইডিয়া এ্যান্ড আইডিয়লজি)
(মূল ইংরেজী থেকে অনূদিত।)

বিশ্বভ্রাতৃত্ব

সূচীপত্র

আধ্যাত্মিকতা কোন ভিত্তিহীন কল্পনাবিলাস (utopian ideal) নয়, আধ্যাত্মিকতাকে আমরা আমাদের কঠোর বাস্তব দৈনন্দিন জীবনে অনুশীলন ও উপলব্ধি করতে পারি। এই আধ্যাত্মিকতা হল মানবমনের বিবর্তন তথা সর্বোচ্চস্তরে উত্তরণের (elevation) নামান্তর, এর সঙ্গে কুসংস্কার ও' নৈরাশ্যবাদের সম্পর্ক নেই। যে সমস্ত বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতা বা ক্ষুদ্র গোষ্ঠী কেন্দ্রিক ভাবনা–চিন্তা মানুষের মনকে সংকীর্ণতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে তার সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার কোন সম্পর্ক নেই। ওই সৰ ভাবজড়তাকে মোটেই উৎসাহ দেওয়া উচিত নয়। যা মনকে প্রসারিত করে ও ঐক্যের ভাবনা জাগায়–তাই একমাত্র গ্রহণযোগ্য। আধ্যাত্মিকতা মানুষে মানুষে কৃত্রিম বিভেদকে স্বীকার করে না। আধ্যাত্মিকতা বিশ্বভ্রাতৃত্বের কথা বলে।

বর্তমানে নানান বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতা অখণ্ড মানবতাকে নানান্ যুধ্যমান গোষ্ঠীতে বিভক্ত করে দিচ্ছে। আধ্যাত্মিকতা মানুষের মনে চেতনা আনৰে ও পরস্পরকে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করবে, আধ্যাত্মিকতার আবেদন হৰে মনস্তাত্ত্বিক ও যুক্তিপূর্ণ। এই আবেদন মানুষের হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ

করবে, মানুষ যুক্তির পথ ধরে ভূমা সত্তার সঙ্গে তার আত্মীয়তার সম্পর্ক বুঝে নেবে–উপলব্ধি করৰে সেই পরম প্রেমময় সত্তা কিভাবে তাঁর অনন্ত করুণাধারায় সবাইকে আপ্লুত করে রেখেছেন। মানুষ যেখান থেকে এসেছে— যা তার পরম লক্ষ্য— সেই পরম সত্যের পানে আধ্যাত্মিকতা মানুষকে পরিচালিত করবে, সেই চরম ও পরম আদর্শই হল ভূমা আদর্শ–স্থান–কাল–পাত্রের ঊর্ধ্বে যার স্থান। এই আদর্শ চরম ও আপেক্ষিকতা বহির্ভূত। এই সত্তা অনাদি থেকে অনন্ত কাল পর্যন্ত আপন গৌরবে ভাস্বর, মানুষ অথবা তার চেয়েও অনুন্নত যে কোন জীবের পক্ষেই এই সত্তা চিরপ্রোজ্জ্বল–চিরভাস্বর সত্তা। কেবল এই ভূমা আদর্শই মানব জাতিকে ঐক্য সূত্রে বাঁধতে পারে–মানবজাতির চতুষ্পার্শস্থ বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতার সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ গণ্ডীকে দূর করে, র্বপ্রকার বন্ধনকে চূর্ণ–বিচূর্ণ করে মানবজাতিকে সামগ্রিকভাবে সংহত ও শক্তিমান করে তুলতে পারে।

যে সৰ চিন্তাধারা সংকীর্ণ ভাবাবেগকে বাড়িয়ে তোলে দৃঢ়ভাবে সেগুলির মোকাবিলা করা দরকার। অবশ্য এর মানে এই নয় যে, মানুষের সহজাত ভাবাবেগ, ঐতিহ্য ও অভ্যাসগুলির ওপর আঘাত হানতে হবে, কেননা এগুলির কোনটিই বিশ্বের সামূহিক প্রগতির পথে ৰাধা নয়। বাধা হলো

সেই সৰ কৃত্রিম ভাবাবেগ যেগুলির কোনটিই সামাজিক প্রগতির সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে না। যেমন সমস্ত দেশের মানুষকে একই পোশাক পরতে হবে' এই মর্মে কোন আন্দোলন গড়ে তোলা হলে তা খুবই হাস্যকর ও অযৌক্তিক কাজ হবে। কেননা, বিভিন্ন জনগোষ্ঠী পরিবেশ বা কাজ করার উপযোগিতা বিচার করে ভিন্ন ভিন্ন ধরণের পোশাক নির্বাচন করে থাকে। এছাড়া পোশাকে ভিন্নতা বিশ্বভ্রাতৃত্বের পক্ষে বিঘ্ন স্বরূপ একথা ভাবার কোন কারণ নেই।

এটাই স্বাভাবিক ঘটনা যে, বিভিন্ন অঞ্চলের ঐতিহ্য ও জনগোষ্ঠীগত আচার ব্যবহারের পরিপ্রেক্ষিতে ওই সৰ এলাকার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য এসেই পড়ে। বাস্তবসম্মত পথ হল এই পার্থক্যকে নির্মূল করার অপচেষ্টা বাদ দিয়ে সমাজের উন্নতির স্বার্থেই এগুলিকে মেনে নেওয়া ও উৎসাহিত করা। অন্যদিকে কোন পরিস্থিতিতেই বিশ্বৈকতাবাদী ভাবধারার পথে যে সৰ মত ও বিশ্বাস ৰাধা স্বরূপ তাদের সঙ্গে আপোষ চলৰে না। প্রতিমুহূর্তে যে কোন মানবতাবাদী মানুষ এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে চলবেন যাতে সামূহিক মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সমাজের জাগতিক সমস্যার সমাধান করে বিশ্বৈকতাবাদের ভাবনাকেই পুষ্ট করা যায়।

সূচীপত্র

এই আপেক্ষিক জগতে নিম্নলিখিত মৌলিক সমস্যাবলীর সমাধান অত্যাবশ্যক:

১) জীবন সম্পর্কে সাধারণ দর্শন
২) সাধারণ সংবিধানিক কাঠামো
৩) সাধারণ দণ্ডবিধি
৪) জীবন ধারণের সর্বনিম্ন চাহিদাগুলির (উৎপাদন, সরবরাহ ও ক্রয়ক্ষমতা) পরিপূরণ।

ব্যষ্টি মানুষের প্রগতি শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক এই তিন স্তরের ক্রম বিবর্তনের মাধ্যমেই সূচিত হয়ে থাকে। সাধারণ দর্শন মানব মনের অভ্রান্ত বিশ্লেষণ ও সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণাকে তুলে ধরবে। কোন কোন জড়বাদী চিন্তাবিদ এমন মত প্রকাশ করে থাকেন যে, আধ্যাত্মিকতা হ'ল। অলীক কল্পনা ও জীবনের সুকঠোর সমস্যাগুলি থেকে বহু দূরে তার অবস্থান। আবার অন্য কিছু চিন্তাবিদের বক্তব্য হল, শ্রমজীবী মানুষদের বোকা বানানোর চমৎকার ও সুচতুর কৌশল হল আধ্যাত্মিকতা। কিন্তু পূর্বোক্ত যুক্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিকতা ছাড়া মানুষের এক পা চলার উপায় নেই।

অন্যদিকে একশ্রেণীর মানুষ আছেন যাঁরা ভাবেন ধর্ম হ'ল একান্ত ব্যষ্টিগত ব্যাপার। এঁরাও ধর্মকে সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিতে দেখছেন একথা স্বীকার করতে হবে। ধর্ম ভূমার অভিমুখে মানুষকে পরিচালিত করে–মানুষের মনে বিশ্বৈকতাবাদী আদর্শের বোধ জাগিয়ে দেয়। সমস্ত মানুষকে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করে ধর্ম। তাছাড়া আধ্যাত্মিকতা মানুষকে যোগায় এমন এক শক্তি যার সঙ্গে অন্য কোন শক্তির তুলনা করা যায় না। সুতরাং সমসাময়িক ভৌতিক, মনস্তাত্ত্বিক, সমাজ–দার্শনিক সমস্যার সমাধানে এমন একটি দর্শনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে–যার ভিত্তি হবে আধ্যাত্মিকতা। অর্থাৎ মানব প্রগতির সঙ্গে অন্বিত আধ্যাত্মিক মানসিক ও ভৌতিক তিন স্তরেই সক্রিয় এমন একটি যুক্তিপূর্ণ সর্বানুস্যূত তত্ত্ব চাই যা সমস্ত মানুষের কাছে এক সাধারণ দর্শন হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে। এই তত্ত্ব হবে সর্বসময় প্রগতিশীল স্বভাবের।

বর্তমানে জাতীয়তাবাদ দ্রুত গুরুত্ব হারাচ্ছে। এর কুফল দুটি বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে ও সেইসঙ্গে ইদানীং বিশ্বে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিমিশ্রণ যেভাবে ঘটে চলেছে, তাতে বিশ্বজনীন ভাবনার আধিপত্যই সূচিত হচ্ছে। কায়েমী স্বার্থবাদীরা অবশ্য বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতা জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করছে। আসলে এইসব কায়েমী স্বার্থবাদীরা

মূলতঃ আর্থিক ও রাজনৈতিক মুনাফার দিকে চোখ রেখে এইসব প্রগতিবিরোধী ও ক্ষতিকারক অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। আনন্দের বিষয় এই যে এই বাধাকে অতিক্রম করেই মানবতা সামাজিক–সাংস্কৃতিক মিলনের পথে অগ্রসর হচ্ছে। এই অবস্থায় বিশ্ব–সংহতির প্রয়াসকে আরও জোরাল করে তুলতে দরকার একটি সাধারণ সাংবিধানিক কাঠামো। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে এক বিশ্বরাষ্ট্র গড়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যেমন–বিশ্বের একটা সামরিক বাহিনী থাকা উচিত। বিশ্বরাষ্ট্রের অধীনে থাকবে কিছু স্বয়ংশাসিত ইউনিট। এগুলিকে জাতীয়তার ভিত্তিতেই গড়তে হবে তার মানে নেই। শিক্ষা, খাদ্য সরবরাহ, বন্যা–নিয়ন্ত্রণ, পাব্লিক সেন্টিমেন্ট–এ সবের ভিত্তিতে এই স্বয়ংশাসিত ইউনিটগুলি গড়া উচিত। এই স্বয়ংশাসিত ইউনিটগুলি জাগতিক ও মানসিক স্তরের সমস্যাগুলির সমাধান করবে। এই সমস্ত ইউনিটের সীমানাও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি প্রভৃতি সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রয়োজনমত পরিবর্তিত করা চলতে পারে।

যোগাযোগ–ব্যবস্থার উন্নতি বিশ্বের প্রতিটি দুর্গম কোণকে আরও নিকটে– নিয়ে আসে ও পৃথিবী যেন মানুষের কাছে ক্রমে ছোট হয়ে আসতে থাকে। উন্নত থেকে উন্নততর যোগাযোগ ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে ইউনিটগুলি বিরাট অঞ্চল

জুড়ে যথেষ্ট তৎপরতা ও সাফল্যের সঙ্গে কাজ করতে সক্ষম হবে। বিশ্বে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে একটি সাধারণ ভাষা (লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা) থাকা জরুরী। (বর্তমানে ইংরেজীকে এই উদ্দেশ্য সাধনে সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকায় দেখা যায়। কাজেই কোনরকম সঙ্কীর্ণ জাতীয় ভাবপ্রবণতা নিয়ে ইংরেজীর বিরোধিতায় অবতীর্ণ হওয়া উচিত কাজ বলতে পারি না)। তবে স্থানীয় সাহিত্য তথা বিশ্বের সামূহিক বৌদ্ধিক অগ্রগতির স্বার্থেও আঞ্চলিক ভাষাগুলিকেও সমানভাবে উৎসাহিত করা দরকার। আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাকে ত্বরান্বিত করে থাকে, এটা ভুললে চলবে না।

সাধারণ দণ্ডবিধি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তাও রয়েছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে আইনকে প্রগতিশীল করে গড়ে তোলা জরুরী। কেননা, এটাই স্বাভাবিক ঘটনা যে, স্থান-কাল-পাত্রের চির পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে যে তত্ত্ব সমান্তরলতা বজায় রাখতে পারে না তা বিস্মৃতির গর্ভে তলিয়ে যেতে বাধ্য। সুতরাং আইনকে দেশ-কাল-পাত্রের উপযোগী করে সংশোধন করে নেওয়ার অবিরাম প্রয়াস থেকে কখনও সরে আসা উচিত নয়। বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে এটা বিশেষ প্রয়োজন।

সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের আইনে যা নিষিদ্ধ তা হল অপরাধ। আর পাপ ও পুণ্য চিরাচরিত দেশাচারের সঙ্গে সম্পর্কিত। আঞ্চলিক ঐতিহ্য ও দেশাচারের সঙ্গে সম্পর্কিত পাপ–পুণ্যের এই ধ্যান–ধারণা ও চলতি ঐতিহ্য আইন প্রণেতাদের ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে থাকে। এইভাবে অপরাধের সংজ্ঞা নির্ণয়ে প্রচলিত পাপ–পুণ্যের ধারণা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। অথচ পাপ–পুণ্যের ধারণা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম। এই পরিপ্রক্ষিতে বিশ্বভ্রাতৃত্বের যাঁরা বার্তাবহ তাঁদের লক্ষ্য রাখতে হবে বিভিন্ন দেশে সক্রিয় ন্যায়–নীতি– ও আইনের মধ্যে যে পার্থক্য ও বৈষম্য আছে তাকে যেন কমিয়ে আনা যায়। অর্থাৎ পাপ–পুণ্যের ধারণাকে আঞ্চলিক দেশাচারের বৈষম্য থেকে উদ্ধার করে তার একটি বিশ্বজনীন ধারণা প্রবর্তন করতে হবে। সাধারণ ভাৰে যে সৰ কাজ মানুষের জাগতিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়ক সেগুলিকে 'পুণ্য' ও যেগুলি ৰাধাস্বরূপ সেগুলিকে 'পাপ'–এই মর্মে এক সর্বজনীন ধারণার প্রবর্তন ঘটাতে হবে।

জীবনধারণের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলির সহজ প্রাপ্যতা কেবল বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেই নয়, মানুষের ব্যষ্টিত্বের বিকাশেও এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। এই সমস্যার সমাধানটা করতে হবে সামগ্রিকরূপে– একই সঙ্গে সমগ্র পৃথিবী

ব্যাপী। আর এই সমাধানটা করতে হবে কতকগুলি মৌলিক সিদ্ধান্তের ওপর ভিত্তি করে। প্রতিটি মানুষের জন্যে সর্বনিম্ন চাহিদার পরিপূরণের গ্যারান্টি দিতে হবে। খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা ও বাসস্থান–সর্বনিম্ন এই চাহিদাগুলি সম্পর্কে মানুষ যখন নিশ্চিন্ত হবে তখনই তার পক্ষে উদ্বৃত্ত প্রাণশক্তিকে (বর্তমানে সর্বনিম্ন চাহিদা মেটাতেই মানুষের সমস্ত প্রাণশক্তি নিঃশেষ হচ্ছে) সূক্ষ্ম সম্পদ অর্থাৎ, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সম্পদ অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত করতে পারবে। সঙ্গে সঙ্গে উন্নত যুগের সৃষ্ট ভোগ্যপণ্যের সুযোগ থেকে সে যাতে বঞ্চিত না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। বলা বাহুল্য, উপরি–উক্ত দায়িত্ব পালন করতে ক্রয় ক্ষমতার যথেষ্ট উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

ব্যষ্টিগত দক্ষতা ও শ্রম–শক্তি ব্যতিরেকেই যদি প্রতিটি মানুষকে ন্যূনতম চাহিদা–পূরণের গ্যারান্টি দেওয়া হয় তাহলে ব্যষ্টি মানুষ পরিশ্রমবিমুখ ও অলস হয়ে পড়তে পারে। এছাড়া মনে রাখতে হবে সর্বনিম্ন চাহিদা প্রতিটি মানুষের ক্ষেত্রে একই। কিন্তু বৈচিত্র্য হ'ল সৃষ্টির স্বভাব বা নিয়ম। এই দিকটা চিন্তা করে যাতে সমাজের দক্ষতা ও বৌদ্ধিকতার বৈচিত্র্যকে পূর্ণভাবে কাজে লাগানো যায় ও মানব প্রগতিতে প্রতিভার পূর্ণ ফসল লাভ করা যায় তার জন্যে সর্বনিম্ন

চাহিদার অতিরিক্ত বিশেষ সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থাও রাখতে হবে। তার সঙ্গে সঙ্গে এটাও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, সর্বনিম্ন পারিশ্রমিক হিসেবে সাধারণ শ্রমিক যা পাৰে আর একজন দক্ষ বা গুণী ব্যষ্টি যা পাৰেন–এই দুয়ের মধ্যেকার পার্থক্য কমিয়ে আনারও যেন অবিরাম প্রয়াস থাকে। একাজ করতে গেলে একই সঙ্গে দুটি পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। প্রথমতঃ যুগের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সাধারণ মানুষের সর্বনিম্ন চাহিদার পরিধি ৰাড়াতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, মুষ্টিমেয় দক্ষতা সম্পন্ন মানুষের জন্যে প্রদত্ত বিশেষ সুযোগ সুবিধার পরিধি কমিয়ে আনতে হবে। ব্যষ্টিমানুষের আধ্যাত্মিক মানসিক ও ভৌতিক অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করার স্বার্থে সৰযুগেই এই ধরণের অর্থনৈতিক সামঞ্জস্য রক্ষার প্রয়াস চালিয়ে যেতে হবে। আর এই প্রয়াসের লক্ষ্য হৰে বিশ্বভ্রাতৃত্বের–আদর্শকে বাস্তবায়িত করা।

এই সামাজিক–অর্থনৈতিক সংরচনায় মানুষ মানসিক ও আধ্যাত্মিক স্তরে পূর্ণ স্বাধীনতা পাৰে। মানসিক ও আধ্যাত্মিক সম্পদ অনন্ত। তাই এই সম্পদ কোন মানুষ যতই আহরণ করুক না কেন, তাতে কারুর ঘাটতি পড়ৰে না। কিন্তু জাগতিক সম্পদ সীমিত। এক্ষেত্রে একজন অতিরিক্ত সঞ্চয় করলে সমাজের অধিকাংশ মানুষের ন্যূনতম চাহিদা পূরণে

ঘাটতি দেখা দেবে। এতে বৃহত্তর–জনগণের আধ্যাত্মিক, মানসিক ও ভৌতিক অগ্রগতি রুদ্ধ হতে ৰাধ্য। সুতরাং ভৌতিক স্তরে ব্যষ্টি স্বাধীনতার সমস্যাকে সমাধান করতে গেলে, একে অবশ্যই একটা ঊর্ধ্বসীমার বাইরে যেতে দেওয়া হবে না। আবার একে কঠোর ভাবেও খর্ব করা উচিত নয়– কেননা তা করলে মানুষের আধ্যাত্মিক, মানসিক ও ভৌতিক স্তরের বিকাশ সম্ভব হবে না।

এইভাবে আনন্দমার্গের সমাজদর্শন একাধারে মানুষের ব্যষ্টিত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ও মানুষের মনে বিশ্বৈকতাৰোধের সঞ্চার করে বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার পথ–নির্দেশনা দিচ্ছে। আনন্দমার্গ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ–সকল সম্পদেরই প্রগতিশীল উপযোগের কথা বলছে। সমাজ–দেহে নতুন করে প্রাণশক্তির সঞ্চার করতে ও এর প্রগতিকে ত্বরান্বিত করতে দিয়েছে প্রগতিশীল উপযোগ তত্ত্ব (Progressive Utilisation Theory)– সংক্ষেপে 'প্রাউট' (PRO–U–T)।

যাঁরা এই 'প্রাউট'কে সমর্থন করবেন–তাঁদের বলা যেতে পারে 'প্রাউটিষ্ট'।

প্রাউটের নীতিসমূহ নিম্নলিখিত মৌলিক সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভরশীল:

(১) কোন ব্যষ্টিই সামবায়িক সংস্থার (collective body) সুস্পষ্ট অনুমোদন ছাড়া ভৌতিক সম্পদ সঞ্চয় করতে পারবে না।

(২) বিশ্বের যাবতীয় জাগতিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সম্পদের সর্বাধিক উপযোগ গ্রহণ করতে হৰে ও যুক্তি সঙ্গত বণ্টন করতে হবে।

(৩) মানব সমাজের মধ্যে ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত যত প্রকার আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক সম্পদ আছে সব কিছুরই সর্বাধিক উপযোগ গ্রহণ করতে হবে।

(৪) এই জাগতিক, মানসিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক উপযোগ সমূহের মধ্যে সুনির্দিষ্ট বিবেচনা ও সামঞ্জস্য থাকা অবশ্য প্রয়োজনীয়।

(৫) দেশ, কাল ও পাত্রের পরিবর্তন অনুযায়ী সমগ্র উপযোগ নীতির পরিবর্তন হতে পারে, আর এই উপযোগ হবে প্রগতিশীল স্বভাবের।

এই হ'ল আমাদের প্রগতিশীল উপযোগ তত্ত্ব বা প্রাউট।

(আইডিয়া এ্যান্ড আইডিয়লজি)
(মূল ইংরেজী থেকে অনূদিত।)

চতুর্থ খণ্ড

প্রাউটের ওপর কয়েকটি প্রবচন

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভূমা চৈতন্যের অভ্যন্তরীণ মানস প্রক্ষেপ, জীবমানসের পক্ষে যা হল প্রতিফলিত প্রক্ষেপ মাত্র। মৌল কোন কিছু আমরা তৈরী করতে পারি না। জড় থেকে উৎসারিত তরঙ্গকে নিয়েই আমাদের কারবার। আমরা তার রূপগত পরিবর্তন করে ভৌতিক (physical) মিশ্রণ বা রাসায়নিক যৌগ তৈরী করি মাত্র। তাই আমাদের সৰকিছুই ভৌত বা বাহ্য- অভ্যন্তরীণ প্রক্ষেপ। এ জগতের মূল উপাদান মানুষ তৈরী করতে পারে না। তাই জগতের সকল সম্পদের মালিকানা স্বত্ব কেবলমাত্র ব্রহ্মেরই আছে–ব্যষ্টিগত কারও নেই। শ্রীজীমূত বাহন ভট্টাচার্য রচিত দায়ভাগ ব্যবস্থার পিতৃশাসিত একান্নবর্তী পরিবারের মত আমরা এ সমস্ত সম্পদ ভোগ করতে পারি মাত্র।

এ বিশ্বজগৎ আমাদের সকলের পৈত্রিক সম্পত্তি। আমরা সকলে এক বিশ্বভিত্তিক যৌথ পরিবারের সদস্য। পরম পুরুষ আমাদের পিতা। যৌথ পরিবারের সদস্যদের মতই আমাদের উচিত সৰাই 'নিজে ৰাঁচ ও অপরকে ৰাঁচাও' নীতি নিয়ে

চলা। বিশ্বের ব্যবহৃত সমস্ত সম্পদ কোন বিশেষ ব্যষ্টি, রাষ্ট্র বা জাতির সম্পত্তি নয়। সকলের কেবল এই সম্পদ ভোগ করবার অধিকার আছে মাত্র। এই ভূমা-উত্তরাধিকার মেনে নিয়ে যাবতীয় লোকায়ত ও লোকোত্তর সম্পদের সদ্ব্যবহার আমাদের করতে হবে। এটাই আমাদের সামাজিক ধর্ম। কেবলমাত্র সামাজিক বিবেচনার দিক থেকেই নয়, যুক্তি ও ন্যায় বিচারের দিক থেকেও এটাই একমাত্র পথ। এটাই যথার্থ সমাজ দর্শন।

এই বিশ্বের পরিভূতে রয়েছে অনন্ত সংখ্যক আপেক্ষিকতার সমাবেশ। তাই কোন সরকারী আদেশ বা উত্তরাধিকার বিধি সর্বক্ষেত্রে যথার্থ বলে মেনে নেওয়া যায় না। কারণ এই সৰই আপেক্ষিকতার গণ্ডীতে আবদ্ধ। যদি এই জাগতিক ও মানসিক ক্ষেত্রে সার্থক কোন বিধান চালু করতে হয়, তবে সেক্ষেত্রে আমাদের শাশ্বত কোন কিছুর ওপর নির্ভর করতেই হৰে। এই বিশ্ব যা ভূমামনের মানসিক প্রক্ষেপমাত্র-এটা আপেক্ষিকতারই সৃষ্টি আর এর মালিকানা থেকে যাচ্ছে কেবল ভূমা সত্তার। তাই একটা সর্বার্থসাধক সামাজিক রাজনৈতিক বিধান প্রতিষ্ঠার জন্যে চাই আপেক্ষিকতা ও শাশ্বত সত্তার সুমহান সমন্বয়।

যুক্তিসম্মত ভূমা উত্তরাধিকারের নীতি যদি আমরা মানি তাহলে স্বদেশ- বিদেশের প্রশ্নটাই ওঠে না। এই সমগ্র বিশ্ব আমাদের পৈত্রিক সম্পত্তি আর আমরা সৰাই এই বিশ্বসমাজের সদস্য। সুতরাং ইচ্ছেমত বিশ্বের যত্রতত্র যাওয়ার বা বসবাস করার স্বাধীনতা আমাদের থেকে যাচ্ছে।

অণুমনের রয়েছে অনন্ত এষণা, তাই কেবলমাত্র ভৌতিক সম্পদেই এ এষণা তৃপ্ত হয় না। আমাদের চাহিদা তিন ধরণের–ভৌতিক (physical), মানসিক ও আধ্যাত্মিক। অণুমন তার অনন্ত ভৌতিক ক্ষুধা ভৌতিক উপাদান লাভের মাধ্যমেই তৃপ্ত করতে চায়, কিন্তু এই ভৌতিক সম্পদ যদিও বিপুল, তবুও অনন্ত নয়, সীমিত। স্বভাবতঃই মানুষ এই সমগ্র পৃথিবী গ্রহটার মালিক হলেও তার অনন্ত ভৌতিক ক্ষুধা চিরদিনই অতৃপ্ত থেকে যাবে। তাই এই অনন্ত ভৌতিক ক্ষুধাকে মানসিক ও আধ্যাত্মিক পথে চালিত করতে হবে।

ভৌতিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক এই তিন স্তরের মধ্যে মানসিক ও আধ্যাত্মিক জগৎ অনন্ত। এই দুই স্তরে অণুমনের অনন্ত এষণার পরিতৃপ্তি হতে পারে। এতে স্বার্থের দ্বন্দ্ব দেখা দেবে না, অন্যথায় ভৌতিক কামনা বাসনা অতৃপ্ত থেকেই যাৰে ও কালক্রমে তা অধিকতর শক্তি সঞ্চয় করে পরিশেষে

বিপর্যয় ঘটাবে। মানুষের চাহিদা ত্রিবিধ। আনন্দমার্গের লক্ষ্য অতৃপ্ত এই ভৌতিক ক্ষুধাকে মানসিক ও আধ্যাত্মিক এষণায় রূপান্তর ঘটানো। রেনেসাঁ ইউনিবার্সালের কাজ হল মানুষের কাছে ৰৌদ্ধিক আবেদন জানানো। আর প্রাউটিষ্টদের কাজ হল আইন শৃঙ্খলা কঠোর ভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে কিনা তা সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করা। যদি আইন শৃঙ্খলা কঠোর ভাবে প্রয়োগ করা না হয় যদি সেটা যম-নিয়ম বিরোধী হয় তবে অবস্থার চাপ সৃষ্টি করে এটাকে কার্যকর করতেই হবে।

ভৌতিক সম্পত্তির বিচারবুদ্ধি সম্মত উৎপাদন ও বণ্টন হওয়া উচিত। নতুবা সমাজের শান্তি ও সাম্যাবস্থা বিঘ্নিত হবে। বিশ্বসমাজের সামূহিক সম্পদের পরিমাণ অনুযায়ী ভৌতিক সম্পদের জন পিছু সংগ্রহের মাত্রা নির্ধারণ করে দিতে হবে।

ভৌতিক সম্পদের এই যুক্তি সম্মত অর্জন ও বণ্টন ব্যবস্থার আদর্শ রূপায়িত করতে আমাদের প্রথম পদক্ষেপ হৰে আধ্যাত্মিক ও তৎপরে মানসিক আবেদন। মানসিক আবেদন ব্যর্থ হলে সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে আমাদের উচিত শক্তি সম্প্রয়োগকে সমর্থন করা। যারা এই সংগ্রামকে এড়িয়ে 'যেতে চাইছেন তারা প্রকৃতপক্ষে মানবিক দায়িত্বের প্রতি অবহেলা

করছেন। মানুষের প্রগতি হল ৰহুকিছুর সামূহিক ফল। প্রগতির গতি সংঘর্ষ ও সমিতির মাধ্যমে ক্রমাগত দ্রুতির পথ ধরে এগিয়ে চলে। সেই প্রগতির গতিকে ত্বরান্বিত করতে গেলে শক্তি সম্প্রয়োগ করতে হবে বৈ কি! এটাই জীবন ধর্ম। এই জীবন ধর্মের বিরোধিতা করা মানেই কপটাচরণকে প্রশ্রয় দেওয়া। জীবনের অভিক্ষেত্রে প্রতিমুহূর্তে এই শক্তিসম্প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা সৰসময় আমরা উপলব্ধি করি। কি ভৌতিক ক্ষেত্রে, কি মানসিক ক্ষেত্রে, এমন কি আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও এই শক্তি সম্প্রয়োগ থেকে বিরত থাকা চলে না। শক্তি অসম্প্রয়োগ নীতি একটা ভাঁওতা মাত্র। এই বিশ্ব ব্রহ্মের প্রক্ষিপ্ত মানস- কল্পনা। এর সবকিছুরই মালিকানা স্বয়ং ব্রহ্মের। বিশ্বপিতার মালিকানায় আমরা কেবলমাত্র ভোগ করি। তাই তো সম্পত্তির মালিকানা কোন প্রজারও নয়, কোন জমিদারেরও নয়। "লাঙ্গল যার জমি তার"-একথাও ঠিক যুক্তি সম্মত নয়। এতেও সংঘর্ষ ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। ভূমা উত্তরাধিকার স্বত্ব মেনে নিয়ে সাধ্যমত ভূসম্পত্তির সর্বাধিক উপযোগ নিতে হবে। ভূসম্পত্তির সাধারণীকরণের জন্যে জমিদারদের কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়া চলবে না। এইটাই যুক্তি সঙ্গত যে ভূসম্পত্তির মালিক যদি হন একজন অসহায়া বিধবা বা একজন বৃদ্ধ বা কোন অপ্রাপ্ত বয়স্ক ৰালক বা বালিকা-তাদের জন্যে মাসোহারার বন্দোবস্ত করতে হৰে বৈ

কি! যারা বেকার যুবক তাদের জীবিকার সংস্থান করে দিতে হবে। ছোট ছোট জমিদার যাদের জীবিকা নির্বাহের অন্য কোন ব্যবস্থা নেই তাদের জন্যে বৃত্তির ব্যবস্থা করা উচিত। তবে নীতিগত ভাবে ক্ষতি পূরণের নীতিকে সমর্থন করা যায় না।

মন চায় একটা মানসিক আধার। আমাদের চিন্তা-ভাবনাগুলো আসলে মনের আধারই। এগুলো ভৌত-মানসিক প্রক্ষেপ। আধ্যাত্মিক সাধনা মনের এই প্রক্ষিপ্ত বিষয়ের ব্যাপ্তি ঘটায়। ব্যাপ্তির কোণ (angle) নির্ভর করে প্রক্ষিপ্ত বিষয়ে আয়তনের ওপরে। জাতিভেদ প্রথা, মধ্যযুগের ধূর্ত কায়েমী-স্বার্থবাদী বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর সৃষ্টি। বিপ্রযুগে এরা চেয়েছিলো, তাদের বিশেষ সুবিধাজনক স্থানে তাদের পরবর্তী বংশধরদেরও স্থায়ী ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে। এই উদ্দেশ্য সফল করতেই ধূর্ত বুদ্ধিজীবীরা এই জাতিভেদ প্রথাকে ঈশ্বরের সৃষ্টি ৰলে প্রমাণ করতে হাজার হাজার পুঁথি লিখেছেন, দেবদেবী নিয়ে হাজার হাজার শ্লোক রচনা করেছেন। এ সৰ অযৌক্তিক ধারণা সাধারণ মানুষের মধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়ে দেওয়ার একটা মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি মাত্র।

যাঁরা বুন্দেলা রাজপুতদের উন্নতির কথা ভাবেন তাঁরা যদি সাধনার মাধ্যমে তাঁদের মানসিক অধিক্ষেত্রের প্রসার ঘটান তাহলে তাঁরা গোটা রাজপুত সমাজেরই কল্যাণের কথা ভাববেন। এইভাবে সাধনার দ্বারা তাদের মানসিক অধিক্ষেত্র যতই ৰাড়ৰে ক্রমে ক্রমে ততই তাঁরা নিজেদের হিন্দু বলতে, তারপর বিহারী বলতে, তারপর নিজেদের ভারতীয় ও সবশেষে নিজেদের বিশ্ব পরিবারের সদস্য বলে ভাবতে গর্ব অনুভব করবেন। তারপর যখন তাঁরা বিচার প্রবণ মানসিকতা ও সমন্বয়ী দৃষ্টি নিয়ে গভীর ভাবে অনুধ্যান করবেন তখন তাঁরা বিশ্বের প্রতিটি কণার সঙ্গে তাঁদের অন্তরের যোগ অনুভব করবেন ও এইভাবেই মানুষ ভূমা–সত্তার সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করবে। এই অবস্থা হল সবিকল্প সমাধির অবস্থা। এই বিশ্বৈকতাবাদের উপলব্ধির কম অন্য যে কোন উপলব্ধিই বিপত্তি ঘটাৰে। জাতীয়তাবাদের প্রচার, সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা ইত্যাদির মতই একটা মানসিক রোগ বিশেষ।

এই সব রোগের একমাত্র নিদানই হলো বিশ্বৈকতাবাদ, যা প্রকৃতপক্ষে মনের ৩৬০° কৌণিক প্রক্ষেপ। অনেকেই বলতে পারে জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ প্রাদেশিকতা বা সাম্প্রদায়িকতা থেকে বড়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ছোটবড় দৃষ্টিকোণ নির্ভর

করে মানস প্রক্ষেপের আয়তনের ওপর। উদাহরণ স্বরূপ বলা চলে পাকিস্তানের লোকসংখ্যা ভারতের হিন্দু জনসংখ্যার চেয়ে কম। সুতরাং হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার দৃষ্টিকোণ পাকিস্তানের জাতীয়তাবাদের দৃষ্টিকোণের চেয়ে বড়। সুইস জাতীয়তাবাদীর লোকসংখ্যা বাঙলার চেয়ে কম। এখানে প্রাদেশিকতা জাতীয়তাবাদের চেয়ে ভালো বলতে হবে। নেপালের জনসংখ্যা ভারতের রাজপুত জনসংখ্যার চেয়ে কম, এখানে জাতিগত (casteism) দৃষ্টিকোণ নেপালী জাতীয়তায়বাদের চেয়ে বড়। আমরা এর কোনটাই মানৰ না।

(জামালপুর, ১৭-১০-৫৯)

(২)

বিশ্বৈকতাবাদ কোন আপেক্ষিক তত্ত্বের ওপর নির্ভরশীল নয়। তাই এতে 'ইজম্' এর কোন দোষ নেই। ইম্ গড়ে ওঠে কোন দলগত স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে। অন্য অনেক কারণের মধ্যে 'ইজম্' যুদ্ধ-বিগ্রহের একটা বড় কারণ। এই যুদ্ধ কোন ভাবাদর্শগত সংঘর্ষ নয়। যারা শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিশেষ আগ্রহী তাদের জাতীয়তাবাদ বা অন্য অনুরূপ ইজম্ পরিহার করতে হবে। যদি আমাদের এইসব 'ইজম্' পরিহার করতে হয়, তবে আমাদের একটা বিশ্বসংস্থা গড়ে তুলতে হৰে ও এর ক্ষমতাকে

ক্রমে বাড়িয়ে তুলতে হবে। এটাই হবে বিশ্বরাষ্ট্র গড়ে তোলার প্রথম ধাপ। প্রাথমিক স্তরে এটা হবে একটা আইন প্রণয়নকারী সংস্থা। এর প্রথম সুফল হবে, কোন দেশই সংখ্যালঘুদের স্বার্থের পরিপন্থী কোন আইন আপন খেয়াল–খুশীমত প্রণয়ন করতে পারবে না। এই সব আইন কার্যকরী করার অধিকার থাকবে স্থানীয় সরকারের ওপর, বিশ্বরাষ্ট্রের ওপর নয়। বিশ্বরাষ্ট্র কোন বিশেষ দেশে, কোন বিশেষ আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নীতি নির্ধারণ করবে।

বিশ্বরাষ্ট্রে দুটি পরিষদ থাকে–নিম্নতন পরিষদ ও ঊর্ধ্বতন পরিষদ। নিম্নতন পরিষদের জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্বাচিত প্রতিনিধি পাঠান হবে। ঊর্ধ্বতন পরিষদে প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হবেন রাষ্ট্রগতভাবে। প্রথমে কোন বিল নিম্নতন পরিষদে পেশ করা হবে ও পাকাপাকি ভাবে গৃহীত হবার আগে এটা যথাযথ ভাবে ঊর্ধ্বতন পরিষদে আলোচিত হবে। যে সকল ছোট ছোট রাষ্ট্র একটি সদস্যও নিম্নতন পরিষদে পাঠাতে পারবে না, তারা ঊর্ধ্বতন পরিষদে অন্যান্য দেশের প্রতিনিধির সঙ্গে বিলের ভাল–মন্দ নিয়ে আলোচনার সুযোগ পাবে।

মানুষ দ্রুত দেশ-কাল জয় করে চলেছে। বিশ্বরাষ্ট্রের পরিসীমাও দিন দিন বেড়ে চলবে। একদিন সমগ্র সৌরজগতে এর পরিব্যাপ্তি ঘটতে পারে। বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক ভাবে বিনিময়ের সুবিধার জন্যে একটি সাধারণ ভাষা অর্থাৎ বিশ্বভাষার প্রয়োজন। বর্তমান কালে বিশ্বভাষা হওয়ার সকল গুণাবলীই ইংরেজী ভাষার রয়েছে। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এরও পরিবর্তন ঘটতে পারে।

সাধারণ বিশ্বভাষার জন্যে প্রয়োজন অধিক বিজ্ঞান সম্মত একটি বিশ্ব লিপি। বর্তমান কালে রোমান লিপিই সবচেয়ে বেশী বিজ্ঞান সম্মত। স্থানীয় ভাষার জন্যে স্থানীয় লিপির অনুমোদন দিতে হবে। রোমান লিপি ও স্থানীয় লিপি দুই-ই পাশাপাশি চলতে পারবে।

কোন নির্দিষ্ট জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পোশাক থাকা উচিত নয়। পোশাক নির্বাচন করা হয় কোন স্থানের স্থানীয় জলবায়ুর ভিত্তিতে। এই পোশাক নির্বাচনে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকাই বাঞ্ছনীয়।

সমাজ-জীবনের সামূহিক অভিব্যক্তিকে বলে 'কালচার'। কালচারের সংস্কৃত প্রতিশব্দ হল সংস্কৃতি ও কৃষ্টি। সংস্কৃতি

শব্দটি ব্যবহৃত হয় ভাল অর্থে আর কৃষ্টি হয় সাধারণ অর্থে। কিছু স্থানীয় আপাতবৈচিত্র্য সত্ত্বেও মানব সমাজের গভীরে সংস্কৃতির অন্তঃসলিলা যে ফল্গুধারা বয়ে চলেছে সেখানে কোন পার্থক্য নেই। তারতম্যটা বাহ্যিক, অভ্যন্তরীণ নয়। সমগ্র বিশ্বে মানুষ জাতির সংস্কৃতি একটাই। বিশ্বমানবতার সাধারণ উপাদানগুলিকে উৎসাহিত করতে হবে। আপাত পার্থক্যগুলিকে কখনই উৎসাহিত করা চলবে না। যারা এই আপাত পার্থক্যগুলিকে উৎসাহিত করছেন তারা বিচ্ছিন্নতাবাদকে প্রাউটের ওপর কয়েকটি প্রবচন প্রশ্রয় দিচ্ছেন যা মানব প্রগতির ক্ষেত্রে অন্তরায়। বিশ্ব সংস্কৃতির দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার জন্যে আপাত পার্থক্যগুলিকে মুছে ফেলতে হবে। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর পারস্পরিক বিবাহ বা সামাজিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মেলামেশার মাধ্যমে এটা সম্ভব হবে।

আন্তর্জাতিকতাবাদ দ্রুত জাতীয়তাবাদের স্থান দখল করে নিচ্ছে। একদিন নিশ্চয়ই আসৰে যখন আন্তর্জাতিকতাবাদ বিশ্বৈকতাবাদে রূপান্তরিত হয়ে যাবে।

আন্তর্জাতিকতাবাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের মনোভাব সুপ্ত থেকে যায়। উন্নততর সামাজিক সংরচনা গড়ে তুলতে মানুষকে জাত-পাত, সম্প্রদায় বা জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণ

ভাবধারাগুলিকে পরিত্যাগ করতে হবে। মনের ব্যাপ্তি যত ঘটছে পৃথিবীটাও ক্রমে তত ছোট হয়ে আসছে। স্থূল কামনা-বাসনার পূর্তিতে আর মানুষ তৃপ্ত হতে পারছে না। এমন একদিন আসবেই যখন মানুষ তার অন্তরের তৃষ্ণা মেটাবার জন্যে সূক্ষ্মতর মানস-সম্পদের সন্ধান করবে। এক নতুন বিশ্ব-ভিত্তিক মানবজাতির বিকাশ ঘটবেই। এই নতুন মানব জাতির জন্যে আমরা চাই এক সাধারণ (common) ভাষা, যা হবে পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যম।

দুর্নীতির মূলচ্ছেদ করতে চাই একটা রচনাত্মক আদর্শ। এই রচনাত্মক আদর্শের অভাবের জন্যেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন আন্দোলন জনকল্যাণমূলক কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছে। কেবল সংগ্রামের জন্যেই সংগ্রাম করা হয়েছে। সুতরাং প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আদর্শটাই সবচেয়ে বড় কথা।

যাদের কোন রচনাত্মক আদর্শ নেই, তারা পুঁজিবাদীদের শোষণের সহায়তা করে। কেবলমাত্র পুঁজিবাদের সমালোচনা করে জনসাধারণের কল্যাণ করা যায় না। বরং এর ফলে এই সমস্ত সমাজ-বিরোধীরা সতর্ক হয়ে যাবার সুযোগ পায় ও শোষণের জন্যে অধিকতর বিজ্ঞান সম্মত তথা শঠতাপূর্ণ পদ্ধতি আবিষ্কার করে। এইটাই ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থা।

বামপন্থী দলগুলি সৰসময় পুঁজিবাদীদের সমালোচনা করে চলেছে। এতে কোন ফল হচ্ছে না। উপরন্তু পুঁজিপতিরা শাসকবর্গকে প্রভাবিত করে সকল ক্ষমতা দখল করে বসে আছে। তাই একটা রচনাত্মক আদর্শ অবশ্যই থাকা উচিত। যা কিছু মানবতা-বিরোধী, যা কিছু সমাজ-বিরোধী, সৰ কিছুর বিরুদ্ধে অবিরাম আপোষহীন সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে-পুঁজিপতির বিরুদ্ধে নয়।

মানুষের সমাজ থেকে ইজম্মের উৎখাত করতেই হবে। কারণ এই ইজই মানবতাবাদকে পঙ্গু করে দিচ্ছে। পুঁজিবাদীরা এক ধরণের মানসিক ব্যাধিতে ভুগছে। তাদের অনন্ত ভৌতিক (physical) ক্ষুধাকে মানসিক ও আধ্যাত্মিক সম্পদের দিকে চালিত করে তাদের পুরোপুরি রোগমুক্ত করাই আমাদের মুখ্য কর্তব্য।

(জামালপুর, ১৮-১০-৫৯)

(৩)

গণতান্ত্রিক কাঠামোতে কোন সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা চলে না। যারা গণতান্ত্রিক মঞ্চে দাঁড়িয়ে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে

সূচীপত্র

ৰড় বড় বুলি কপচান, তারা জনসাধারণকে বিভ্রান্তই করেন। সংবিধানের ফাঁক-ফোকর বা ত্রুটিগুলি এড়িয়ে চলতে ও জনগণের আস্থা অর্জন করতেই রাজনৈতিক নেতারা সমাজতন্ত্র সম্পর্কে ৰড় বড় কথা ৰলেন, সামাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ গড়ার প্রতিশ্রুতি দেন। এরা মেকী সমাজতন্ত্রী ছাড়া কিছু নয়।

কোন একটি দেশ বা জেলা যদি অত্যধিক শিল্পোন্নত হয়, তাতে যথাক্রমে স্থানীয় বা দেশের অপরাপর অংশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কোন রকম সুবিধা হয় না। তাই শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ দরকার। কিন্তু মূল শিল্প থাকে কেন্দ্রীকৃত। উদাহরণ স্বরূপ, সূতাকল শিল্প হৰে কেন্দ্রীকৃত, যাকে কেন্দ্র করে বিকেন্দ্রীকরণ পদ্ধতিতে গড়ে উঠৰে বস্ত্রবয়ন শিল্প। এমনকি যে সৰ এলাকার জলবায়ু শুষ্ক সেখানেও এই ধরণের সূতাকল শিল্প গড়ে উঠতে পারে কৃত্রিম পদ্ধতিতে বাষ্পীভবনের দ্বারা। এটা স্বয়ং-সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক ইউনিট গড়ে তোলার পক্ষে সহায়ক হৰে-যা একান্তভাবেই দরকার। স্বয়ং-সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক ইউনিটের সীমারেখা ক্রমেই বেড়ে যাৰে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে। একদিন এই পৃথিবীটাই একটা গোটা অর্থনৈতিক ইউনিটে পরিণত হবে।

এমন একটা সময় আসতে পারে যখন সমগ্র সৌরজগৎটাও একটা মাত্র অর্থনৈতিক ইউনিটে পরিণত হবে।

বৃহৎ ও ক্ষুদ্র উভয় শিল্পই পাশাপাশি থাকবে। মূল শিল্প পরিচালিত হবে স্থানীয় সরকার দ্বারা। কারণ এর জটিলতা ও ব্যাপকতার জন্যে সমবায় ভিত্তিতে সুষ্ঠুভাবে চালান সম্ভব নয়। ক্ষুদ্র শিল্প সমবায় ভিত্তিতে পরিচালনা করা অসুবিধাজনক, কেবলমাত্র সেগুলি ব্যষ্টিগত পরিচালনায় ছেড়ে দেওয়া হৰে। এইভাবে–(১) ছোট ছোট ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান থাকৰে ব্যষ্টিগত পরিচালনায়, (২) বৃহৎ শিল্প থাকৰে স্থানীয় প্রশাসনের পরিচালনায়, (৩) ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্পের মাঝের শিল্পগুলি পরিচালিত হবে সমবায় ভিত্তিতে। এই হল আদর্শ প্রাউটের শিল্প–ব্যবস্থার রূপরেখা।

কেন্দ্রীয় সরকার বৃহৎ শিল্পের নিয়ন্ত্রণ করবে না, কারণ এতে স্থানীয় জনসাধারণের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হতে পারে। যেখানে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা রয়েছে, সেখানে স্থানীয় রাজ্য সরকার বা যেখানে একক শাসন ব্যবস্থা রয়েছে সেখানে স্থানীয় লোক সংস্থা এই বৃহৎ শিল্প পরিচালনা করবে।

শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ সেই সমাজেই সম্ভব, যেখানে রয়েছে সামূহিক অর্থনৈতিক কাঠামো (কালেকটিব ইকনমিক স্ট্রাকচার)। এই কাঠামোতে কোন মুনাফা লাভের মানসিকতা থাকবে না। পুঁজিবাদীরা কেবল সেখানেই শিল্প- কারখানা গড়ে তোলে যেখানে মূলধন, শ্রমিক, অনুকূল জলবায়ু, মাল বিক্রির জন্যে তৈরী ৰাজার-এই শর্তগুলি রয়েছে। এরা সব সময় চেষ্টা করে মালের উৎপাদনমূল্য কমাতে। তাই এরা কখনই বিকেন্দ্রীকরণ নীতি মেনে নেৰে না। সামূহিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে মুনাফা লাভের মানসিকতার কোন স্থান নেই-তাই এখানে শিল্পায়ন হয় মানুষের প্রয়োজন মেটাবার তাগিদে। এই সামূহিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনৈতিক ইউনিটকে আরও মজবুত করে গড়ে তুলতে হবে।

আজকের যুগ বিজ্ঞানের যুগ। এই বিজ্ঞানকে কাজে লাগাতে হৰে জীবের সেবা ও কল্যাণে। এর জন্যে চাই শিল্পের 'র্যাশান্যালাইজেশান'-পুরানো যন্ত্রের পরিবর্তে নূতন বিজ্ঞানসম্মত যন্ত্র বসাতে হবে। রকেট যুগে চরকার মতো পুরানো ঘুণে ধরা পদ্ধতির কোন মূল্য নেই। বিজ্ঞানসম্মত নূতন নূতন উন্নত শিল্পই হল বেকার সমস্যার মূল কারণটা- এটা একটা ভুল ধারণা। এইসব প্রচার সেইসৰ নেতারাই

করেন যাদের সামাজিক অর্থনৈতিক দর্শন সম্পর্কে জ্ঞানের সীমা খুৰই সীমিত। ৰেকার সমস্যার উদ্ভব হয় কেবলমাত্র পুঁজিবাদী কাঠামোতে, যেখানে শিল্পের মূল লক্ষ্য মুনাফা। সামূহিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যেখানে শিল্প হচ্ছে চাহিদা পুরণের জন্যে, মুনাফা লোটার জন্যে নয়, সেখানে বেকার সমস্যার কোন প্রশ্নই ওঠে না। এখানে শ্রমিক সংখ্যা কমানো হবে না, বরঞ্চ কাজের সময় কমে যাবে। আর এই বাড়তি সময়টা কাজে লাগানো হৰে মানসিক ও আধ্যাত্মিক অনুশীলনে। এই কাজের সময় কমানোটা কেবলমাত্র উৎপাদনের ওপরেই নির্ভর করে না, উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা ও শ্রম শক্তির যোগানের ওপর এটা নির্ভরশীল।

শিল্পে পিস্‌-ওয়ার্ক ও বোনাস ব্যবস্থার সুযোগ চালু করে বা ৰাড়িয়ে শ্রমিকদের উৎসাহ যোগাতে হবে। আর শিল্প-কারখানা ব্যাপারে শ্রমিকদের পরিচালন-সংক্রান্ত অধিকার সুস্পষ্ট ভাবে মেনে নিতে হৰে। এই দুই ব্যবস্থা কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি করবে, কারণ এই ব্যবস্থায় শ্রমিকরা আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করার একটা তাগিদ অনুভব করৰে। উৎপাদন ৰাড়ানোর জন্যে কেবলমাত্র গুরুগম্ভীর শব্দযুক্ত উপদেশই যথেষ্ট নয়। শ্রমিকেরা অনুভব করুক, যে যতই

কারখানায় উৎপাদন বাড়িয়ে মুনাফা অর্জন করবে, ততই তাদের লভ্যাংশ বাড়বে।

সমবায় মালিকানা ব্যক্তিগত উদ্যোগের সঙ্গে সরাসরি প্রতিযোগিতায় টিকতে পারে না। এর জন্য চাই এর রক্ষাকবচ, যেমন বিক্রয় কর বা অন্যান্য শুল্ক থেকে অব্যাহতি ইত্যাদি। তারপর ধীরে ধীরে এইসব রক্ষাকবচ তুলে নিতে হবে।

এই সব রক্ষাকবচ কেবলমাত্র নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রেই থাকবে। ব্যক্তিগত উদ্যোগ সীমাবদ্ধ থাকবে সেই সব পণ্যের মধ্যে যা জীবনের ক্ষেত্রে অবশ্য প্রয়োজনীয় নয়, যেমন পানের দোকান, চায়ের দোকান, রেস্তোরাঁ ইত্যাদি।

এই সমাজে পুরুষেরা বিশেষ সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে। পুরুষদের উপর অর্থনৈতিক নির্ভরতার জন্যে পরিত্যক্তা নারীদের একাংশ পতিতা- বৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। যখন সমাজে নারীরা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও পুরুষের সমান মর্যাদা পাবে তখন এই ধরণের বৃত্তি বন্ধ হয়ে যাবে। যে সব নারী ওই জঘন্য বৃত্তি পরিত্যাগ করে নিজের চরিত্র শুধরে

নেবেন, সেই সৰ নারীকে উপযুক্ত মর্যাদা সমাজকে দিতে হবে। পতিতাবৃত্তি সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কুফল।

পণ-প্রথার কারণ মুখ্যতঃ দুটি-একটি, অর্থনৈতিক অর্থাৎ নারী পুরুষের একের অন্যের ওপর অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা; অপরটি নারী পুরুষের সংখ্যাগত তারতম্য। ৰার্মাতে [বর্তমান মায়ানমার] নারীরা অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বাধীন। বিয়েতে সেখানে পুরুষকেই পণ দিতে হয়। পঞ্জাবে পুরুষের সংখ্যা নারীদের সংখ্যার চেয়ে বেশী তাই সেখানে পণপ্রথার সমস্যা বা বিধবা বিবাহের সমস্যা নেই। নারীদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দিয়ে ও আন্তঃসাম্প্রদায়িক, আন্তর্জাতিক ও অসবর্ণ বিবাহকে উৎসাহ দিয়ে এই সামাজিক অবিচার দূর করা যাবে। বর্তমানে এই ধরণের আন্দোলন একান্ত জরুরী।

আজকাল 'শান্তি, শান্তি' ৰলে চেঁচানো একটা রীবাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু শান্তির প্রচারকেরা যেমন শান্তির ললিত বাণী প্রচার করছে, আবার যুদ্ধের অস্ত্রও শান দিচ্ছে। এদের এই ৰাগাড়ম্বরে কোন কাজের কাজ হৰে কি? না, কখনই না। শান্তি একটা আপেক্ষিক তত্ত্ব। এই শান্তি সংগ্রামেরই ফল। যখন তমোগুণী শক্তি প্রাধান্য লাভ করে, তখন যে শান্তি যাকে তাকে বলা হয় তমোগুণী শান্তি বা তামসী শান্তি। আবার

যখন সত্ত্বগুণী শক্তির প্রাধান্য তখন যে শান্তি আসে তাকে বলা হয় সাত্ত্বিকী শান্তি। এই তমোগুণী শক্তি ও সত্ত্বগুণী শক্তির লড়াই চলৰে যতদিন এই বিশ্বের অস্তিত্ব থাকৰে। আপেক্ষিকতার পরিভূতে পরমা শান্তি বা চিরস্থায়ী শান্তি থাকতে পারে না। এই পরমা শান্তি ব্যষ্টিগত জীবনে অর্জিত হতে পারে কিন্তু সামূহিক ক্ষেত্রে নয়। যখন ব্যষ্টিগত অস্তিত্ব ভূমাঅস্তিত্বে মিলে যায় বা ব্যষ্টিগত এষণা ভূমার এষণার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় তখনই ব্যষ্টিগত জীবনে আসে সাত্ত্বিকী শান্তির ঝর্ণাধারা। সামুহিক জীবনে এই সাত্ত্বিকী শান্তি আসার অর্থ–গোটা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডেরই বিলুপ্তি–এটা একেবারেই অসম্ভব। সুতরাং 'শান্তি শাস্তি' বলে চেঁচানোটা হল ভণ্ডামি। এই প্রচার রাজনীতির কূটনৈতিক চাল হিসেবে নেওয়া যেতে পারে–কিন্তু মূলনীতি বলে মেনে নেওয়া যায় না। সংগ্রামই জীবনের মূলকথা, আর সংগ্রামের ফলেই কেবলমাত্র শান্তি প্রতিষ্ঠা হতে পারে। তাই কোন দেশ আক্রান্ত হলে, ওই আক্রান্ত রাষ্ট্রের নেতারা সত্যই যদি শান্তি স্থাপনে আগ্রহী হন, তবে তাদের ওই আক্রমণকারী রাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতার বিরুদ্ধে লড়তে হৰে।

ক্ষমা একটা ব্যষ্টিগত গুণ। কেবলমাত্র ব্যষ্টি জীবনেই এটার অনুশীলন করা যেতে পারে, সামূহিক জীবনে চলার

পথে এর স্থান নেই। যাঁরা সামূহিক ব্যাপারে অযথা নাক গলান, অথবা সামূহিক জীবনে ক্ষতি করা সত্ত্বেও ক্ষমা করে দেন, তাঁরা একটা সামাজিক অপরাধ করে বসেন। একটা দেশের জনগণের স্বার্থ ও সেন্টিমেন্টের বিরুদ্ধে ওই দেশের সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে অন্য একটি সরকারকে ৫০ কোটি টাকা দিতে বাধ্য করা– এটা মহাত্মা গান্ধিজীর উচিত কাজ হয়নি।

দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি সামূহিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে এরকম একটা ধারণা প্রচার করা ভুল। আজ পুঁজিবাদীরা জন্ম নিয়ন্ত্রণের নীতি প্রচার করে জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করতে চেষ্টা করছে, কারণ এই জনসংখ্যা বৃদ্ধি পুঁজিবাদের পক্ষে ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। সামূহিক ব্যবস্থায় এই জন্মনিয়ন্ত্রণের কোনও প্রয়োজন নেই। বরঞ্চ এই জনসংখ্যার বৃদ্ধি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য–সামগ্রীর উৎপাদনের পক্ষে সহায়ক হবে। এই বিজ্ঞানের যুগে একটা বড়ি ভরপেট খাদ্যের কাজ করবে। সুতরাং এই জনসংখ্যার বৃদ্ধিতে ভীত হবার কোনও কারণ নেই।

মৃত্যু হল জীবের ভৌতিক ও মানসিক তরঙ্গের সমান্তরালতার অভাব। সাধারণতঃ বার্দ্ধক্য ও রোগে ভৌতিক

তরঙ্গের পরিবর্তন ঘটে। মানসিক তরঙ্গের পরিবর্তন ঘটে স্থুল বা সূক্ষ্ম চিন্তার ফলে। ভৌতিক তরঙ্গের বিচ্যুতির (detachment) ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে মৃত ব্যক্তি প্রাণ ফিরে পেতে পারে কিন্তু মানসিক তরঙ্গের বিচ্যুতি ঘটলে তা সম্ভব নয়। কারণ এরকম ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যদি নূতন করে সমান্তরাল তরঙ্গ তৈরী করা যায়, তবে সেই দেহে অন্য কেউ পুনর্জন্ম পেয়ে যেতে পারে। সাধনার বলে যখন এই মানসিক তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য সরলরেখার মতো অনন্ত হয়ে যায়, তখনই সাধক পরমপুরুষের সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়।

একটা সময় আসবে যখন মন তৈরী হবে গবেষণাগারে। শিশুর জন্ম হৰে গবেষণাগারে। মানুষের প্রগতি প্রাকৃতিক প্রগতি। যখন এই গবেষণাগারে শিশু তৈরী হবে তখন প্রকৃতিও স্ত্রী-পুরুষের সন্তান-উৎপাদনের ক্ষমতা ধীরে ধীরে কেড়ে নেবে। সেদিন ৰাৰা মা কেউ থাকৰে না। গোটা সামাজিক ব্যবস্থাই পাল্টে যাবে। মানুষের সৃষ্টির এষণা সেদিন আরও উন্নততর ও সূক্ষ্ম ক্ষেত্রে কাজ করৰে। ওই সৰ গবেষণাগারের ছেলেমেয়েরা আজকের মানুষের চেয়ে মানসিক ও আধ্যাত্মিক দিক থেকে অনেক বেশী উন্নত হৰে।

প্রকৃত দর্শন ও প্রকৃত সাধনা পদ্ধতি সৰ রকম ভৌতিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক রোগের নিদান। সামাজিক ব্যবস্থার পুনর্ঘটনে রাজনীতিকদের কোন বাস্তব–মূল্য নেই।

(জামালপুর, ১৯–১০–৫৯)

(৪)

আজ জীবনের সকল ক্ষেত্রেই নীতিহীনতার এক কালো ছায়া দ্রুত ঘনিয়ে আসছে ও তা মানুষের প্রগতির পথে দারুণ অন্তরায় সৃষ্টি করে চলেছে। নীতিহীনতার এই আবর্জনা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করতে চাই প্রচণ্ড শক্তিশালী নৈতিক বল। এই দুর্দান্ত নৈতিক ৰল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কোন সরকারের কাছ থেকে আশা করা যায় না। এটা আমরা আশা করতে পারি অরাজনৈতিক পক্ষ থেকে। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কোন দল বা নেতাদের খামখেয়ালী কাজকর্মকে ৰাধা দেওয়ার মতো নৈতিক ৰলের যদি সমাজে অভাব দেখা দেয়, তাহলে যে কোন সরকার–তা সে ফ্যাসীবাদী, সাম্রাজ্যবাদী, সাধারণতন্ত্রী, একনায়কতন্ত্রী, আমলাতান্ত্রিক বা গণতান্ত্রিক, যাই হোক না কেন, সে সরকার অত্যাচারী হতে বাধ্য। সরকারের নীতিহীন কাজকর্মের ফলেই গণ–অভ্যুত্থানের জন্ম হয়। উন্নত মেধাসম্পন্ন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় অর্থনৈতিক দুরবস্থার জন্যে

যারা উত্তেজনায় ফুটতে থাকে, এরাই অপশাসনের বিরুদ্ধে গণ–অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দেয় ও শেষ পর্যন্ত সমাজের এই রাজনৈতিক সচেতন অংশই শাসক- শক্তির পরিবর্তন ঘটায়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে সৰ মধ্যবিত্ত মানুষ সরকারী প্রশাসনের অংশ হিসাবে কাজ করে তাদের পক্ষে সক্রিয় প্রতিবাদের আওয়াজ তোলা খুবই অসুবিধা জনক। তারা নিঃশব্দে দুর্ভোগ ভুগতে থাকে। তাদের এই কষ্টের কোন স্বীকৃতিও মেলেনা। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার এইটাই সৰচেয়ে বড় ত্রুটি।

মানব–সভ্যতার ইতিবৃত্ত এ কথাই ৰলে যে যদি কোন সরকার মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সামূহিক স্বার্থের বিরুদ্ধে যায়, সেক্ষেত্রে ওই সরকারের পতন হৰেই। শিক্ষায় অনগ্রসর কোন রাষ্ট্রে যেখানে জনসাধারণ রাজনৈতিক সচেতন নয়, সেখানে পূর্ণ বয়স্কের বোটাধিকারের ব্যবস্থা সরকারী প্রশাসন যন্ত্রকে দুর্নীতিগ্রস্ত করে দেয়। কপট নেতারা রাজনীতি–সচেতন মধ্যবিত্ত সমাজের বোট হাতাতে পারে না বা মিথ্যা প্রতিশ্রুতির বাগ্জাল রচনা করে এদের বোকা বানাতে পারে না। এ অবস্থায় সরকার মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের স্বার্থের বিরুদ্ধে যেতে থাকে। দুর্নীতিপরায়ণ নেতারা অনুন্নত শ্রেণীর মানুষের বোট কেনার জন্যে নানান্ ধূর্তামির পথ নেয়। যে নেতা যত

সূচীপত্র

ধূর্ত হয় এক্ষেত্রে সে ততই সফল হয়। সুতরাং রাজনৈতিক নেতাদের দুর্নীতি রোধ করতে প্রয়োজন, রাজনৈতিক সচেতন, ভাল হয়, রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিতদের নিয়ে একটি সংস্থা গড়ে তোলা।

পৃথিবী দ্রুত এগিয়ে চলছে, আর প্রতি ক্ষেত্রেই এরূপ একটা সংস্থার প্রয়োজনীয়তা খুবই অনুভূত হচ্ছে। তথাকথিত রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত গোষ্ঠীর একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল যুবগোষ্ঠী। ছাত্রগোষ্ঠীও এর একটা বিশিষ্ট অংশ। রাজনৈতিক ব্যবস্থার ত্রুটি শিক্ষাব্যবস্থায় অবনতি ঘটায় আর এর ফলে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অর্থনৈতিক দায়দায়িত্ব সরকারের ওপর ন্যস্ত থাকায় সরকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে দুর্ভাগ্যজনক ভাবে অনুগত ভৃত্যে পরিণত করে। প্রাউটিষ্ট সংঘটন গড়ে তোলার মূল উদ্দেশ্য হ'ল, ব্যষ্টিগত ও সামূহিক জীবনে নীতিহীন কাজকর্মের বিরুদ্ধে একটি নৈতিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

আজকাল রাজনীতিকরা তাদের নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীদের বিপথগামী করছে। ছাত্রদের কোন কোন অংশ এদের হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছে। এই সকল ছাত্র তাদের নিজেদের স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলেছে ও তাই এদের

পক্ষে নৈতিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব নয়। তোমরা প্রাউটিষ্টরা যম–নিয়মের নীতিগুলি মেনে কঠোরভাবে অরাজনৈতিক সংস্থা হিসাবে কাজ করে যাও।

যারা খাঁটি জীবন–দর্শন ও যম–নিয়মে প্রতিষ্ঠিত যথার্থ আধ্যাত্মিক সাধনার পথ পেয়েছে, তারাই আগামী দিনে সমাজের নেতৃত্ব দেবে। সচেতন মানুষের কর্তব্য রাজনৈতিক ভণ্ডদের হাত থেকে ভৌতিক ক্ষমতা ও বৌদ্ধিক নেতৃত্ব কেড়ে নেওয়া। এই সব রাজনৈতিক নেতারা সব সময় কেবলমাত্র কাদা ছোঁড়া–ছুঁড়িতে মত্ত। তাই তারা সমাজের কোন কাজেই আসবে না। যদি সদ্বিপ্ররা জনগণের সক্রিয় সাহায্য পায়, তাহলে বিপ্লব আসতে বাধ্য। যদি কোন সরকার প্রাউটের আদর্শ গ্রহণ করে, সেখানে সদ্বিপ্রের শাসন কায়েম হবে। যদি এই আদর্শ কোন সরকার গ্রহণ না করে, তবে রক্তাক্ত বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী। আর শেষ পর্যন্ত শাসনক্ষমতা সদ্বিপ্রের হাতেই যাবে।

রাজনীতিকদের মতলব কেবলমাত্র ক্ষমতা দখল করা। তারা বড় বড় বুলির সাহায্যে সাধারণ মানুষকে বোকা বানায়। তাই এক্ষেত্রে সাধারণ মানুষকে রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা দরকার, তাহলে রাজনীতিবিদ্রা আর

এদের ঠকাতে পারবে না। একটা সময় অবশ্যই আসবে, তখন এদের সব রকম লোক–ঠকানো কৌশল জনগণের মনে আর কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করৰে না। সেদিন এই জনগণই ওদের সমাজসেবার মুখোশ খুলে দেৰে। বর্তমানে সাধারণ মানুষ রাজনীতি সচেতন নয়, তাই তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা এদের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে শোষণ করছে। প্রাউটিষ্টদের কর্তব্য হল এইসৰ তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের চ্যালেঞ্জ করা।

বিশ্ব সেনা–দল (ওয়ার্লড্ মিলিসিয়া) থাকৰে। কিন্তু সেনাদলে সৈন্য সংখ্যা ধীরে ধীরে কমিয়ে আনতে হবে। বিশ্বরাষ্ট্র তৈরী হবার পরেও 'বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক সংঘর্ষ বা কোন দেশের অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ একেবারে ৰন্ধ হয়ে যাবে না। কারণ বিদ্যা–অবিদ্যার সংঘর্ষের ফলেই তো এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি! সুতরাং পুলিশ–মিলিটারীর প্রয়োজন চিরদিনই থাকৰে।

(জামালপুর, ২০–১০–৫৯)

(৫)

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল শিক্ষা–ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের রাজনৈতিক আদর্শের প্রসার

ঘটাতে চেষ্টা করে। দলের আদর্শের সঙ্গে মেলে এমন পাঠ্যপুস্তক তারা অনুমোদন করে। অর্থনৈতিক নির্ভরতার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও সরকারের কাছে মাথা নোয়াতে ৰাধ্য হয়। এইসব বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে নোংরা দলবাজি থেকে বাঁচাতে প্রাউটিষ্টদের আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। তা না হলে বিভিন্ন দলের সরকারের উত্থান পতনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থারও বারবার পরিবর্তন হতে থাকবে–এটা ৰাঞ্ছনীয় নয়। সরকারের উচিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে আর্থিক সাহায্য করা, কিন্তু তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। প্রচার মাধ্যমকে সরকারী নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত রাখা উচিত।

সুন্দর ও সুস্থ সমাজের জন্যে দরকার হয় সৎ, সুস্থ ও সুশিক্ষিত নাগরিকের। সমাজের ত্রুটি দূর করতে রাজনীতিবিদ্রা অসমর্থ। তাদের কাজের ধারা সুস্থ সমাজ গড়ে তোলার পক্ষে ক্ষতিকর।

নানা রকম শাসন পদ্ধতি রয়েছে। আর তাদের মধ্যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সবচেয়ে বেশী প্রশংসিত। গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্যে, জনগণের সরকার। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এটা সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন। তাই

গণতন্ত্র হল 'মৰোক্র্যাসি', কারণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকার নিয়ন্ত্রিত হয় 'ম-সাইকোলজি'র (জনতা-মনস্তত্ব) দ্বারা। সমাজের বেশীরভাগ মানুষই নির্বোধ, প্রকৃত জ্ঞানীরা সবসময়ই সংখ্যালঘু। তাই শেষপর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, এই গণতন্ত্র নির্বোধের তন্ত্র (ফুলোক্র্যাসী) ছাড়া আর কিছুই নয়।

গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় দেখা যায় সরকার দুর্নীতিরোধে আইন পাস করতে যতটা আগ্রহী, এই আইনগুলি কার্যকরী করতে ততটা আগ্রহী নয়। কারণ নেতাদের নির্ভর করতে হয় প্রভাবশালী সমাজ- বিরোধীদের মাধ্যমে সংগৃহীত বোটের ওপর। দুর্নীতি দমনের মুখ্যতঃ তিনটি পদ্ধতি-মানবিক আবেদন, শক্তি সম্প্রয়োগ ও কঠোর আইনের প্রয়োগ। কিন্তু গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় আমরা তৃতীয় পদ্ধতিটি পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারি না। আর এ ব্যবস্থায় দ্বিতীয়টির প্রয়োগের কোন সুযোগ নেই।

সদ্বিপ্র নিয়ন্ত্রিত সরকারের সংশ্লেষণাত্মক অংশ (synthetic portion) হবে নির্বাচন ভিত্তিক (electional), আর বিশ্লেষণাত্মক (analytic) অংশ হবে নিয়োগভিত্তিক (selectional)। সরকারের সংশ্লেষণাত্মক অংশ নীতি নির্ধারণ করবে ও বিশ্লেষণাত্মক অংশ নির্ধারিত নীতিকে কার্যকর

সূচীপত্র

করবে। এভাবে আমাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থা হবে নিয়োগ- নির্বাচন ভিত্তিক (selecto-election)।

সদ্বিপ্ররা ক্ষমতা দখল করবে হয় বৌদ্ধিক বিপ্লব ঘটিয়ে নতুবা গণ- জাগরণের মাধ্যমে। প্রাউটিষ্টদের কাজ হবে এই সকল সদ্বিপ্রদের শক্তিশালী করতে সাহায্য করা তথা গণ-জাগরণ ঘটিয়ে তাদের হাতকে মজবুত করা। রেনেসাঁ ইউনিবার্সাল-এর কাজ হবে বৌদ্ধিক ও নৈতিক জাগরণের জন্যে সংঘবদ্ধ প্রচার চালিয়ে যাওয়া।

হয় বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে নতুবা ভৌতিক ক্ষেত্রে বিপ্লবের মাধ্যমেই সামাজিক অর্থনৈতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

বৌদ্ধিক বিপ্লবের অর্থ আদর্শের ব্যাপক প্রচার। কিন্তু এটা সংঘটিত হতে দীর্ঘ সময় লেগে যাবে। আর এর জন্যে শোষিত জনগণ অপেক্ষা করে বসে থাকবে না। এটা তত্ত্ব-কথাতেই সম্ভব।

ভৌতিক বিপ্লব বলতে বোঝায়, জনকল্যাণ নীতির পরিপন্থী যে কোন কাজ-কর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। প্রাউটিষ্টরা সব রকম বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে

বিপ্লবের সূচনা করবে। কোন রাষ্ট্রে যদি দুর্নীতিগ্রস্তদের আচরণ সংশোধনের মত যথেষ্ট ক্ষমতা সম্পন্ন আইন না থাকে, সেক্ষেত্রে প্রাউটিষ্টরা যথোচিত ব্যবস্থা নেৰে। গণতান্ত্রিক সংরচনায় সংখ্যা–গরিষ্ঠই হোক আর সংখ্যা লঘিষ্ঠই হোক– যখন এক শ্রেণীর মানুষের আশা আকাঙক্ষার পূর্তি না হয়। তখন একটা অগণতান্ত্রিক বা রক্তক্ষয়ী বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। এ রকম বিপ্লব যদিও কাম্য নয়, তবুও তা অবধারিত ও অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে।

একটা **জাতির (নেশন)** অস্তিত্ব নির্ভর করে নিম্নলিখিত উপাদানগুলির ওপর–

(১) সাধারণ (common) ইতিহাস, (২) সাধারণ ঐতিহ্য (tradition), (৩) সাধারণ এলাকা (territory), (৪) জাতি (race), (৫) ধর্ম বিশ্বাস (faith), (৬) ভাষা, (৭) সেন্টিমেন্ট, (৮) সাধারণ আদর্শ।

এই উপাদানগুলির মধ্যে ১নং ও ৭নং উপাদান আপেক্ষিক ও তাই এ দুটি পরিবর্তনশীল। ৮নং উপাদানে পরমতত্ত্বের (absolute) সঙ্গে আপেক্ষিকতার সমন্বয়ের সুযোগ রয়েছে। এই পরমতত্ত্ব ভিত্তিক আদর্শ হল– ভূমা উত্তরাধিকার তত্ত্ব

(Cosmic Ownership)। এই বিশ্ব ব্রহ্মের সৃষ্টি। তাই এর মালিকানা তাঁরই। তাঁর সৃষ্ট বিভিন্ন বস্তুকে আমরা কেবলমাত্র ভোগ করতে পারি বা উপযোগ গ্রহণ করতে পারি। কিন্তু তা বলে আমরা এসব নিজের বলে দাৰী করতে পারি না– সৰকিছুই আমাদের যৌথ পৈত্রিক সম্পত্তি। আপেক্ষিকতার পরিভূর মধ্যে আমাদের এ আদর্শকে মেনে নিতে হৰে। এই সাধারণ আধ্যাত্মিক উপাদানটি কেবলমাত্র যে বহু ভাষা–যুক্ত অথবা বহু অঙ্গ–রাজ্যযুক্ত (multi–regional) দেশের অধিবাসীদের একত্রীভূত করবে তাই নয়, সমগ্র মানব সমাজ এই আধ্যাত্মিক আদর্শের পতাকাতলে আসবে ও এক অখণ্ড বিশ্ব–সমাজ গড়ে তুলবে।

ৰৌদ্ধিক বিপ্লব গণতান্ত্রিক পথেই সংঘটিত হয়। প্রাউটিষ্টরা এক্ষেত্রে জনগণকে তাদের অধিকার ও দাবী সম্পর্কে সচেতন করে তুলবে। এটা করা হৰে নিম্নলিখিত ভাবে।

প্রথম পর্যায়–পাঠচক্র খুলতে হৰে ও আদর্শ সম্পর্কিত বিভিন্ন পত্র– পত্রিকা ও পুস্তকের মাধ্যমে জনগণকে আদর্শ সম্পর্কে আগ্রহী করে তুলতে হৰে। এটা হল ৰৌদ্ধিক স্তরে প্রচারের প্রথম পর্যায়। এটা হল আদর্শগত শিক্ষা।

দ্বিতীয় পর্যায় সভা সমিতি ও মিছিলের মাধ্যমে জনগণকে আদর্শ সম্পর্কে সচেতন করে তোলা। সর্বসাধারণকে আদর্শের শিক্ষায় শিক্ষিত করা যাবে না, তাদের আদর্শ সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে।

তৃতীয় পর্যায়-প্রাউটিষ্টরা এই গণতান্ত্রিক লড়াই-এ সদ্বিপ্রদের সাহায্য করবে। লোকসভায়, বিধানসভায়, পঞ্চায়েতে, বিভিন্ন স্থানীয় প্রশাসন তথা বিভিন্ন সমবায় সংস্থায় (কো-অপারেটিব্ সোসাইটি) আসন দখলে সদ্বিপ্রদের সহায়তা করতে হবে।

প্রথম স্তরে প্রথম পর্যায়ের কাজগুলি করতে হবে।

দ্বিতীয় স্তরে-প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ একসঙ্গে করতে হবে।

তৃতীয় স্তরে-একসঙ্গেই প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের কাজ চালাতে হবে।

গণতান্ত্রিক সংরচনায় সামাজিকীকরণ সম্পূর্ণ সফল হতে পারে না।

(৬)

বিশ্ব-জগৎ একটি বৃহৎ যৌথ পরিবার। এই বিশ্ব-পরিবারের সুখ-শান্তি নির্ভর করছে একটি সুসংহত সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ওপর। সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার রূপায়ণ আবার নির্ভর করছে আদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। প্রথমেই আমাদের প্রয়োজন একটি রচনাত্মক আদর্শের। এই আদর্শের কেবলমাত্র শেষ লক্ষ্য বিন্দু থাকলেই চলবে না, এর এমন একটা প্রারম্ভিক বিন্দুও থাকতে হবে-যা সৰ সময় আমাদের সঞ্জীবনী শক্তি যুগিয়ে যাবে। আমরা চাই একটা বিশ্বসমাজ-একটা বিশ্বভ্রাতৃত্বের ৰন্ধন।

এখন বিশ্বভ্রাতৃত্বের প্রতিষ্ঠার জন্যে আমাদের মধ্যেকার সাদৃশ্যগুলোকে প্রোৎসাহিত করতে হৰে ও বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতাগুলিকে নিরুৎসাহিত করতে হবে। স্থানীয় বৈচিত্র্যের ব্যাপারে আমাদের নীরব থাকতে হবে। বিশ্ব সমাজের সংস্কৃতি একটাই। এর ভিত্তি হচ্ছে মানবিক মূল্যৰোধ। এই এক মাত্র মানবিক সেন্টিমেন্টই সমগ্র মানৰ সমাজের সুখ-দুঃখ-হাসি-কান্নার সাথী হৰে। মানুষ একে অন্যকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে, এক সাথে সমাজ গড়ে, সুখে- শান্তিতে বাস করে ও শান্তিতে মরণকে বরণ করে। এইটাই মানব-সংস্কৃতি। এই

মৌলিক সংস্কৃতিকে উৎসাহ দিতে হবে। এটাই মানুষে মানুষে নেশনে নেশনে সংযোগ-সেতু রচনা করে চলে। বিভেদকামী প্রবণতাগুলি কায়েমী স্বার্থবাদীদের সৃষ্টি। এরা সমাজের শত্রু। এরা ভদ্রবেশী শয়তান-এরা যুদ্ধৰাজ। এদের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আমাদের অবিরাম আপোষহীন সংগ্রাম করে যেতে হবে।

বিশ্বসমাজের সংহতির জন্যে সাধারণ মানবিক উপাদান ও ন্যূনতম চাহিদার ওপর ভিত্তি করে নূতন অর্থনৈতিক সংরচনার সূত্রপাত করতে হৰে। দৃঢ়ভিত্তিক অর্থনৈতিক সংরচনার জন্যে সৰচেয়ে প্রথমে যা প্রয়োজন- তা হল:

(১) মানব-সমাজের সর্মনিম্ন প্রয়োজনের গ্যারান্টি দিতে হবে:

মানুষের সর্বনিম্ন প্রয়োজন মেটানোর কথা ৰলেই ক্ষান্ত হলে চলবে না, এই সৰ প্রয়োজন পূর্তির গ্যারান্টিরও ব্যবস্থা করতে হবে। তাই প্রতিটি ব্যষ্টির ক্রয় ক্ষমতার ব্যবস্থা করে দেওয়াও আমাদের সামাজিক দায়িত্ব।

একটা সুসংবদ্ধ সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জন্যে চাই আরও কিছু প্রয়োজনীয় শর্ত। যেমন-

(২) সাধাৱণ জীবন দর্শন:

একটা সাধারণ (common) ভাবাদর্শের ভিত্তিতেই মানুষ একসঙ্গে মিলিত হয়। এই বিরাট পৃথিবীরূপ গ্রহের মানুষ যতক্ষণ না একটা প্রাণবন্ত আদর্শ গ্রহণ করছে ততক্ষণ পর্যন্ত সামাজিক সংশ্লেষণের সম্ভাবনা খুবই কম। এটার অভাবেই মানুষের মধ্যে বাদ–বিসংবাদ–কলহ আসে। সুতরাং একটা সাধারণ জীবন দর্শন অতি অবশ্য প্রয়োজনীয়। স্থূল ও সূক্ষ্ম সৰ রকম জীবন দর্শনের মধ্যে একটি মাত্র জীবন দর্শন পরম তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ৰাকীগুলো আপেক্ষিক তত্ত্বের ওপর নির্ভরশীল। দর্শন যত স্থূল হৰে, সামাজিক বন্ধন তত দুর্বল হয়ে পড়বে। দর্শন যত সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হবে, সমাজ–ৰন্ধন ততই দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হবে। দর্শনের এই সূক্ষ্মত্ব যখন সূক্ষ্মতম পরম তত্ত্বে পৌঁছায়, তখন সেই দর্শন হয় শাশ্বত। এই শাশ্বত দর্শন ব্রহ্মবিদ্যা নিয়ে চর্চা করে। এটা কোন ভৌতিক বা আপেক্ষিক দর্শনের আওতায় আসে না। তাই এই পৃথিবী গ্রহটার স্থায়ী সুখ–শান্তির জন্যে ভূমা আদর্শ–ব্রহ্মবিদ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত একটি উন্নত দর্শন দরকার।

(৩) সাংবিধানিক কাঠামোর বিশ্বজনীনতা :

সাধারণতঃ স্থানীয় রীতিনীতি ও সেন্টিমেন্টকে ভিত্তি করেই বিভিন্ন দেশের রাজারা বা নেতারা আইন রচনা করেছে। সত্যি কথা বলতে কি বিভিন্ন দেশের আইনগুলি রচিত হয়েছে পাপ–পুণ্য সম্পর্কিত মানুষের ধারণা ও ধর্ম্মমতাশ্রয়ী (religious) বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করেই। পাপ–পুণ্যের এসৰ ধারণার বাস্তবমূল্য যাচাই করে দেখতে হবে। মৌলনীতির ওপর ভিত্তি করে আইন রচনা করতে হবে। সমগ্র বিশ্বের জন্যে আমরা সর্বজনীন আইনের প্রস্তাৰ করি।

মৌলিক আইন, নৈতিক আইন ও মানবিক আইন–এ তিনের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকা উচিত নয়। মৌলিক আইন মানে হল সর্বজন–স্বীকৃত আইন। এর পরিধি বাড়ানো উচিত। পাপ–পুণ্যের ধারণা নিয়ে মাথা ঘামানোর কোন প্রয়োজন নেই। তৰে আমরা এটুকু বলতে পারি, ধর্ম্মমতাশ্রয়ী (রেলিজিয়াস) বিশ্বাসকে ভিত্তি না করে সর্বজনীন মৌলিক নীতিকেই পাপ– পুণ্যের ভিত্তি হিসেৰে গ্রহণ করা উচিত। জীবের কল্যাণের দৃষ্টিতেই পাপ– পুণ্যের বিচার করা উচিত। উপরি–উক্ত তিন প্রকার আইনের মধ্যেকার পার্থক্যকে কমিয়ে

আনার অশেষ প্রয়াস চালানো উচিত। সারা বিশ্বের জন্যে এক আইন থাকাই উচিত।

(৪) সাধারণ দণ্ড–সংহিতা:

পেন্যাল কোড় বা দণ্ড–সংহিতা রচিত হৰে সাংবিধানিক কাঠামোর ভিত্তিতে, সংবিধানই হওয়া উচিত দণ্ড–সংহিতা রচনার ভিত্তি।

ন্যূনতম চাহিদা পূরণের গ্যারান্টির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া উচিত। বুদ্ধিজীবীদের উৎসাহিত করতেও তাদের বিশেষ সুযোগ–সুবিধা দেওয়া উচিত। আধ্যাত্মিক সাধনা করতে করতে এমন এক সময় আসবে যখন তারা আর বিশেষ সুযোগ–সুবিধা চাইবে না। ন্যূনতম প্রয়োজন পূর্তির গ্যারান্টি সবাইকেই দিতে হবে। প্রতিটি মানুষের পরবার কাপড়, রোগের ঔষধ, গৃহ–ব্যবস্থা, প্রকৃত শিক্ষা, পুষ্টির জন্য খাদ্য ইত্যাদির প্রয়োজন। সবার জন্যে এ সবের ব্যবস্থা আজ অবশ্যই করতে হবে। বুদ্ধিজীবী, বিজ্ঞানী ও বিশেষ কাজে নিযুক্ত মানুষের ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু অতিরিক্ত সুযোগ–সুবিধার প্রয়োজন হয়। এ দুয়ের মধ্যেকার যে তফাৎ সেটা যতটা কমিয়ে আনা যায়, তার প্রচেষ্টা বিরামহীন ভাবে চলবে।

সূচীপত্র

কিন্তু যতই কমিয়ে আনা হোক না কেন, এ তফাৎটা কখনই একেবারে শূন্য হয়ে যাবে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, বর্তমান অবস্থায় প্রত্যেকের একটা সাইকেল দরকার। কিন্তু নেতৃস্থানীয় ব্যষ্টি বা বুদ্ধিজীবীদের ক্ষেত্রে একটা করে মোটর গাড়ীর দরকার।বিশেষ সুবিধার গ্যারান্টি হিসেবে এটা দিতে হবে। কিন্তু পরবর্তী কালে আমাদের প্রচেষ্টা থাকবে সাধারণ মানুষের মাথা পিছু প্রত্যেককে একটা করে মোটর গাড়ীর ব্যবস্থা করা। আর সেক্ষেত্রে দেখা যাবে, নেতৃস্থানীয় ব্যষ্টি বা বুদ্ধিজীবীদের প্রয়োজন হবে একটা করে উড়োজাহাজ। এমনিভাবেই চলতে থাকবে। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি সর্বনিম্ন প্রয়োজন ও অতিরিক্ত বিশেষ সুবিধাদানের মধ্যের ফাঁকটা কখনোই মিটে যাবে না, তবুও এই দুয়ের ফাঁক পূরণের প্রয়াস থেকেই যাবে।

এই বিশ্বের সকল মানুষের মাথাপিছু আয় কখনোই এক রকম হবে না, পরস্পরের আয়ের ওই ব্যবধান কখনোই একেবারে ঘুচে যাবে না। বৈচিত্র্যই প্রকৃতির ধর্ম। এই বৈচিত্র্য যেদিন লুপ্ত হবে, সেদিন এই বিশ্বও শেষ হয়ে যাবে। এই পার্থক্য ধ্বংস করে ফেলা অসম্ভব। কিন্তু সামাজিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের ব্যবধান হ্রাস করা আমাদের ধর্ম–সাধনার একটা অঙ্গ। সমাজের অর্থনীতি–ব্যবস্থায় মানুষের ক্রয়–ক্ষমতা

জাগতিক ক্ষেত্রে তাদের সৰরকম উন্নতির পক্ষে একটা বিশেষ ভূমিকা পালন করে। বাঙলার শায়েস্তা খাঁর রাজত্বকালে চাল বিক্রি হত মণ প্রতি দু'আনা দরে। তবুও সেদিন মানুষকে না খেয়ে থাকতে হত। এর কারণ সেদিন সর্বসাধারণের ক্রয় ক্ষমতা ছিল না।

(৫) স্বাধীনতা:

প্রত্যেকটি সজীব প্রাণীর জীবনের কোন কোন ক্ষেত্রে স্বাধীনতার (liberty) প্রয়োজন। জীবনের কোন কোন ক্ষেত্রে সে চায় মুক্তির (freedom) আনন্দ। কিন্তু সাধারণ উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করবে এমন কোন স্বাধীনতা দেওয়া হবে না। বিশেষ করে ভৌতিক ক্ষেত্রে সামূহিক স্বার্থের বিরুদ্ধে যাওয়ার কোন অধিকার আমাদের নেই। ভৌতিক ক্ষেত্রে কঠোর ভাবে ও নির্মমভাবে এটাকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। কিন্তু মানসিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে অবাধ স্বাধীনতা থাকৰে যেমন ৰাক্ স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা, আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ইত্যাদি। পাপ–পুণ্যের সর্বজনীন মৌল নীতির ভিত্তিতে ব্যষ্টি স্বাধীনতা কোথায় কতটা মানা হবে তা স্থির করা হবে। এটার মৌলিক গুরুত্ব রয়েছে। পাপের অর্থ

সামূহিক স্বার্থ–বিরোধী কোন কাজ করা। আর সমাজের সেবার মাধ্যমে সামূহিক প্রগতিতে দ্রুতি এনে দেওয়াই পুণ্য।

এখানে ব্যাসদেবের একটি শ্লোককে মানদণ্ড হিসেবে মেনে নেওয়া যেতে পারে–

"পরোপকার পুণ্যায়, পাপায় পর–পীড়নম্"–অপরের উপকার করা পুণ্য, অপরকে নিপীড়ন করা পাপ।

(জামালপুর, ২১–১০–৫৯)

(মূল ইংরেজী থেকে অনূদিত)
প্রাউটের মৌল নীতিগুলি

প্রাউটের মৌল নীতিগুলি

---

(১) বর্ণপ্রধানতা চক্রধারায়াম্।

Varńapradhánatá cakradháráyám

ভাবার্থ: আদিতে সুসংবদ্ধ সমাজ–ব্যবস্থা যখন হয়নি সেই অবস্থার নাম দিতে পারি শূদ্র–যুগ। তখন সৰাই ছিল শ্রমজীবী। তারপর এলো সর্দারদের যুগ–সাহসী শক্তিশালীদের যুগ, যাকে বলতে পারি ক্ষাত্র–যুগ, তারপর এল বুদ্ধিজীবীদের যুগ, যাকে বলতে পারি বিপ্রযুগ, সর্বশেষে এল ব্যবসায়ীদের যুগ যার নাম বৈশ্যযুগ। বৈশ্যযুগের শোষণের ফলে বিপ্র–ক্ষত্রিয় যখন শূদ্রত্বে পর্যবসিত হয় তখন দেখা যায় শূদ্র–বিপ্লব। শূদ্রের দৃঢ়–নিৰদ্ধ সমাজ না থাকায় তথা তাদের ৰৌদ্ধিক অল্পতা–নিৰন্ধন সমাজ–শাসন তাদের দ্বারা হয় না। তাই শূদ্র–বিপ্লবে যারা নেতৃত্ব নেয় বৈশ্যোত্তর যুগে শাসন–ব্যবস্থা তাদের হাতেই আসে। এরা বীর, সাহসী। তাই দ্বিতীয়বার ক্ষাত্র যুগের এরাই সূচনা করে। শূদ্র, ক্ষত্রিয়, বিপ্র, বৈশ্য তারপর বিপ্লব, তারপর আবার দ্বিতীয় পরিক্রমণ। এভাবে সমাজ–চক্র ঘুরে চলেছে।

(২) চক্রকেন্দ্রে সদ্বিপ্রাঃ চক্রনিয়ন্ত্রকাঃ।

Cakrakendre sadvipráh cakraniyantrakáh

ভাবার্থ: যে সকল নীতিবাদী আধ্যাত্মিক সাধক শক্তি সম্প্রয়োগের দ্বারা পাপকে নিরস্ত করতে চান তাঁরাই সদ্বিপ্র। চক্রপরিধিতে স্থান এঁদের নয়। কারণ এঁরা করবেন চক্রের

নিয়ন্ত্রণ, এঁরা চক্রের ধুরী বা প্রাণকেন্দ্ররূপে অধিষ্ঠিত থাকবেন। চক্র ঠিকই ঘুরে চলৰে কিন্তু প্রাধান্যবশতঃ ক্ষত্রিয় যুগে ক্ষত্রিয় যদি শাসকের ভূমিকা থেকে শোষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, বিপ্রযুগে বিপ্র যদি শোষকের ভূমিকা গ্রহণ করে অথবা বৈশ্য যুগে বৈশ্য যদি শোষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় সেক্ষেত্রে শক্তি সম্প্রয়োগের দ্বারা সৎ ও শোষিত জনগণকে রক্ষা করা তথা অসৎ ও শোষকগণকে দমন করা এই সদ্বিপ্রের ধর্ম।

(৩) শক্তিসম্পাতেন চক্র গতিবর্ধনং ক্রান্তিঃ।

Shaktismpátena cakragativardhanaḿ krántih.

ভাবার্থ: ক্ষত্রিয় যেখানে শোষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে সেখানে ক্ষত্রিয়কে দমন করে সন্দ্বিপ্র বিপ্রযুগের প্রতিষ্ঠা করবে। স্বাভাবিকভাবে যখন বিপ্রযুগ আসা উচিত ছিল এতে করে শক্তি–সম্প্রয়োগের দ্বারা তার আগমন ত্বরান্বিত করা হল। এইভাবে যুগ পরিবর্তন করাকে বলা হৰে ক্রান্তি (evolution)। স্বাভাবিক পরিবর্তন (natural change) থেকে ক্রান্তির তফাৎ এটুকুই যে এতে শক্তি সম্প্রয়োগের দ্বারা চক্রগতির বিবর্ধন ঘটে থাকে।

(৪) তীব্রশক্তিসম্পাতেন গতিবর্ধনং বিপ্লবঃ।

Tiivrashaktisampátena gativardhanaḿ viplavah.

ভাবার্থ: অল্প সময়ের মধ্যে যদি কোন একটি বিশেষ যুগকে সরিয়ে দিয়ে পরবর্তী যুগের প্রতিষ্ঠা করা হয় অথবা কোন যুগের বজ্রবন্ধনকে ধ্বস্ত করবার জন্যে যদি অত্যধিক শক্তি সম্প্রয়োগের আবশ্যকতা হয় সেক্ষেত্রে তৎসংক্রান্ত পরিবর্তনকে বলা হয় বিপ্লব (revolution)।

(৫) শক্তিসম্পাতেন বিপরীতধারায়াং বিক্রান্তিঃ।

Shaktisampátena Vipariitadháráyáḿ Vikrántih

ভাবার্থ: শক্তি সম্প্রয়োগের দ্বারা যদি কোন একটি যুগকে তার পশ্চাতের যুগে ফিরিয়ে আনা যায় সেক্ষেত্রে সেই পরিবর্তনকে বলা হয় বিক্রান্তি (counter-evolution)। বিপ্রযুগের পরে ক্ষত্রিয় যুগের প্রতিষ্ঠাকে বলৰ বিক্রান্তি। এই বিক্রান্তি অত্যন্ত অল্পস্থায়ী হয়, অর্থাৎ অত্যন্ত অল্পকাল পরেই পুনরায় তার পরের যুগ বা তারও পরের যুগ ফিরে আসে। অর্থাৎ বিপ্রযুগের পরে হঠাৎ যদি ক্ষত্রিয়যুগের বিক্রান্তি ঘটানো যায় সেক্ষেত্রে সেই ক্ষত্রিয়যুগ দীর্ঘস্থায়ী হবে না। অল্পকাল

পরেই বিপ্রযুগ বা স্বাভাবিক গতিধারার হিসেব অনুযায়ী বৈশ্য যুগ ফিরে আসবে।

(৬) তীব্রশক্তিসম্পাতেন বিপরীতধারায়াং প্রতিবিপ্লবঃ।

Tüvrashaktisampátena viparitadháráyáḿ prativiplavah.

ভাবার্থ: অনুরূপভাবে যদি খুব অল্প সময়ে বা অধিক শক্তি সম্প্রয়োগের দ্বারা যদি কোন যুগকে পিছিয়ে দেওয়া হয় তাকে ৰলৰ প্রতিবিপ্লব (counter revolution)। বিক্রান্তির তুলনায় প্রতিবিপ্লব আরও ক্ষণস্থায়ী।

(৭) পূর্ণাবর্তনেন পরিক্রান্তি।

Púrńávarttanena parikrántih.

ভাবার্থ: সমাজ–চক্র পূর্ণ মাত্রায় একবার ঘুরে গেলে অর্থাৎ একবার শূদ্র–বিপ্লব ঘটে গেলে তাকে ৰলৰ সমাজ–চক্রের পরিক্রান্তি।

(৮) বৈচিত্র্যং প্রাকৃতধর্মঃ সমানং ন ভবিষ্যতি।

সূচীপত্র

Vaecitryam prákrtadharmah samánaḿ na bhaviśyati.

ভাবাৰ্থ: বৈচিত্ৰ্যই প্ৰকৃতিৰ ধৰ্ম। সৃষ্ট জগতেৰ কোন দুটি বস্তুই হুৰহু এক নয়–দুটি শৰীৰ এক নয়, দুটি মন এক নয়, দুটি অণু বা পৰমাণুও এক নয়। এই বৈচিত্ৰ্যও প্ৰকৃতিৰ স্বভাব। যদি কেউ সৰ কিছুকে সমান কৰতে চায় সে ক্ষেত্ৰে প্ৰাকৃতধৰ্মেৰ বিৰোধিতা কৰায় অবশ্যই সে ব্যৰ্থ হৰে। সৰ–কিছু সমান কেবল প্ৰকৃতিৰ অব্যক্ত অবস্থায়, তাই যাৰা সৰকিছুকে সমান কৰাৰ কথা ভাবে, তাৰা সৰ কিছুকে ধ্বংস কৰাৰ কথাই ভাৰে।

(৯) যুগস্য সৰ্বনিম্নপ্ৰয়োজনং সৰ্বেষাং বিধেয়ম্।
Yugasya sarvanimnaprayojanaḿ sarveśám vidheyam.

ভাবাৰ্থ: 'হৰৰ্মে পিতা গৌৰী মাতা স্বদেশঃ ভুবনত্ৰয়ম্।' তাই এই বিশ্ব– ব্ৰহ্মাণ্ডেৰ প্ৰতিটি সম্পদ প্ৰতিটি মানুষেৰ সাধাৰণ সম্পত্তি, কিন্তু বিশ্বেৰ কোন কিছুই ষোল আনা সমান হতে পাৰে না। তাই মানুষেৰ যা সৰ্বনিম্ন প্ৰয়োজন তাৰ ব্যবস্থা সবাইকাৰ জন্যেই কৰতে হবে। অৰ্থাৎ অন্ন, বস্ত্ৰ,

চিকিৎসা, বাসগৃহ, শিক্ষা এগুলির ব্যবস্থা সৰাইকার জন্যেই করা অবশ্য কর্তব্য। মানুষের এই সর্বনিম্ন প্রয়োজন আবার যুগে যুগে পাল্টে যায়। যানবাহন হিসেৰে কোন যুগে সর্বনিম্ন প্রয়োজন হয়তো একটা ৰাইসাইকেল, আবার কোন যুগে হয়ে দাঁড়াবে একটা এরোপ্লেন। যে যুগের মানুষের যেটা সর্বনিম্ন প্রয়োজন সেটার ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে।

(১০) অতিরিক্তং প্রদাতব্যং গুণানুপাতেন। Atiriktam pradátavyaḿ guńánupátena.

ভাবার্থ: যুগের সর্বনিম্ন প্রয়োজন মিটিয়ে যে সম্পদ অতিরিক্ত থাকৰে তা বিশেষ গুণসম্পন্ন ব্যষ্টিদের মধ্যে গুণানুপাতে বণ্টন করে দিতে হবে। যে যুগে একটি সাধারণ মানুষের প্রয়োজন একটি ৰাইসাইকেল সেযুগে একজন চিকিৎসকের প্রয়োজন একটি মোটরগাড়ী। গুণকে সমাদর দেবার জন্যে তথা গুণীকে সমাজসেবার অধিকতর সুযোগ দেবার জন্যে তাকে মোটরগাড়ী দিতে হবে। 'Serve according to your capacity and earn according to your necessity'–এ কথাটা শুণতে ভাল কিন্তু পৃথিবীর কঠোর মৃত্তিকায় এর কোন ফসল ফলৰে না।

(১১) সর্বনিম্নমানবর্ধনং সমাজজীবলক্ষণম্।

Sarvanimnamánavardhanaḿ samájajiivalakśańam.

ভাবার্থ: মানুষের সর্বনিম্ন প্রয়োজনের স্থিরীকৃত যা মান তার তুলনায় গুণীরা কিছু অধিক সুযোগ পাৰেই, কিন্তু এই সর্বনিম্নমানটিকেও ওপরে তোলার চেষ্টা সীমাহীনভাবে চালিয়ে যেতে হবে। জনসাধারণের প্রয়োজন একটি ৰাইসাইকেল, আর গুণীদের একটি মোটরগাড়ী, কিন্তু চেষ্টা করতে হৰে যাতে জনসাধারণকেও একটি করে মোটরগাড়ী দেওয়া যায়। প্রত্যেককে একটি করে মোটরগাড়ী দেবার পর হয়তো দেখা যাৰে, গুণীদের জন্যে একটি করে এরোপ্লেনের প্রয়োজন। গুণীদের প্রত্যেককে একটি করে এরোপ্লেন দেবার পরে সর্বনিম্ন মানকেও ঊর্ধ্বগতি করে জনসাধারণকেও একটি করে এরোপ্লেন দেবার চেষ্টা করতে হবে। এভাবে সর্বনিম্নমানকেও ওপরে তোলার চেষ্টা অশেষভাবে করে যেতে হবে ও এই চেষ্টার ওপরই নির্ভর করবে মানুষের জাগতিক ঋদ্ধি।

যানবাহন হিসেৰে কোন যুগে সর্বনিম্ন প্রয়োজন হয়তো একটা ৰাইসাইকেল, আবার কোন যুগে হয়ে দাঁড়াবে একটা

এরোপ্লেন। যে যুগের মানুষের যেটা সর্বনিম্ন প্রয়োজন সেটার ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে।

(১০) অতিরিক্তং প্রদাতব্যং গুণানুপাতেন। Atiriktam pradátavyam guńánupátena.

ভাবার্থ: যুগের সর্বনিম্ন প্রয়োজন মিটিয়ে যে সম্পদ অতিরিক্ত থাকবে তা বিশেষ গুণসম্পন্ন ব্যষ্টিদের মধ্যে গুণানুপাতে বণ্টন করে দিতে হবে। যে যুগে একটি সাধারণ মানুষের প্রয়োজন একটি বাইসাইকেল সেযুগে একজন চিকিৎসকের প্রয়োজন একটি মোটরগাড়ী। গুণকে সমাদর দেবার জন্যে তথা গুণীকে সমাজসেবার অধিকতর সুযোগ দেবার জন্যে তাকে মোটরগাড়ী দিতে হবে। 'Serve according to your capacity and earn according to your necessity'–এ কথাটা শুণতে ভাল কিন্তু পৃথিবীর কঠোর মৃত্তিকায় এর কোন ফসল ফলবে না।

(১১) সর্বনিম্নমানবর্ধনং সমাজজীবলক্ষণম্। Sarvanimnamánavardhanaḿ samájajiivalakśańam.

সূচীপত্র

ভাবার্থ: মানুষের সর্বনিম্ন প্রয়োজনের স্থিরীকৃত যা মান তার তুলনায় গুণীরা কিছু অধিক সুযোগ পাৰেই, কিন্তু এই সর্বনিম্নমানটিকেও ওপরে তোলার চেষ্টা সীমাহীনভাবে চালিয়ে যেতে হবে। জনসাধারণের প্রয়োজন একটি ৰাইসাইকেল, আর গুণীদের একটি মোটরগাড়ী, কিন্তু চেষ্টা করতে হৰে যাতে জনসাধারণকেও একটি করে মোটরগাড়ী দেওয়া যায়। প্রত্যেককে একটি করে মোটরগাড়ী দেবার পর হয়তো দেখা যাৰে, গুণীদের জন্যে একটি করে এরোপ্লেনের প্রয়োজন। গুণীদের প্রত্যেককে একটি করে এরোপ্লেন দেবার পরে সর্বনিম্ন মানকেও ঊর্ধ্বগতি করে জনসাধারণকেও একটি করে এরোপ্লেন দেবার চেষ্টা করতে হবে। এভাবে সর্বনিম্নমানকেও ওপরে তোলার চেষ্টা অশেষভাবে করে যেতে হবে ও এই চেষ্টার ওপরই নির্ভর করবে মানুষের জাগতিক ঋদ্ধি।

(১২) সমাজাদেশেন বিনা ধনসঞ্চয়ঃ অকর্তব্যঃ।

Samájádeshena viná dhanasaiṇcayah akartavyah.

ভাবার্থ: এই বিশ্ব–ব্রহ্মাণ্ড সকলের যৌথ সম্পত্তি। এর ভোগ দখলের অধিকার সকলের আছে, কিন্তু অপব্যয়ের

অধিকার কারও নেই। কোনো ব্যষ্টি যদি অতিরিক্ত সম্পদ আহরণ ও সঞ্চয় করে সেক্ষেত্রে সে প্রত্যক্ষভাবেই সমাজের অন্যান্যদের সুখ-সুবিধা খর্ব করে থাকে। তার আচরণ প্রত্যক্ষভাবেই সমাজবিরোধী, তাই সমাজের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন ব্যষ্টিকেই সম্পদ সঞ্চয়ের সুযোগ দেওয়া উচিত নয়।

(১৩), স্থূলসূক্ষ্মকারণেষু চরমোপয়োগঃ প্রকর্তব্যঃ বিচারসমর্থিতং বন্টনঞ্চ।

Sthúlasúkśmakárańeśu caramopayogah prakartavyah vicárasamarthitaḿ vańtanainca.

ভাবার্থ: স্থূল জগতে, সূক্ষ্ম জগতে ও কারণ জগতে যা কিছু সম্পদ নিহিত আছে তার উৎকর্ষ সাধন করতে হবে জীবকল্যাণে। ক্ষিতি-অপ্- তেজ-মরুৎ-ব্যোম পঞ্চতত্ত্বের যেখানে যা-কিছু লুকানো সম্পদ রয়েছে তা ষোল আনা সদ্ব্যবহারের প্রচেষ্টার মাধ্যমেই এর উৎকর্ষ সাধিত হবে। জল- স্থল-অন্তরীক্ষ তোলপাড় করে মানুষকে প্রয়োজনের উপাদান খুঁজে বের করে নিতে হবে-তৈরী করে নিতে হবে।

মানুষের আহৃত সম্পদ বিচার-সম্মতভাবে মানুষের মধ্যে বন্টন করে দিতে হৰে, অর্থাৎ সর্বনিম্ন প্রয়োজন সবাইকার

তো মেটাতে হবেই, অধিকন্তু গুণীর ও বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ মানুষেরও প্রয়োজনের কথা মনে রাখতে হবে।

(১৪) ব্যষ্টিসমষ্টিশারীরমানসাধ্যাত্মিক সম্ভাবনায়াং চরমোঽপয়োগশ্চ।

Vyaštisamaštish• áriia mánasádhyatmika sambhávanáyám̐ caramo'payogashca.

ভাবার্থ: সমষ্টি–দেহের, সমষ্টি–মানসের তথা সমষ্টিগত আধ্যাত্মিক বিকাশ ঘটাতে হবে। সমষ্টির কল্যাণ ব্যষ্টিতে আর ব্যষ্টির কল্যাণ সমষ্টিতে–একথা ভুললে চলবে না। উপযুক্ত খাদ্য, আলো, বাতাস, বাসগৃহ ও চিকিৎসার মাধ্যমে ব্যষ্টিদেহের স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা না করতে পারলে সমষ্টি–দেহের কল্যাণ হতে পারে না। তাই সমষ্টিদেহের কল্যাণ–কামনায় প্রেষিত হয়েই ব্যষ্টির কল্যাণ করতে হবে। প্রতিটি ব্যষ্টির উপযুক্ত সমাজ–বোধ, সেবা–বোধ তথা জ্ঞান জাগাবার চেষ্টা না করলে সমষ্টিরও মানসিক বিকাশ হতে পারে না। তাই সমষ্টি–মানসের কল্যাণ–ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ব্যষ্টি–মানসের কল্যাণ করতে হবে। ব্যষ্টির মধ্যে আধ্যাত্মিকতা তথা আধ্যাত্মিকতাকেন্দ্রিক নৈতিকতা না থাকলে সমষ্টির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যাবে, তাই সমষ্টি–কল্যাণের খাতিরেই ব্যষ্টির মধ্যে

আধ্যাত্মিকতা জাগাতে হবে। গোণা দু-পাঁচটি শক্তিশালী লোক, দু- পাঁচটি পণ্ডিত বা বুদ্ধিমান মানুষ অথবা দু-পাঁচটি আধ্যাত্মিক সাধক থাকলে তা সমগ্র সমাজের প্রগতি সূচিত করে না। প্রতিটি ব্যষ্টির মধ্যেই শরীরে, মনে ও আত্মায় অনন্ত বিকাশের সম্ভাবনা রয়েছে। সে সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতেই হবে।

(১৫) স্থূলসূক্ষ্ম কারণোৎপয়োগাঃ সুসন্তুলিতাঃ বিধেয়াঃ।

Sthúlasúkśmakáraňo'payogáh susantulitáh vidheyáh.

ভাবার্থ: ব্যষ্টি ও সমষ্টিদেহের কল্যাণ-সাধনায় এমনভাবে কাজ করতে হবে যাতে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক তথা স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ এ তিনের মধ্যেই একটি সুসামঞ্জস্য থাকে। যেমন প্রতিটি মানুষের সর্বনিম্ন প্রয়োজন মেটাবার দায়িত্ব সমাজের। কিন্তু সমাজ যদি এই দায়িত্বের প্রেরণায় প্রেষিত হয়ে প্রত্যেকের গৃহে অন্ন প্রেরণের ব্যবস্থা করে, প্রত্যেকের জন্যে গৃহ-নির্মাণ করিয়ে দেয়, সেক্ষেত্রে ব্যষ্টির কর্মপ্রচেষ্টায় ভাঁটা পড়বে-সে ক্রমশঃ অলস হয়ে পড়বে। তাই সর্বনিম্ন প্রয়োজন মেটাতে গেলে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন নিজ সামর্থ্যমত পরিশ্রম-বিনিময়ে মানুষ যাতে সেই অর্থ

উপার্জন করতে পারে সেই ব্যবস্থাই সমাজকে করতে হবে আর মানুষের সর্বনিম্ন প্রয়োজনের মানোন্নয়ন করতে হলে মানুষের ক্রয়-ক্ষমতা বাড়িয়ে দেওয়াই হবে তার প্রকৃষ্ট উপায়।

সামঞ্জস্য বিধান বলতে আরও বোঝায় যে, যে মানুষ শরীর, মন ও আত্মা-তিনের দিক দিয়েই উন্নত তার কাছ থেকে সেবা নেবার বেলায় সমাজ একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতি মেনে চলবে। যার শারীরিক, বৌদ্ধিক অথবা আধ্যাত্মিক একটা শক্তিই প্রকটভাবে আছে সমাজ তার কাছ থেকে সেই প্রকার সেবাই নেৰে। যার শারীরিক ও বৌদ্ধিক দুটো শক্তিই যথেষ্ট সমাজ তার কাছ থেকে অধিক পরিমাণে বৌদ্ধিক ও অল্প পরিমাণের শারীরিক সেবা নেবার একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতি মেনে চলৰে, কারণ ৰৌদ্ধিক শক্তি অপক্ষাকৃত সূক্ষ্ম ও দুষ্প্রাপ্য। যার শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক তিন শক্তিই আছে সমাজ তার কাছ থকে অধিক পরিমাণে আধ্যাত্মিক, অল্প পরিমাণে ৰৌদ্ধিক ও অত্যন্ত পরিমাণে শারীরিক সেবা নেৰে। সমাজ-কল্যাণে সৰচেয়ে বেশী সেবা করতে পারেন তাঁরা যাঁদের আধ্যাত্মিক শক্তি আছে, তারপরেই পারেন তাঁরা যাঁদের ৰৌদ্ধিক শক্তি আছে। যাঁদের শারীরিক শক্তি আছে তাঁরা যদিও তুচ্ছ নন তাহলেও তাঁরা নিজেরা কিছু করতে পারেন না। তাঁরা যা করেন তা করেন আধ্যাত্মিক ও

ৰৌদ্ধিক শক্তিসম্পন্ন ব্যষ্টিদের নির্দেশমত পরিশ্রম করে। তাই সমাজ নিয়ন্ত্রণের ভার শরীর–শক্তিপ্রধান ব্যষ্টিদের হাতে থাকা উচিত নয়, সাহস–প্রধান ব্যষ্টিদের হাতেও থাকা উচিত নয়, বুদ্ধি–প্রধান ব্যষ্টিদের হাতেও থাকা উচিত নয়, বিষয়–বুদ্ধি প্রধান 'ব্যষ্টিদের হাতেও থাকা উচিত নয়; –থাকা উচিত তাঁদের হাতে যাঁরা একাধারে আধ্যাত্মিক সাধক, বুদ্ধিমান ও সাহসী।

(১৬) দেশকালপাত্রৈঃ উপয়োগাঃ পরিবর্তন্তেতে উপয়োগাঃ প্রগতিশীলাঃ ভবেয়ুঃ।

Deshakálapáatraeh upayogáh parivarttante te upayogáh pragatishiila'h bhabeyuh.

ভাবার্থ: কোন জিনিসের কোনটা যথার্থ ব্যবহার তা দেশ–কাল পাত্রানুযায়ী পরিবর্তিত হয়। যারা এই সহজ নীতিটা বুঝতে পারে না তারা পুরাতনের কঙ্কালকে জড়িয়ে ধরে থাকতে চায়, আর তাই তারা জীবিত সমাজে বাতিল হয়ে যায়। ক্ষুদ্র নেশন–ৰোধ, অঞ্চল–ৰোধ, কুল–গরিমা ইত্যাদি বৃত্তিগুলি মানুষকে এই মূলতত্ত্ব থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায়, আর তাই তারা সহজ সত্যকে অকপটে স্বীকার করতে পারে না। ফলে নিজের দেশের ও দশের অবর্ণনীয়

ক্ষতি করে দিয়ে তারা যবনিকার অন্তরালে সরে যেতে বাধ্য হয়।

দেশ-কাল-পাত্রানুযায়ী সব কিছুর ব্যবহারেই পরিবর্তন আসবে, এটা মানতেই হবে, আর এটাকে মেনে নিয়ে প্রতিটি বিষয়ে তথা প্রতিটি ভাবের ব্যবহারে প্রগতিশীল হতে হবে। একজন শক্তিশালী ব্যষ্টি আজ যে শক্তি নিয়ে একটি বিরাটকায় হাতুড়ি চালাচ্ছে, বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা তার সেই শক্তিকে কেবলমাত্র একটি হাতুড়ি চালাবার কাজে ব্যয়িত না করে একসঙ্গে একাধিক হাতুড়ি চালাবার কাজে লাগাতে হবে, অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রগতিশীলতার ভাব নিয়ে মানুষের শক্তি থেকে ক্রমশঃ অধিক থেকে অধিকতর সেবা আদায় করতে হবে। উন্নত বিজ্ঞানের যুগে অবনত বিজ্ঞানের যুগের যন্ত্রপাতির ব্যবহার করা প্রগতিশীলতার লক্ষণ নয়। উন্নত প্রকারের যন্ত্রপাতি তথা প্রগতিশীল ভাবধারায় সৃষ্ট বিভিন্ন উপাদান ও উপকরণের ব্যবহারের ফলে সমাজে যে ছোট-বড়-বিভিন্ন প্রকারের অসুবিধা দেখা দিতে পারে বা দেখা দেবে সাহসের সঙ্গে সে-সকল অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে ও সংগ্রামের দ্বারা নিজেকে জয়যুক্ত করে এগিয়ে চলতে হবে জীবনের সার্বভৌম চরিতার্থতার পথে।

প্রগতিশীল উপয়োগতত্ত্বমিদং
সর্বজনহিতার্থং সর্বজনসুখার্থং প্রচারিতম্।

(আষাঢ়ী পূর্ণিমা, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ)
[১৪ আষাড় ১৩৬৮]
[২৮ জুন ১৯৬১]
[বুধবার]
(আনন্দসূত্রম্)

সূচীপত্র

“দেশপ্রেমিকদের প্রতি”

এই নামে আলাদা একটা ই-বই আছে,

তাই এখানে সেটা দেওয়া হলো না

সূচীপত্র

সমাজের গতিতত্ত্ব

দেশ–কাল–পাত্রাদি আপেক্ষিকতত্ত্ব সমূহের অস্তিত্ব যে বোধভূমিতে সিদ্ধ হচ্ছে, সেই ৰোদ্ধাভাবের অক্রিয়তাই বস্তুর পরমাস্থিতি। অন্যসাপেক্ষে চলমানতা বস্তুর গতি ও অন্য নিরপেক্ষ চলমানতা অগতি। এই অন্যসাপেক্ষ চলমানতা যখন যা যেটুকু কালিক সত্তা থেকে সামঞ্জস্য হারিয়ে ফেলে তারই নাম বিরতি। দ্রষ্ট্র সত্তার কর্মভাবে সম্পর্কযুক্ত চলমানতাই মাত্রাভেদে বর্ধমান– হ্রস্বমান গতিরূপে অভিহিত হতে পারে।

গতি বা স্থিতির নিত্যতা আছে কি না? বিজ্ঞান ও দর্শন দু'য়ের কাছেই এটা জটিল প্রশ্ন। বস্তুতঃ যে যুক্তিতে গতিতে আপেক্ষিকতার অপবাদ আসে, ঠিক সেই যুক্তিতেই স্থিতিতেও অস্বীকার করতে হয়। দৃশ্যমান বস্তুনিচয় যখন আপেক্ষিক বিচারে স্থান পরিবর্তন করছে না বলে মনে হয়, আমরা তাকেই স্থিতি আখ্যা দিই। কিন্তু সে অবস্থায় দৃশ্য–দ্রষ্টা–ভাব বৃহৎভূমিতে যে চলে বেড়াচ্ছে, সেটা আমরা স্থূল বা সূক্ষ্ম মনে বুঝতে পারিনা। তাই এই ধরণের তথাকথিত স্থিতিকে পরমাস্থিতি বলা চলে না। ব্যষ্টি জীবনে পরমাস্থিতি তাকেই বলতে পারি যখন কারণমনেরও ক্রিয়াশীলতা থাকে না। তাই ৰলে জীবের বিদেহী বা বিমানস অবস্থাকেও পরমাস্থিতি বলতে

পারবো না, কারণ সে ক্ষেত্রে তার ক্রিয়াশীলতার বীজ সৃষ্টিশক্তির সাহায্যে ভূমার মানস তথা দেহ সংস্থানে ক্রিয়াশীল হয়ে থাকতে বাধ্য হয়। এ থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে মনের ক্রিয়াশীলতার বীজ দগ্ধ হওয়াই পরমাস্থিতি।

যে প্রাকৃতশক্তিতে চিতিশক্তি বিন্যস্তভাবে চিত্তাণুতে ও চিত্তাণু ভ-চক্রে রূপান্তরিত হয়ে চলেছে, তাতে এই চিত্তাণু সমূহের সম্ভরকের সাক্ষিত্ব অবশ্যই থাকছে। এই সাক্ষিত্বেই চিত্তাণুসৃষ্টি আদি ভূতসমূহ অস্তিত্বের স্বীকৃতি পাচ্ছে, কিন্তু চিত্তাণুদের গতি সম্যক্ স্বীকৃতি পাচ্ছে না। সর্ব-সম্ভরক-সত্তা, ওত- অনুজ্ঞাতা ও অনুজ্ঞা যোগের কোনটিতে তাদের গতির সাক্ষী কোনটিতে নয়। আবার যেখানে গতির সাক্ষিত্ব থাকছে সেখানে স্বয়ংলিপ্ততা থাকায় গতির বর্ধমানতা বা হ্রস্বমানতা দেখা দিতে পারছে না, কারণ স্বাতিরিক্ত অন্য কোন সত্তার অনুপস্থিতিনিবন্ধন চিত্তাণুগুলির অভ্যন্তরীণ গতি অনুভূত হলেও অন্যসাপেক্ষতা ঠিকভাবে জাগছে না। তাই, তার এই গতিৰোধকে 'গতি' না বলে 'অগতি' ৰলাই অধিকতর সঙ্গত।

ব্যষ্টি-চেতনা যখন নিজ সাপেক্ষ (অন্য সাপেক্ষ তো বটেই) ভাবে বস্তুসমূহের স্থান পরিবর্তন লক্ষ্য করে প্রকৃত পক্ষে ততটুকু অবস্থাই গতি পর্যায়ভুক্ত। নিজ সাপেক্ষ

চলমানতা (অবশ্যই অন্য সাপেক্ষও) যখন প্রয়াস ত্যাগ করে অথবা প্রয়াসের সামর্থ্য হারিয়ে অগতির ভাবে আত্মসমর্পণ করে, সেই অবস্থাটুকুর নামই বিরতি। আপাতঃদৃষ্টিতে জগতের সর্বপ্রকার গতিই বিরতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ও এই কারণেই কর্ম মাত্রেই সঙ্কোচাত্মক ভাবটা অগতিভাবে স্থিতি লাভের প্রয়াস। অগতিভাবে সাময়িক স্থিতিটাই বিরতি, আর অগতির ভাব থেকে গতির প্রেরণা লাভ করেই ঘটে থাকে কর্মের –পূর্ণ বিকাশ। অগতি ভাবের প্রেরণা ব্যতিরেকে কর্মসিদ্ধি অসম্ভব, আর তাই কর্ম মাত্রকেই (স্থূল ভাবে একেও আমরা গতিই ৰলে থাকি) সঙ্কোচ- বিকাশাত্মক হতেই হৰে। ঠিক এই একই কারণে লৌকিক জগতেও ৰাধাহীন বিকাশ বা ৰাধাহীন সঙ্কোচ অসম্ভব ব্যাপার। কর্মে বা গতিতে বিকাশ ভাবটুকুই দৈশিক, পাত্রিক তথা কালিক ভাবের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত, এর সঙ্কোচের প্রয়াসটুকু হচ্ছে কালিক ভাব থেকে সরে যাওয়ার চেষ্টা, আর যেহেতু সঙ্কোচের অবস্থাটা অগতিতেই স্থিত, তাই ব্যষ্টিসত্তার কাছে সেখানে কালিক চেতনা থাকে না।

যাকে বিকাশ বলি সেটাই কি কোন একটা একটানা ভাব? বস্তুতঃ বিকাশের কারণ বিরতি কালেই অগতি ভাব থেকে প্রাপ্ত প্রেরণা। এইভাবে প্রেরণা পেয়ে বিকাশ ক্রমবর্ধমান ভাবেই এগিয়ে চলে, আর এই এগিয়ে চলার চরম

অবস্থাটিতেও আসে এক ধরণের বিরতি। এই বিরতি অবশ্যই অগতিভাবে স্থিত, কিন্তু এ অবস্থায় কালিক ভাবের অতি-প্রকটতা নিবন্ধন অগতির ভাব থেকে কোন প্রেরণাই সে নিতে পারে না। এই বিকাশমুখী গতির ঝোঁকটুকুই এই বিরতির পরবর্তী অংশে অর্থাৎ স্তরের অপরার্ধে সঙ্কোচমুখী গতিতে পর্যবসিত হয়। এই সঙ্কোচমুখী গতি ক্রমহ্রস্বমান। আর, এই হ্রস্বমানতা শেষ পর্যন্ত অগতিভাবে আত্মসমর্পণ করে। আধার বা সত্তা সঙ্কোচাত্মক অগতির ভাব থেকেই প্রেরণা সংগ্রহ করে বিকাশাত্মক অগতির দিকে এগিয়ে চলে-এটাই নিয়ম। কালিক সত্তার অপ্রকটতায় এই প্রেরণা আহৃত হয়, কিন্তু পাত্রিক সত্তার অপ্রকটতা বা ত্রুটিতে এর প্রেরণা গৃহীত হতে পারে না। পাত্রিক সত্তার এই ধরণের অপ্রকটতা বা সংরচনাগত ত্রুটিই মৃত্যু নামে অভিহিত হয়।

সঙ্কোচবিকাশাত্মক গতিকে কতকটা যেন তুলনা করতে পারি পরপর সাজানো কয়েকটি পর্বতের ওপর আরোহণ করার সঙ্গে। এ যেন ঠিক সমতল থেকে প্রাণ শক্তি নিয়ে শিখরের দিকে এগিয়ে যাওয়া-এই যাওয়াই হোল বিকাশাত্মক অগতির দিকে যাওয়া। শিখরের উপর আরূঢ় হওয়া বিকাশাত্মক অগতি, আর এই অবস্থার পর নামার ঝোঁকে পর্বতের নীচের দিকে গড়িয়ে পড়াই হল সঙ্কোচাত্মক অগতির দিকে যাওয়া।

তারপর আবার নূতন প্রাণ শক্তি নিয়ে পরের বার পর্বতের শিখরে ওঠার চেষ্টা অর্থাৎ বিকাশাত্মক অগতির দিকে চলা। তবে গতিধারার সঙ্গে তুলনায় এর ৰাধে এইখানে যে পর্বত আরোহণ কালে শিখরের যত কাছে যাওয়া যায় বেগেতে ততই জাগে হ্রস্বমানতা কিন্তু গতিধারার মূলতত্ত্বে এরূপ ক্ষেত্রে জাগে বর্ধমানতা। প্রথম পর্বতের পিছনের দিকে গড়িয়ে পড়ার পরে যদি কারোর দেহ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়, সমতল ভূমিতে নেমে পরবর্তী পর্বতে আরোহণের প্রেরণা সে সংগ্রহ করতে পারবে না, এটাকেই ৰলৰ তার সংরচনাগত ত্রুটি, তার মৃত্যু।

গতিধারার সঙ্গে মানুষের শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়ার ভারী একটা সুন্দর তুলনা করা যেতে পারে। শ্বাস নেওয়া (পূরক) যেন বিকাশাত্মক অগতির দিকে যাওয়া, পূরকান্ত কুম্ভক (পূর্ণ কুম্ভক) বিকাশাত্মক অগতি। তারপর রেচক ক্রিয়া সঙ্কোচাত্মক অগতির দিকে যাওয়া ও রেচকান্ত কুম্ভক (শূন্য কুম্ভক) সঙ্কোচাত্মক অগতি। পূরকান্ত কুম্ভকে কালের প্রকটতা আছে, চলমানতা আছে কিন্তু গতিৰোধ নেই। কিন্তু রেচকান্ত কুম্ভকে কালের প্রকটতা নেই, কিন্তু বহমানতা আছে, তবে গতিৰোধ নেই। এক পূরক থেকে অন্য পূরকের পূর্বাবস্থা পর্যন্ত শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়ার অর্ধক্ষেপ নিষ্পন্ন হয়। প্রতিটি অর্ধ

ক্ষেপের পরে অর্থাৎ প্রতিটি রেচকান্ত কুম্ভকেই জীবের মৃত্যু ঘটে। আবার সেই মৃত্যু বা অগতির অবস্থা থেকে দ্বিতীয় বার প্রাণশক্তি নিয়ে পরবর্তী পূরককালে জীবিত হয়ে ওঠে। দুইটি অর্ধক্ষেপ শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়ার পরে অর্থাৎ একটি পূর্ণক্ষেপ শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়ার পরে যদি দেখা যায় যে দেহযন্ত্র অগতিভাব থেকে প্রাণ–শক্তি আহরণে অসমর্থ তখন তার পক্ষে আর পূরক ক্রিয়া সম্ভব হয় না। এ অবস্থাটাকেই লৌকিক ভাষায় আমরা বলি মরণ। কিন্তু আসলে প্রতিটি রেচক ক্রিয়ার ফলেই জীবের মরণ হয়ে চলেছে। দিনে কয়েক হাজার ৰার এই ধরণের মরণ হয়ে থাকে। শাস্ত্রে এই ধরণের মরণকে জীবভাবের খণ্ড প্রলয় ৰলে থাকে। পূরকান্ত কুম্ভকে কালের প্রকটতা থাকায় তথা বায়ু নির্গমনের সম্ভাবনা ৰীজ রূপে থেকে যাওয়ায়, সে অবস্থা মরণ রূপে অভিহিত হয় না। যোগ শাস্ত্রে বিভিন্ন প্রকার রেচকান্ত ও পূরকান্ত প্রাণায়ামের দ্বারা পাঞ্চভৌতিক তত্বসমূহ থেকে অধিক পরিমাণে প্রাণশক্তি আহরণের ব্যবস্থা দেওয়া হয়ে থাকে।

ব্যষ্টি মানসের তরঙ্গ যখন বৃহৎ মানসের তরদ থেকে পেছিয়ে চলে বা বিপরীতমুখী গতিতে চলে তাকেই ৰলি ব্যষ্টির অধোগতি। ব্যষ্টি মানসের তরঙ্গ যখন বৃহৎ মানসের তরঙ্গের সঙ্গে সমতালে চলে তাকে ৰলৰ ব্যষ্টির স্বাভাবিকী গতি, আর

ব্যষ্টি মানসের তরঙ্গ যখন বৃহৎ মানসের তরঙ্গের চেয়ে দ্রুত তালে চলে, তাকে ৰলৰ ব্যষ্টির অগতি।

ব্যক্ত জগতে আপেক্ষিকতার ভীড়ে কেউই স্থিতিশীল পদবাচ্য হতে পারে না। যদি পারত তাহলে সবাই একরসাত্মক হয়ে যেত, তখন আর সৰাই, সৰাই থাকত না। তাই ব্যক্ত জগতের অস্তিত্ব গতিধারার আপেক্ষিকতাতেই সিদ্ধ হচ্ছে, গতি ধারার পারমার্থিকতায় বা অগতিতে নয়।

অনেক ব্যষ্টিতে মিলেই গড়ে তোলে সমাজ। এই সমাজে প্রতিটি ব্যষ্টি নিজের সংস্কারগত গতিধারায় চলতে চাইলেও ঠিক ষোল আনা নিজের ভাবে চলতে পারে না। সূক্ষ্ম তথা কারণভাবে ব্যষ্টি–বৈশিষ্ট্য নিয়ে চলা সম্ভব হলেও স্থূল জাগতিক ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। বহু গতিধারার সমন্বয়ে যে সামাজিক গতিধারার সৃষ্টি হয়, এই বহুর প্রত্যেকটিই গৌণতঃ তার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ে ও কমবেশী সমাজের সামগ্রিক গতিধারার ক্ষেত্রে অন্ততঃ পক্ষে জাগতিক ক্ষেত্রে, তাল রেখে বা মানিয়ে নিয়ে চলতে চায়। জড়সংঘাতের ফলে অজৈব ব্যষ্টি জৈব ব্যষ্টিতে পরিণত হয় বটে, কিন্তু এই অজৈব ব্যষ্টির তদনন্তর বিকাশ যে জড়সংঘাত তথা ভাব সংঘাতের পরিণাম তা পরোক্ষভাবে প্রাকৃতিক সূত্র থেকে এলেও

সূচীপত্র

প্রত্যক্ষভাবে সামাজিক গতিধারার সঙ্কোচাত্মক ভাবে অগতি থেকেই অর্জিত হয়।

বহুর গতিধারার যে পরিণামভূত গতিধারা সামাজিক গতিধারা আখ্যা পেতে পারে তার তরঙ্গের অধিরোহণ অবরোহণ ব্যষ্টি তরঙ্গের অধিরোহণ অবরোহণের চেয়ে কিছুটা হ্রস্ব। তার এই হ্রস্বতাই আবার ক্রান্তি বা বিপ্লবের পথ খুলে দেয়।

বিকাশাত্মক গতি পূর্বতন সঙ্কোচের ভাবে অগতির থেকে প্রাণশক্তি আহরণ করে। এই প্রাণশক্তির মৃদুতা বা তীব্রতা নির্ভর করে অগতি ভাবের দীর্ঘত্ব তথা সংরচনার শক্তিবহন সামর্থ্যের ওপর। অগতি ভাবের দীর্ঘত্ব তখনই মরণ রূপে অভিহিত হয় যখন পুরাতন সংরচনা অগতিভাবের প্রাণশক্তিকে ধারণ করতে পারে না। এই ধরণের ক্ষেত্রে অগতিভাবের বিকাশাত্মক স্ফূর্তির জন্যে দরকার হয় নবতর সংরচনার। এই নতুন সংরচনা হতে পারে পুরাতনের নৱতর রূপ অথৱা সম্পূর্ণ ভাবে বিভিন্ন কোন সংরচনার নবতর রূপ। অবশ্যই সঙ্কোচের পরে যেখানে নূতন বিকাশের উদ্যোগ, সেখানেই সংরচনার কিছু না কিছু পরিবর্তন অবশ্যই আসে, কিন্তু সেই সংরচনা নবতর আখ্যা তখনই পায় যখন তার পূর্বেকার রূপ

আর পরেকার রূপে ব্যষ্টিমানস বা সমাজ–মানসের প্রত্যভিজ্ঞা কাজ করতে পারে না; বিরতি কালে এক সংরচনার মৃত্যু (সাধারণতঃ লৌকিক অর্থে যাকে আমরা মরণ বলি) ঘটে থাকে বিরতির পূর্বাবস্থায় অন্য সংরচনা কর্তৃক তার অবদমনের বা প্রাণশক্তি গ্রাস করে নেওয়ার ফলে। এই ধরণের লৌকিক মৃত্যু কেবল ব্যষ্টিরই হয় না, সমাজেরও হয়। এই ভাবে কোন বিশেষ ব্যষ্টি বা সমাজকে যে ব্যষ্টি বা যে সমাজ গ্রাস করে বা অবদমিত করে দেয় এই ঘটনার ফলে তার প্রাণশক্তি আপাতঃদৃষ্টিতে কিছুটা ৰাড়ে বটে, কিন্তু স্বীয় দেহে তরঙ্গের বিভিন্নমুখিনতা ও তপরিণামভূত সংঘর্ষের ফলে তার পরিণামভূত তরঙ্গ হ্রস্বতা প্রাপ্ত হয় ও এর ফলে তার সংরচনাগত মরণের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। অবশ্য এই ধরণের গ্রাসক্রিয়ায় যদি তরঙ্গের সমীকরণ সংসাধিত হয়, সেক্ষেত্রে ব্যষ্টির বা সমাজের সংরচনাগত প্রাণশক্তি বেড়েই যায়।

ধরা যাক, পুরানো মিশরীয় সভ্যতার কথা। আজ আমাদের দৃষ্টিতে তার সৰকিছু ভাল ঠেকুক বা না ঠেকুক সে একটা বিশেষ ধরণের স্বকীয়তা নিশ্চয়ই দাৰী করতে পারত। কিন্তু তার অভ্যন্তরীণ দেহে ছিল বিভিন্ন ধরণের তরঙ্গ সংঘাত, যার ফলে সামূহিক দেহের তরঙ্গ ছিল অত্যন্ত দুর্বল।

যাদের সামূহিক তরঙ্গ সৰল ছিল সেই পশ্চিম এশিয়ার ও দক্ষিণপূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন সমাজগোষ্ঠীর চাপে তাই তাকে ধ্বংস হতে হয়েছিল। মিশরীয় সভ্যতার এই যে ধ্বংস এটাকে কিন্তু বিশুদ্ধ বিচারে তখন পর্যন্ত ধ্বংস হওয়া বলতে পারিনে, কারণ অপেক্ষাকৃত অল্প সংবেদনশীল (যদিও অধিকতর প্রাণশক্তি সম্পন্ন) জাতি গোষ্ঠী মিশরীয় সভ্যতার প্রাণশক্তিকে তথা সামাজিক কাঠামোকে চুরমার করে দিলেও তার সংবেদনে তারা নিজেরা প্রভাবিত হয়ে পড়েছিল। মিশরীয় সভ্যতার ওপর চরম আঘাত হেনেছিল ইসলামীয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ আরব সমাজ। আরবের এই নূতন ভাবধারার প্রভাবে প্রাচীন মিশরের থেকে নূতন মিশর ভাবগত বিচারে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। আজ তাই বর্তমান মিশরের ভাবধারায় প্রাচীন মিশরের কোন কিছুই অবশিষ্ট নেই।

আরৰীয় সংস্কৃতি কিন্তু কেবল যে প্রাণশক্তিতে ভরপুর ছিল তা নয়, তার নিজস্ব সংবেদনগত বৈশিষ্ট্য ছিল। আরব আক্রমণ কালে মিশরীয় ঐতিহ্যের প্রাণশক্তি নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকলেও সংবেদন নষ্ট হয়নি, তখন তার যে সংবেদন অবশিষ্ট ছিল, তা ছিল নব্য আরব ভাবধারার সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। এই বিরুদ্ধধর্মী মিশরীয় সংবেদন গ্রাস করার ফলে, আরবীয় ভাবধারা হীনবল হয়ে পড়ে ছিল ও তার

ফলে ইউরোপকে গ্রাস করা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। আইবেরিয়ায় মুরেদের পশ্চাদপসরণের এটাও একটা বড় কারণ।

প্রশ্ন উঠতে পারে, প্রাচীন আরবীয় ভাবধারা ও ইসলামপন্থী আরবীয় ভাবধারাও তো বিভিন্ন ধর্মী ছিল, তবে প্রাচীন আরবীয় ভাবধারা ইসলামপন্থী আরবীয় ভাবধারার প্রাণশক্তি নষ্ট করেনি কেন? বস্তুতঃ প্রাচীন আরবীয় ভাবধারার অনেক কিছুই ইসলামপন্থী আরবীয় ভাবধারায় গৃহীত হয়েছিল, আর যেখানে এতদুভয়ের মধ্যে গরমিল ছিল সেখানেই ৰেধেছিল প্রচণ্ড সংগ্রাম। বহুমানবের এক আদর্শ এক আত্মিক চেতনা ইসলামপন্থী আরৰ- মনোভাবকে প্রাচীনপন্থী আরৰ-মনোভাবের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে বিপুল ভাবে সাহায্য করেছিল।

পশ্চিমে মিশর দেশে ইসলামপন্থী আৱৰ মনোভাবের যে বিপর্যয় ঘটে ছিল, পূর্ব দিকে পারস্য দেশেও হুবহু তাই-ই হয়েছিল। নিজের বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট পারসিক সমাজ ইসলামীয় ভাবধারার ছাপটুকুই নিয়েছিল, কিন্তু সমাজ দেহের অভ্যন্তরে ফল্গুধারার মত পারসিক ভাবধারা দীর্ঘকাল ধরে বয়ে চলেছিল ও আজও ক্ষীণ ধারায় বয়ে চলেছে। পারস্য অতিক্রম

করার পরে ইসলামপন্থী আরব–আদর্শ অনেকটা হীনবল হয়ে পড়ে ও সিন্ধুনদ অতিক্রম করে, ভারতের অভ্যন্তরে এসে তার পক্ষে ভারতীয় সমাজকে গ্রাস করা তাই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য ভারতীয় সমাজকে গ্রাস করার তার এই অক্ষমতার এটা একটা গৌণ কারণ। মুখ্য কারণ ছিল ভারতের আধ্যাত্মিক তথা সামাজিক আদর্শ ও ভারতবাসীর বিচারশীল মানসিকতা। মূর্তিপূজা কেন্দ্রিক বর্ণাশ্রম ধর্ম ভারতের সমাজ দেহে বড় বড় ফাটল তৈরী করে থাকলেও একটা সুমহান নৈতিক সামাজিক তথা আধ্যাত্মিক আদর্শ গণজীবনে যে শক্তিশালী তরঙ্গ তৈরী করে ছিল পারস্য অতিক্রম করে আসা বিবর্তিত ইসলামীয় সমাজাদর্শের পক্ষে তাকে গ্রাস করা সম্ভব হয়নি। এমনকি বিবর্তিত ইসলামীয় সমাজাদর্শ শতাব্দীর পরে শতাব্দী ভারতীয় সমাজাদর্শের পাশাপাশি বাস করেছে, কিন্তু তরঙ্গগত বৈপরীত্য–নিবন্ধন উভয়ের মধ্যে লেনদেন যা হয়েছে তা অতি সামান্য! ভারতীয় সমাজের বাইরের দিকটায় ইসলামীয় সমাজের প্রভাব অবশ্যই পড়েছে, কিন্তু মানসিকতায় বা আধ্যাত্মিকতার কোন প্রভাবই পড়েনি বলা যেতে পারে। ভারতীয় সমাজে বিশেষ করে ভারতের বৈষ্ণব ধর্মে যে সুফী প্রভাব বর্তমান তা আসলে পারসিক প্রভাব, ইসলামীয় প্রভাব নয়। এই সুফী প্রভাবের তারঙ্গিক রূপ ভারতীয় সমাজ–তরঙ্গের সাথে বেশ মিল খায়, আর তাই তার প্রভাব

ভারতের সমাজজীবনকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে প্রাণশক্তি যুগিয়ে গেছে।

(মানুষের সমাজ, ২য় খণ্ড)